রাগপ্রধান বাংলা গান : রাগরূপ ও সুরবৈচিত্র্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

রুখসানা করিম

এম. ফিল গবেষক

ফেব্রুয়ারী, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শিরোনাম

রাগপ্রধান বাংলাগান: রাগরূপ ও সুরবৈচিত্র্য

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
রুখসানা করিম
এম.ফিল (২য় পর্ব)
রেজিস্ট্রেশন নং- ২৪৫
শিক্ষাবর্ষ ২০১২-২০১৩
রোল নং - ০৪
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার নামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, 'রাগপ্রধান বাংলাগান রাগরূপ: ও সুরবৈচিত্র্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি।

রুখসানা করিম
এম.ফিল (২য় পর্ব)
রেজিষ্ট্রেশন নং- ২৪৫
শিক্ষাবর্ষ ২০১২-২০১৩
রোল নং - ০৪
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রতয়ন করা যাচ্ছে যে, রুখসানা করিম কর্তৃক উপস্থাপিত "রাগপ্রধান বাংলাগান: রাগরূপ ও সুরবৈচিত্র্য" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২৪৫, শিক্ষাবর্ষ ২০১২-২০১৩, এবং রোল ০৪। এটি গবেষকের মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেননি।

ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী
তত্ত্বাবধায়ক
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ৮-১২

১। **১ম অধ্যায় ঃ রাগ ও রাগসংগীত** ১৪-১৯

১.১ রাগের সংজ্ঞা.....২০-২১

১.২ রাগ সম্পর্কিত নানা মতবাদ.....২২-২৯

১.৩ রাগসংগীত ও এর প্রকারভেদ.....৩০-৩৭

১.৪ রাগের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ.....৩৮-৪২

১.৫ ঠাট ও রাগ.....৪৩-৪৬

২। **২য় অধ্যায় ঃ বাংলায় রাগসংগীত চর্চা.....৪৮-৫১**

২.১ বিভিন্ন ধারার গানে রাগের ব্যবহার.....৫২-৫৫

২.২ রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টির নেপথ্যে সংগীতগুণীদের অবদান.....৫৬-৬১

২.৩ রাগপ্রধান গানের নেপথ্যে বিভিন্ন গীতশৈলী.....৬২-৮৪

৩। **৩য় অধ্যায় ঃ রাগপ্রধান বাংলাগানের উদ্ভব ও বিকাশ**.....৮৬-৮৭

৩.১ রাগপ্রধান বাংলাগানের সংজ্ঞা.....৮৮-৮৯

৩.২ রাগপ্রধান বাংলাগানের বৈশিষ্ট্য ৯০-৯১

৩.৩ রাগপ্রধান বাংলাগানের শিল্পী.....৯২-৯৭

৩.৪ কলকাতা ও ঢাকা কেন্দ্রীক রাগপ্রধান বাংলাগান.....৯৮-১০১

৪। **৪র্থ অধ্যায় ঃ রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগরূপ**.....১০৩-১১৩

৪.১ শাস্ত্রীয় রাগের সাথে রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগের স্বরূপ বিশ্লেষণ...১১৪-১৩২

৪.২ রাগ প্রধান বাংলা গানের নান্দনিকতা

এবং সার্থকতা পর্যালোচনা.....১৩৩-১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

৫। **৫ম অধ্যায় ঃ রাগপ্রধান বাংলাগানের সুরবৈচিত্র্য**.....১৩৬-১৪৩

৫.১ গানের বাণীর সাথে সুরের সমন্বয়.....১৪৪-১৪৭

৫.২ বাংলাগান রাগাশ্রয়ী গানের মধ্যে পার্থক্য.....১৪৮-১৪৯

৫.৩ বাংলাদেশে রাগপ্রধান ও রাগাশ্রয়ী গান চর্চা.....১৫০-১৫২

উপসংহার.....১৫৩-১৫৪

পরিশিষ্ট - ১ চিত্র - রাগপ্রধান বাংলাগানের শিল্পী.....১৫৫-১৫৮

পরিশিষ্ট - ২ রাগপ্রধান বাংলাগানের তালিকা.....১৫৯-১৬৩

পরিশিষ্ট - ৩ সহায়ক
গ্রন্থপঞ্জি.....১৬৪-১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

সংগীত মানুষের সৃষ্ট এক অনন্য শিল্প। পৃথিবীর সব অঞ্চলেই এই শিল্পের যথাযথ বিকাশ ঘটেছে। তবে সংগীত চর্চায় ভারতীয় উপমহাদেশ সুপ্রাচীন ধারাকে অক্ষুন্ন রেখেছে। ভারতীয় প্রাচীন গীতিরীতি রাগসংগীত হতে আমরা নানা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে অনেকগুলো গীতধারা পেয়েছি। রাগপ্রধান বাংলাগান এমনই একটি ধারা যেখানে রাগসংগীত ও বাংলাগান মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগে রাগসংগীতে স্নাতকোত্তর করার সুবাদে রাগসংগীত ও রাগপ্রধান বাংলাগান সম্পর্কে আমার আগ্রহ ছিল প্রবল এবং এই বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রী সম্পন্ন করার স্বপ্ন আমার শুরু থেকেই ছিল। **রাগপ্রধান বাংলাগান: রাগরূপ ও সুরবৈচিত্র্য** শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমি মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। এরপরেই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং সংগীত বিভাগকে, আমাকে এম.ফিল. ডিগ্রী সম্পাদনের সুযোগ প্রদানের জন্য। আমি সংগীত বিভাগের সকল শিক্ষকের কাছে আজন্ম কৃতজ্ঞ যে, তারা আমাকে উচ্চতর শিক্ষার সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমার এই গবেষণাকর্মে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি প্রয়াত মোবারক হোসেন খান স্যারকে। তিঁনি তাঁর জীবদ্দশায় আমাকে এই গবেষণার উপযোগী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও দিক নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, অভিসন্দর্ভ পরিকল্পনা এবং প্রণয়নের কাজে বিনম্রচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তত্ত্বধায়ক ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী এর কাছে। তাঁর সর্বাত্মক সহযোগীতা ব্যতীত এই গবেষণাকর্মটি নিষ্পন্ন করা সম্ভব হতো না। আমার এই গবেষণায় প্রতিটি পদক্ষেপে সহযোগীতা করেছেন শ্রদ্ধেয় ড. অসিত রায়, অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ কৃতজ্ঞতা পরম শ্রদ্ধেয় মা-বাবার প্রতি আমাকে মানসিক শক্তি যোগানোর জন্য। আরও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুড়-শাশুড়ী এবং স্বামীর প্রতি, আমাকে এই কাজে পূর্ণ সহযোগীতা করার জন্য। সবশেষে কৃতজ্ঞতা আমার আত্মজ, আমার একমাত্র শিশু পুত্র শেহজাদের প্রতি।

আমার এই গবেষণাকর্মটি ভবিষ্যতে রাগপ্রধান বাংলাগান সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণাকর্মে সম্পূর্ণ সহায়তা প্রদান করবে বলে আমার বিশ্বাস।

রুখসানা করিম

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

রাগপ্রধান বাংলাগান ভারতীয় উপমহাদেশীয় সংগীতের একটি বিশেষ ধারা, যা সৃষ্টি হয়েছে দুটি প্রধান ধারার সমন্বয়ে, রাগসংগীত ও বাংলাগান। একই অঞ্চলের দুটি শাখার সম্মিলনে এই অভিনব উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে একেবারেই আধুনিক পর্যায়ে। শিল্প ও সংস্কৃতির কোন সীমারেখা নেই। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে শিল্পচর্চার নিদর্শন রয়েছে। কালভেদে তা অন্যস্থান থেকেও এসে মিশেছে ভারতের আদিম সংস্কৃতির সাথে। কয়েক হাজার বছরের ক্রমাগত মিলন-মিশ্রণ-বিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্কৃতির আধুনিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহিরাগত অন্যান্য জাতির অনুপ্রবেশ-আক্রমণ ঘটেছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। ফলে এখানকার স্থায়ী জনগোষ্ঠীর সাথে ঐসব জাতির মিশ্রণ ঘটেছে। এভাবেই ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। প্রথমে আর্যদের আগমন, এরপর যথাক্রমে গ্রীক, মুসলমান, পর্তুগীজ, ইংরেজদের আগমন এভাবে নানা রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে আমাদের সংস্কৃতি।

কথিত আছে, ৩২৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে আক্রমণ করেন এবং ভারতীয় সংগীত (আর্য সংগীত) শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি ফেরার সময় দুইজন প্রসিদ্ধ শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে যান। কারণ, ভারতবর্ষের বাহিরে মাত্র ৪টি স্বরযুক্ত সংগীতের প্রচলন ছিল, অথচ ভারতবর্ষের সংগীতে সাত স্বরযুক্ত গান ছিল। এই দুই শিল্পী ভারতবর্ষের বাহিরে সাতস্বরের ব্যাপ্তি ঘটান এবং ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া ভারতীয় সংগীত ঐ সব অঞ্চলের সংস্কৃতির সাথে মিশে নতুন এক রূপ ধারণ করে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতির অনুপ্রবেশের মাধ্যমে আবার ভারতবর্ষে ফিরে আসে।[১] ভারতীয় সংগীত নানা ক্রমবির্তনের মধ্য দিয়ে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়-উত্তর ভারতীয় সংগীত ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত। এ দুটি ধারাতেই রাগ-রাগিনীর ব্যবহার রয়েছে। ভারতবর্ষের সংগীতের ধারা দুটি হলেও সুবিশাল অঞ্চলে নানা ধরণের জাতির বসবাস। এদের ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতিও পরস্পর হতে আলাদা। প্রাচীনকাল হতেই ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বসবাস। তাই এ অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি মূল ভারতীয় সংস্কৃতি হতে কিছুটা আলাদা। ভাষাগত কারণে এই অঞ্চলের সংগীত ও সাহিত্যে বৈচিত্র্যময়তা লক্ষ্য করা যায়। ভারতের মত এই অঞ্চলেও প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। শিল্পকলা ও সাহিত্য চর্চার নির্দশন বঙ্গেও যথেষ্ট ছিল। অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাঙালী

---

[১]দেবব্রত দত্ত, *সংগীততত্ত্ব*-দ্বিতীয় খন্ড(কলকাতা: ব্রতী প্রকাশনী, ২০১২) পৃ ৫৬

জাতির একমাত্র ভাষা 'বাংলা' প্রাচীন রূপ থেকে আধুনিক রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। ভাষার সাথে সাথে এই জনপদের সংগীত ও শিল্পেরও পরিবর্তন হয়েছে। প্রাচীন বাংলা সংগীত আধুনিক বাংলা সংগীতে পরিণত হয়েছে। এই আধুনিক বাংলাগানের পূর্ববর্তী অবস্থাই হল রাগপ্রধান গান। রাগপ্রধান বাংলাগান বাংলা রেনেসাঁস সময়কালের গবেষণালব্ধ ফল। মুঘল সম্রাজ্যের পতনের পর দরবারের সংগীতগুণী ও কলাকারগণ বঙ্গে ছড়িয়ে পড়েন এবং দরবারী সংগীতের প্রসার সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। বঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই রাগসংগীতের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন দেশী সংগীত, লোক সংগীত, বৈষ্ণব সংগীত ইত্যাদিতে রাগ-রাগিনীর ব্যবহার ছিল। এমন কি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাপদেও বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর ব্যবহার ছিল। তবে বঙ্গে রাগ-রাগিনীর ব্যবহার ভারতের কেন্দ্রস্থল হতে বেশ পার্থক্যপূর্ণ ছিল। উত্তর ভারতীয় দরবারী সংগীতের সাথে বাংলাদেশের পরিচয় ঘটে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর। এ সময় কলকাতা, বিষ্ণুপুর, বহরমপুর হয়ে ওঠে ভারতীয় দরবারী সংগীত চর্চার প্রসিদ্ধ স্থান। শাস্ত্রীয় সংগীতে পারদর্শী শিল্পীগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করতেন। এর মাধ্যমেই দরবারী রাগসংগীত সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসে। ঊনবিংশ শতকে হিন্দুস্থানী রীতিতে বাংলা খেয়াল, টপ্পা, গজল ইত্যাদি রচনার প্রয়াস পরবর্তীতে রাগপ্রধান গান উদ্ভবের নেপথ্যে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতক হতে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত কলকাতায় ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ও বাংলাগান বিশেষভাবে চর্চা হয়েছে এবং উৎকর্ষতা লাভ করেছে। ঘন ঘন রাজনৈতিক সংঘাত এবং রাজতন্ত্রে পরিবর্তন ঘটলেও সংগীত ও সাহিত্য খরস্রোতা নদীর মত বয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতকে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা পায় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিচয় ঘটে। তখন বাংলাগানে পাশ্চাত্য গানের প্রভাব কিছুটা হলেও পড়েছিল। রাগপ্রধান বাংলা গানের জন্ম হয় ঊনবিংশ শতকে। কিন্তু তার আগে বাংলা সংগীত ও হিন্দুস্থানী সংগীতের একটা চমকপ্রদ অধ্যায় ছিল। আধুনিক হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের পটভূমিতেই বাংলা নাগরিক সংগীত বিকশিত হয়েছে। বাংলাগানের আধুনিক অধ্যায় হল নাগরিক সংগীতের উদ্ভব। বাংলা গানের বিকাশ জানতে খুব বেশী পেছনে যেতে হয় না। কারণ চর্যাপদ যুগের পূর্বে বাংলায় কোন সাহিত্য চর্চার নির্দশন পাওয়া যায় না। কাজেই ধরে নেয়া যায় যে, তখন বাংলায় ভারতীয় আদিম সংস্কৃতির বিচরণ ছিল। এরপর চর্যাপদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের অধ্যায় শুরু হয়েছে। এই প্রবাহ বয়ে গেছে বৈষ্ণব পদাবলী, নাথসাহিত্য, পদাবলীকীর্তন, শাক্তগীতির মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকের টপ্পা, বাংলা খেয়াল, কীর্তন, ঠুমরী, যাত্রা, কবিগান, পাঁচালী পর্যন্ত। এরপর ঊনবিংশ শতকে কলকাতা বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে একটি আধুনিক সংগীত সমাজ গড়ে ওঠে। এভাবে বাংলাগানের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষার সূত্রপাত ঘটে। রামনিধি গুপ্তের পথ অনুসরণ করেই বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য বাংলায় ধ্রুপদ রচনা শুরু করেন। এরপর রঘুনাথ রায় ও কার্তিকেয় চন্দ্র রায় বাংলায় খেয়াল রচনার পথ প্রদর্শন করেন আর কালী মীর্জা বাংলা টপ্পা রচনা করেন। এভাবেই

হিন্দুস্থানী ছাঁচে বাংলাগানের একরকম অবয়ব দাঁড়ায় যা শ্রোতাসমাজে খ্যাত হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে, কলকাতা কেন্দ্রীক বাংলাগান (হিন্দুস্থানী রীতিতে) বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার ন্যায় বাংলাদেশে (ঢাকায়) তখন কেন্দ্রভিত্তিক সংগীত চর্চার নিদর্শন রয়েছে। ঢাকার নবাব ও জমিদারদের মহলে ঘরানা ভিত্তিক যন্ত্রসংগীত ও শাস্ত্রীয় সংগীতের পাশাপাশি দেশী সংগীতের প্রচলন ছিল। সমগ্র বঙ্গদেশ তথা বিষ্ণুপুর, কলকাতা, পাথুরেঘাটা, মেটিয়াবুরুজসহ পূর্ববঙ্গের গৌরীপুর, মুক্তাগাছা, জয়দেবপুর, নাটোর, রামগোপালপুর, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি স্থানের রাজবাড়ি-জমিদার বাড়িতে ভারতবর্ষের নামী শিল্পীদের সমাগম ছিল।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে 'আমাদের সংগীত' শীর্ষক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> আকাশে মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা বর্ষণেই তার প্রকাশ। গানের ভেতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে, তার প্রকাশ পাতার সংগে, ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সংগীতেরও এই রকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সংগীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সংগে মিশ্রিত হয়ে। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে আর বাংলাদেশে।[২]

উনবিংশ শতকে 'বাংলা রেঁনেসাস'[৩] এর একটা বিরাট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় বাংলাগানে। পাশাপাশি পাশ্চাত্য সংগীত ও আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে বাংলাদেশে সঙ্গীতের একপ্রকার জমজমাট পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসেবে কলকাতার আত্মপ্রকাশের পর থেকেই কলকাতা হয়ে ওঠে ভারতের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯০১ সালে বিখ্যাত গ্রামোফোন কোম্পানী চালু হয় কলকাতায়। এরপর সংগীত হয়ে ওঠে অনেক সহজলভ্য। অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা ঘরে বসেই সংগীতের স্বাদ পেতেন। ১৯৩০ সালে গ্রামোফোন বিক্রির মাত্রা রেকর্ড স্পর্শ করে এবং ঠিক এক বছর পরে কলকাতায় প্রথম সবাক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। মঞ্চ অথবা বৈঠক থেকে সংগীত আরো দ্রুত গতিতে শ্রোতা হৃদয় জয় করে নিতে শুরু করল। ১৯২৭ সালে কলকাতা বেতার এবং ১৯৩৯ সালে ঢাকা বেতার স্থাপিত হয়, এর ফলে একটি সুবিশাল কার্যক্রম পরিচালনা হতে থাকে পুরো বাংলায়। ঊনবিংশ শতকে বাংলা রেঁনেসাসের মাধ্যমেই আমরা আধুনিক গানের জগতে প্রবেশ করেছি। যদিও আধুনিক শব্দটি আপেক্ষিক। কারণ আমরা এখন যাকে আধুনিক বলে থাকি তা কয়েক'শ বছর পরে আধুনিক হিসেবে থাকবে না,

---

[২]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীত চিন্তা*(কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৩৯৯) পৃ ৫২

[৩]বাংলা রেঁনেসাস/**Bengal Renaissance** refers largely to the social, cultural, psychological, and intellectual changes in Bengal during the nineteenth century, as a result of contact between certain sympathetic British officials and missionaries on the one hand, and the Hindu intelligentsia on the other. The setting for the Bengal Renaissance was the colonial metropolis of Calcutta.

আবার এখন থেকে ৫০ বছর আগের আধুনিক আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে গেলেও তখনকার সময়ে আধুনিক হিসেবেই গণ্য হত। অর্থাৎ সমসাময়িক অগ্রগতি ঐ সময়ের আধুনিক বিষয়। তাই বলা যায় যায়, ঊনবিংশ শতকের আধুনিক বাংলাগান বলতে আমরা রাগপ্রধান বাংলা গানকেই বুঝি। বাংলা রেঁনেসাসের কবি সাহিতিকদের পরীক্ষামূলকভাবে হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনীর অবয়বে এক শ্রেণির মৌলিক বাংলাগান রাগপ্রধান বাংলাগান নামে কলকাতা বেতারে প্রকাশিত হয়। এই শ্রেণির গান সম্পূর্ণ রাগ সংগীত নয়, বরং বিশুদ্ধ রাগরূপকে সুরের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলা ভাষার গানে। রাগপ্রধান গান একদিনে তৈরি হয় নি। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে রাগ-রাগিনীর চর্চা, বিভিন্ন গায়নশৈলী, কাব্যচর্চা, সাহিত্য রচনা, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র এসবের প্রচলন এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে স্বভাবগত ভাবেই শিল্পচর্চার বীজ বপন করেছে। কালক্রমে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হিন্দুস্থানী সংগীত ও বাংলা সংগীতের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও তা ছিল দেশী সংস্কৃতির সাথে অন্য সংস্কৃতির মিশ্রণ। কিন্তু রাগপ্রধান বাংলাগান আমাদের নিজস্ব দুটি মূল ধারার মিশ্রণে তৈরী, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে সে যুগে কলকাতা বেতারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল রাগপ্রধান গান এর কারণেই। তিরিশের দশকের বাংলাগানের বিবর্তনের ফসল রাগপ্রধান বাংলাগান। বিবর্তন শুধু বাংলাগানেরই নয় ভারতীয় উচ্চাঙ্গ রীতিরও বটে। মার্গ সংগীতের অপরিহার্য দিক এর সুরবিস্তার যা রাগপ্রধান বাংলাগানে সংযুক্তির পর গানের আকর্ষণ বহুগুণ বেড়েছে।

রাগপ্রধান বাংলাগান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে কিছুটা পেছনে ফিরে গিয়ে হিন্দুস্থানী রাগ সংগীত, বাংলা গান এবং রাগপ্রধান গানের নেপথ্যে বাংলা রেঁনেসাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। হিন্দুস্থানী সংগীত ও বাংলাগানের ইতিহাস বিশদভাবে ব্যাখ্যা না করা গেলে রাগপ্রধান গানের মূল তত্ত্বকথা উদঘাটন এবং পরবর্তীতে রাগরূপ ও সুরবৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। রাগপ্রধান বাংলা গানের সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস এবং রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগরূপ ও সুরবৈচিত্র্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি তথ্যসমূহ একসঙ্গে কোন গবেষণাগ্রন্থে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আলোকপাত করা হয়নি। তাই উক্ত অভিসন্দর্ভটিতে রাগপ্রধান গানের আবির্ভাব, রাগরূপ ও সুরবৈচিত্র্য বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয় দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি ঐতিহাসিক এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা পদ্ধতির আলোকে বিভিন্ন অধ্যায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণাকর্মটিতে পর্যায়ক্রমে ভারতীয় রাগসংগীত, রাগ-রাগিনীর পরিচয়, রাগপ্রধান বাংলাগানের বৈশিষ্ট্য, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, রাগপ্রধান গানের নেপথ্যে বিভিন্ন গীতশৈলী, সংগীতগুণীদের অবদান উল্লেখপূর্বক লোক প্রিয় রাগপ্রধান গানের স্বরলিপিসহ রাগরূপ বিশ্লেষণ ও সুরবৈচিত্র্য আলোচনা করা হয়েছে।

রাগপ্রধান বাংলাগান: রাগরূপ ও সুর বৈচিত্র্য শীর্ষক গবেষণাকর্মে অধ্যায় বিভাজন নিম্নরূপ,

১ম অধ্যায়ে **রাগ ও রাগসংগীত** রাগের সংজ্ঞা, রাগ সম্পর্কিত নানা মতবাদ, রাগ সংগীতের প্রকারভেদ, রাগের বৈশিষ্ট্য ও রাগ-রাগিনীর শ্রেণি বিভাগ, ঠাট ও ঠাট রাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বাংলাগানে রাগরূপ বোঝাতে এই অধ্যায়ে রাগের যাবতীয় দিক আলোচিত হয়েছে।

২য় অধ্যায়ে **বাংলায় রাগসংগীত চর্চা** শিরোনামে বিভিন্ন ধারার গানে ভারতীয় রাগ-রাগিনীর ব্যবহার এবং রাগপ্রধান গানের নেপথ্যে বিভিন্ন গীতশৈলী ও বাংলাদেশের পঞ্চগীতি কবির রাগ ভাবনা আলোচিত হয়েছে। রাগপ্রধান বাংলাগান উদ্ভবের পূর্ববর্তী বাংলাগান ও রাগ সংগীতের অবস্থা সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৩য় অধ্যায়ে **রাগপ্রধান বাংলাগানের উদ্ভব ও বিকাশ** শিরোনামে রাগপ্রধান বাংলাগানের সংজ্ঞা, রাগপ্রধান বাংলাগানের বৈশিষ্ট্য এবং কলকাতা ও ঢাকা কেন্দ্রীক রাগপ্রধান বাংলাগান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৪র্থ অধ্যায়ে **রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগরূপ** শিরোনামে শাস্ত্রীয় রাগের সাথে বাংলাগানের রাগের স্বরূপ বিশ্লেষণ, বাদী স্বরের গুরুত্ব, সন্ধিপ্রকাশ রাগরূপ, রাগরূপের সাথে রসের সম্পর্ক, রাগপ্রধান গানে বাণীর গুরুত্ব, ভাবের গুরুত্ব এবং রাগপ্রধান বাংলাগানে রাগের প্রয়োগ ও সার্থকতা আলোচনা করা হয়েছে।

৫ম অধ্যায়ে **রাগপ্রধান বাংলাগানের সুরবৈচিত্র্য** শিরোনামে গানের বাণীর সাথে সুরের সমন্বয় এবং রাগপ্রধান বাংলাগানের সুর বিশ্লেষণ আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট **১, ২, ৩** এ রাগপ্রধান বাংলাগানের শিল্পীদের চিত্র, রাগপ্রধান বাংলাগানের তালিকা সংযুক্ত এবং প্রাথমিক ও দ্বৈতিয়িক উৎস হিসেবে সহায়ক গ্রন্থাবলী, পত্র পত্রিকা, জার্নাল এবং বিভিন্ন তথ্য উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটিতে বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রণীত অভিধান এবং পূর্বসূরী লেখকদের রচনারীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণাকর্মটিতে শিরোনামের আঙ্গিকে রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগরূপ ও সুরবৈচিত্র্য বিশদভাবে আলোচনার মাধ্যমে রাগপ্রধান বাংলাগানের আঙ্গিকগত তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। এই গবেষণাকর্মটি ভবিষ্যতে রাগপ্রধান বাংলাগান সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণার সহায়ক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায় ঃ রাগ ও রাগসংগীত

১.১ রাগের সংজ্ঞা

১.২ রাগ সম্পর্কিত নানা মতবাদ

১.৩ রাগসংগীত ও এর প্রকারভেদ

১.৪ রাগের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ

১.৫ ঠাট ও রাগ

Dhaka University Institutional Repository

রাগ ও রাগসংগীত

সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতেই মানব জাতি শিল্পচর্চার সাথে সম্পৃক্ত। সংগীত মানবসৃষ্ট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের শিল্পগুলোর মধ্যে একটি। মনের ভাব আদান-প্রদান এবং মানসিক পরিতৃপ্তি লাভের অন্যান্য উপায় হল সংগীত। রাগসংগীত ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পচর্চার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন। যুগে যুগে এই রাগসংগীতের মাধ্যমে ভারত অঞ্চলের মানুষ আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে। ধর্মীয় ও সামাজিক সকল আচার অনুষ্ঠানেই ভারতীয় রাগ-রাগিনীর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। 'রাগ' শব্দটি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আলোচ্য গবেষণাকর্মের এই অধ্যায়ে রাগের সংজ্ঞা ও রাগ সম্পর্কিত নানা মতবাদ উল্লেখ পূর্বক রাগের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাগ এবং ঠাট রাগের পর্যালোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

রাগ হল সঙ্গীতের প্রাণ। মনের ভাব প্রকাশের বাহন রাগ। রাগের আবেদন তাই মর্মস্পর্শী। "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়: সঙ্গীত মুচ্যতে"[১] - ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীগণ তাদের সংগীতকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি মিলিয়েই সংগীত। এই তিন শ্রেণির কলাকে একত্রে 'ত্রৌর্মত্রিক'[২] বলা হয়। ভারতীয় সংগীতের সূচনা লগ্ন এই উপমহাদেশের সভ্যতার প্রাক্কালেই নির্ধারিত হয়েছিল। এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের সংস্কৃতি ও ধর্মে ছিল সংগীতের অবিচ্ছেদ্য সম্পৃক্ততা। তবে ভারতে সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মেলে ১৯২২ সালে সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারো এবং পাঞ্জাবের মন্টগোমারী জেলায় হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের পর। মূলত আর্যজাতি আগমনের পূর্বে বিকশিত সর্বপ্রাচীন এ সভ্যতা সবচেয়ে উন্নত জীবন যাপন করত। একে সিন্ধু সভ্যতা বলা হয়। ভারতীয় সংগীতের উদ্ভব এই সিন্ধু সভ্যতার যুগেই হয়েছিল। তবে সংগীতের উদ্ভব এক দিনে সম্ভব হয়নি। আদিম মানুষ খাদ্য-বস্ত্র বাসস্থানের চাহিদা নিবারণ করতে করতেই আধুনিক হয়েছে, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সাথে সাথে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। তবে সংগীতের উদ্ভব নিয়ে দার্শনিকগণ নানা ধরনের মত প্রকাশ করেছেন।[৩]

---

[১]http://dspace.wbpublibnet.gov.in:8080/jspui/bitstream/10689/17952/4/Chapter2_81-160p.pdf accessed at 22 december 2020.

[২]ত্রৌর্মত্রিক- ত্রিমাত্রিক/ Three Dimentional-giving the illusion of depth or varying distances —used especially of an image or a pictorial representation on a two-dimensional medium when this illusion is enhanced by stereoscopic means. https://www.merriam-webster.com/dictionary/three-dimensional accessed at 22 december 2020.

[৩]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ১৩

পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী বলেছেন-

> পৃথিবীর সব দেশেই তাই সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলার চর্চা আছে, ঈশ্বরের উপাসনার জন্য বিধি ব্যবস্থা আছে। আদিমযুগ থেকেই এসব বিষয়ের অনুশীলন মানুষ করে আসছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে, জলবায়ু, সমাজব্যবস্থা, ভাষা ইত্যাদি কারণে এক দেশের সংগীত, সাহিত্যের সঙ্গে অন্যদেশের সংগীত ও সাহিত্যের মধ্যে যেমন প্রভেদ দেখি, তেমনি ঈশ্বরের রূপ এবং ধারণা সম্পর্কেও নানা পার্থক্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যতই প্রভেদ থাকুক না কেন একদিকে সংগীত, সাহিত্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয়তা, অন্যদিকে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার প্রতি আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা সব দেশের মানুষ উপলব্ধি করে। সংগীত, সাহিত্য ইত্যাদি রচনা, ঈশ্বরের উপাসনা সবদেশে সবকালে মানুষ কেন করে ? এই প্রশ্নটি করা স্বাভাবিক। প্রশ্নটির উত্তর একটু চিন্তা করলেই পাওয়া যায়। মানুষ শুধু দেহে সুখ বা আরাম চায় না, মনের আনন্দ এবং আত্মার শান্তিতেই তার পরম তৃপ্তি। ভারতীয় রাগসংগীতের মধ্যে মনের আনন্দ এবং আত্মার শান্তি পাওয়ার উপাদান ও উপকরণ আছে। কেবল ভারতীয়রাই যে সেই শান্তি ও আনন্দ পেতে পারে তা নয়। পৃথিবীর সব মানুষকেই ভারতীয় রাগসংগীত আনন্দ ও শান্তি দিতে পারে। আমার এই সিদ্ধান্ত আমার অভিজ্ঞতালব্ধ।[৪]

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব আর সঙ্গীত মানুষের সেরা সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীতের জন্ম। মানুষের মনের ভাব, অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সঙ্গীতের সৃষ্টি। ফলে সঙ্গীত সৃষ্টির পর থেকেই সঙ্গীতের সাথে মানুষের একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাই সৃষ্টির আদি থেকেই মানব জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সঙ্গীতের উৎস সুপ্রাচীন। আদিকালের মানুষের কণ্ঠস্বরের সৃষ্টি থেকে সঙ্গীতের উৎপত্তি। স্বর তাই সঙ্গীতের উৎস। মানুষ যেদিন থেকে কথা বলতে শিখেছে, সেদিন সঙ্গীতের রূপ আরেক ধারায় অগ্রসর হয়েছে। মানুষের কণ্ঠে ভাষা কোনো রূপ পরিগ্রহ করার আগেই সঙ্গীতের উদ্ভব। কেননা, মানুষ ভাষা সৃষ্টি হওয়ার আগেই সুখ-দু:খ, আনন্দ-বেদনা, রাগ-অনুরাগ অর্থাৎ মনের সকল প্রকার আবেগ প্রকাশের জন্য স্বর ব্যবহার করতো। মানুষের কণ্ঠের স্বরের ক্রমবিকাশের সাথে তার ব্যবহার ক্রমশ সাঙ্গীতিক ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তার কণ্ঠস্বর দিয়ে মানুষের মন আকর্ষণ করার জন্য স্বরযোগে যে মনোহর ধ্বনি প্রয়োগ করত তাই চর্চার মাধ্যমে উৎকর্ষ লাভ করে এবং কালক্রমে সঙ্গীতবিদ্যায় পরিণত হয়। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকেই দ্রাবিড় জাতি ও অন্যান্য অনার্য জাতির বসবাস ছিল। এদের ভাষা-সংস্কৃতি অনুন্নত হলেও তা প্রচলিত ছিল এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এখন পর্যন্ত প্রায় ৭৩টি দ্রাবিড় ভাষার সন্ধান পাওয়া যায় যা বর্তমানে দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কার ভাষার সাথে মিশে আছে। যে জাতি ভাষা ব্যবহার করে, তাদের নিজস্ব সংগীত ও সংস্কৃতি অবশ্যই থাকবে। ভারতের আদিম অধিবাসী অর্থাৎ অনার্যদের প্রয়োগ ছিল খুবই কম। এই

---

[৪]অজয় চক্রবর্তী, *শ্রুতিনন্দন*(কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯) পৃ ১১৯-১২০

সংগীতই পরবর্তীকালে দেশী সংগীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ বিষয়ে মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, একস্বর থেকে চারস্বরযুক্ত গানগুলি মার্গ শ্রেণিভুক্ত নয়, পরন্তু দেশী, শবর, পুলিন্দ, কম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, অন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির মধ্যে চার স্বরযুক্ত গানের তথা দেশী গানের প্রচলন ছিল। মতঙ্গ দেশী ও মার্গ সংগীতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন গানে ব্যবহৃত স্বর সংখ্যার হিসাবে। আবার শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, দ্রাবিড় প্রভৃতি আদিম জাতি সমূহের সংগীতে চার অথবা তার কম সংখ্যাক স্বরের প্রচলন এর উপর ভিত্তি করে তাদের দেশী শ্রেণিভুক্ত করেছেন। অপরদিকে মার্গশ্রেণির আভীরী, সেচ্ছাবাটী, গুর্জরী, কাম্বোজী, পুলিন্দিকা, শবরী, দ্রাবিড়ী, সৈন্ধবী, পৌরালী, বাঙ্গালী, ঠক্কা, কৈশিকী প্রভৃতি রাগগুলিকে অভিজাত বলে গণ্য করেছেন। ষাষ্ঠিক, ক্যাশপ ও দূর্গাশক্তির মত মুনীগণ তাঁর এই মতকে সমর্থন করেছেন। অঙ্গ, বঙ্গ, গান্ধার, পুলিন্দ, কাম্বোজ, নিষাদ, গুর্জর প্রভৃতি জাতি অনার্য সংস্কৃতিসম্পন্ন কিনা এ নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এরা সবাই পুরোপুরি আর্য না হলেও প্রায় সবাই অল্প বিস্তর আর্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল ধারণা করা যায়। ঠিক বিপরীত ভাবে আর্যরাও অনার্যদের কাছ থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষত আর্য সংগীতে বিচিত্র অনার্য রাগ স্থান লাভ করেছে। আর্য ও অনার্য- এই দুই জাতির মিলনের ফলে বৈদিকোত্তর লৌকিক সংগীত, মার্গ ও দেশী সংগীতের মাঝে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে এবং অনেক দেশী সংগীত মার্গ সংগীতের মর্যাদা লাভ করেছে।[৫] এই বিষয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর "*রাগ ও রূপ*" গ্রন্থের ভূমিকাংশে বলেছেন,

> এই নূতনকে অপরিচিতকে - বিদেশীকে ও নবাগতকে স্বাগত করা বা আপনার করিয়া লওয়া ও অনাত্মীয়কে আত্মীয় করিয়া লওয়া ভারতের সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট চরিত্র ও গুণ। আত্মসাৎ করিবার ও পরকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আর্য সংগীতকে যুগে যুগে নূতন শক্তি, প্রকাশ ও পরিণতির সুযোগ দিয়াছে। ভারতের সংগীতের ভাবী পরিণতির ও ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য এই সত্যটি আমদের অবশ্য স্মরণীয় বস্তু।[৬]

অর্থাৎ আর্য ও অনার্য জাতির সংস্কৃতির সাথে স্থানীয় আদিম ভারতীয় নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলেই ভারতীয় সংগীতের নবরূপ সৃষ্টি হয় যা যুগ যুগ ধরে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমেই একটি সুসজ্জিত রূপে আবির্ভূত হয়েছে। ভারতীয় সংগীতের প্রাচীন রূপ মার্গসংগীত কালক্রমে শাস্ত্রীয় সংগীত/উচ্চাঙ্গ সংগীত বা রাগ সংগীত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন মেনে যে সকল সংগীত পরিবেশন করা হয় তাকে শাস্ত্রীয় সংগীত বলে। এই গীতিরীতি দরবারের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল দেখেই একে উচ্চাঙ্গ সংগীত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

---

[৫]দেবব্রত দত্ত, *সংগীততত্ত্ব*-দ্বিতীয় খন্ড(কলকাতা: ব্রতী প্রকাশনী, ২০১২) পৃ ১২-১৬

[৬]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ১০

আবার এই জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে ভারতীয় রাগ সমূহ গাওয়া হয় তাই এই শাস্ত্রীয় নিয়মবদ্ধ গীতি সমূহকে রাগ সংগীত বলা হয়। সংগীতের একটা বিধিবদ্ধ রূপরেখা গঠিত হবার পর প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রীগণ ভারতীয় সংগীতকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। একটি মার্গসংগীত, অপরটি দেশীসংগীত। তবে এই বিভক্তিকরণ সংঘটিত হয়েছে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে। *সংগীত রত্নাকর* গ্রন্থের প্রবন্ধ অধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব গান্ধর্বগানের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে গান্ধর্বগানের দুটি শ্রেণির কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, মার্গ ও দেশী সংগীত।

মার্গ সংগীত বলতে পণ্ডিত অহোবল তাঁর সংগীত পারিজাত গ্রন্থে বলেছেন-

> মার্গাখ্য সংগীতং ভরতায়া ব্রবীৎ স্বয়ম্।
> ব্রহ্মণোহধাত্য ভরতঃ সংগীতং মার্গ সংজ্ঞিতৎ।
> অপ্সরোভিশ্চ গন্ধবৈবঃ শম্ভোরগ্নে প্রযুক্তবান ॥

অর্থাৎ ভরতকে মার্গ সংগীত দিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং ভরত আবার তা শিখিয়েছিলেন অপ্সরা ও গন্ধর্বদের- মহাদেবের নিকট পরিবেশন করার জন্য। মার্গ সংগীত সম্পর্কে শার্ঙ্গদেব তার সংগীত রত্নাকর গ্রন্থে লিখেছেন-

> যো মার্গিত বিরিঞ্চাদ্যৈঃ প্রযুক্তা ভরতাদিভিঃ ।
> দেবসঃ পুরতঃ শম্ভোর্নিয় তোহভ্যুদয় প্রদঃ ॥[৭]

শ্লোকটির অর্থ দু'ভাবে করা যায়। প্রথমত, যখন মার্গ অর্থ পথ তখন শ্লোকের অর্থ দাঁড়ায়, ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রদর্শিত পথে ভরতাদির দ্বারা অপরাপর দেবগণের সম্মুখে যে সংগীত প্রযুক্ত হয়েছিল তাই মার্গ সংগীত। দ্বিতীয়ত, যখন মার্গ অর্থ অন্বেষণ, তখন শ্লোকের অর্থ দাঁড়ায় - বিরিঞ্চি/ব্রহ্মাদি কর্তৃক যা অন্বেষিত হয়ে ভরতাদি কর্তৃক মহাদেব এবং অপর দেবগণের সম্মুখে অভ্যুদয় উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছিল তাই মার্গ সংগীত। শার্ঙ্গদেবের মতে মার্গিত বা অন্বেষিত অর্থাৎ চার বেদ থেকে সংগৃহীত গানই মার্গ সংগীত।[৮] এই প্রাচীন মার্গ সংগীতই কালক্রমে নানা পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রণীত শাস্ত্রীয় নিয়মে আবদ্ধ হয়ে শাস্ত্রীয় সংগীত তথা রাগ সংগীত নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। "রাগ শব্দটি বৈদিক ও বৈদিকোত্তর ক্ল্যাসিকাল যুগে ছিল কি না এ নিয়ে সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় ও মতভেদ আছে। বৈদিকযুগে 'রাগ' শব্দের ব্যবহার ছিল না, কিন্তু তার পুরোপুরি সার্থকতা ছিল।"[৯] বৈদিকোত্তর যুগে সঙ্গীত শাস্ত্রকার মতঙ্গ রচিত 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে রাগ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

---

[৭]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ২৪

[৮]তদেব

[৯]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(১৯৫১), শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা। পৃ ১৫৫

> রাগের সঙ্গে আবার রসের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। কেননা, রাগের মূল উদ্দেশ্য সঙ্গীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, রস সঞ্চার করা, ভাব প্রকাশ করা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাগ ও রাগ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ, কানে মিষ্টি শুনাক তথাপি অনাবশ্যক। ভাবের সহিত ছন্দই কবির আলোচনীয় তেমনি কেবলমাত্র স্বর সৃষ্টি, ভাব না থাকলে জীবনহীন দেহ মাত্র..... সে দেহের গঠন সুন্দর হতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবন নাই।[১০]

অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "ভারতের রাগ-রাগিনীর অনুশীলনের আর একটি বিচিত্র ও উপযোগী রূপকল্পনা ও নানা রস-রূপের চাক্ষুস প্রতিকৃতি অবলম্বন করিয়া এক একটি রাগিনীর রস সত্তার ব্যাখ্যান করিয়া দিয়াছেন ভারতের চিত্রশিল্পীরা।"[১১] ভারতীয় সংগীতের সাথে ধর্ম বিশেষভাবে জড়িত। ভারতবর্ষে প্রচলিত সনাতন ধর্মে সংগীতের বিবরণ পাওয়া যায়। অনেকের মতে, সংগীত স্বর্গীয়। স্বর্গের আদিদেবতা মহাদেব সংগীতের সৃষ্টি করেছেন বলে পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায়। "মহাদেব, দেবী স্বরস্বতীকে পৃথিবীতে সংগীত প্রতিষ্ঠার গুরুভার অর্পণ করেছিলেন। পাশ্চাত্যেও সংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনায় পাওয়া গেছে দেবদেবীর কাহিনী। গ্রীক দেবতা জিউসের নয় কন্যা মিউজকে পাশ্চাত্য সংগীতের স্রষ্টা হিসেবে অভিহিত করেছেন অনেকেই। তবে মানুষ তার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সংগীত প্রতিষ্ঠা করেছে, এটিই মূল কথা।"[১২] সামবেদকেই ভারতীয় সংগীতের উৎস হিসেবে মানা হয়। সামবেদের যুগে আমরা ভারতীয় সংগীতের এক সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পাই। সাম অর্থ সুর অথবা সুমিষ্ট স্বর। ঋক ছন্দের ওপর ঐ সুর সংযোজিত হয় এবং তা থেকেই সামগানের বিকাশ। সাম অর্থ স্বরযুক্ত ঋক এবং স্বরযুক্ত ঋক বা সামের সমষ্টিই সামবেদ।[১৩] "ঋক, যজু, সাম এবং অথর্ব এই চার বেদেই উপনিষদ রয়েছে। উপনিষদ মূলত দার্শনিক তত্ত্বের ভান্ডার। এই সাহিত্য গদ্যে ও পদ্যে রচিত। উপনিষদগুলি হল: ঈশ, কেণ, কঠ, মুন্ডক, ঐতরেয় বৃহদারণ্যক, মৈত্রায়নী তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য প্রভৃতি।"[১৪]

> এর মধ্যে বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় এবং ছান্দোগ্য এই ত্রয়ীর মাঝে সংগীত রয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথমে ওঙ্কারকে উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে ওঙ্কারকে কি কারণে উদগীথ বলা হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয় মন্ত্রে উদগীথকে সামবেদের রস বা সারাংশ বলা হয়েছে। এই উপনিষদে গান, বাদ্য ও নৃত্যের উল্লেখ

---

[১০]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীত চিন্তা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৩৯৯) পৃ ৯

[১১]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ১৩

[১২]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ১৩

[১৩]দেবব্রত দত্ত, *সংগীততত্ত্ব*-দ্বিতীয় খন্ড(কলকাতা: ব্রতী প্রকাশনী, ২০১২) পৃ ৯-১০

[১৪]প্রভাতকুমার গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭

আছে। এতে দেখা যায় যে, যজ্ঞের সময় বিচিত্র ছন্দে যে স্তবপাঠ করা হত তাতে থাকতো ছন্দ (তাল) ও সুর।[১৫]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে উদগান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই উপনিষদে গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙক্তি, জগতী ও নিষ্টুপ এই সাতটি ছন্দ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে সংগীতের খুব সামান্যই আলোচনা করা হয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকে গীতির শিক্ষা সম্পর্কে এবং কণ্ঠ উপনিষদে সম ও নচিকেতা সংবাদে নৃত্যগীতের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৬]

সংগীতের প্রাণ 'রাগ'। 'রাগ' স্বরসমষ্টির সমাবেশ। রাগের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের (সাইকোলজি) একটি স্থান আছে। তাই রাগকে আমরা বলি আন্তর-বাহ্যাবগামী বা 'সাইকো-মেটিরিয়েল' পদার্থ, কেননা বাহ্যজগতে ও মনে তথা অন্তঃকরণে উভয় স্থানেই তার ক্রিয়াচঞ্চল ভাব ও গতি আমরা লক্ষ্য করি। রাগের কাঠামো বাইরের জগতে প্রকাশ পায় কিন্তু তার সংবেদন হয় মনে। এখানেই ব্যাকরণের সংগে সংগে মনোবিজ্ঞানের দেখি সার্থকতা। স্বরগুলি আরোহণ অবরোহণ নিয়ে রাগের রূপ হয় বিকশিত, তখন কথার সম্ভার তাকে করে অর্থবান। আর তখনি সার্থকতা দেখা দেয় সাহিত্যের।[১৭]

"বাংলার রাগ সংগীত সাধনা বা চর্চা ভারতীয় সংগীতের মূল ধারাটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তার ঐশ্বর্যসম্ভার আরোহণ তথা আত্মস্থ করে পুষ্টি লাভ করে। অপরদিকে বঙ্গীয় সৃজনশীল মনীষার সংস্পর্শে ভারতীয় সংগীত পুনরুজ্জীবন তথা নতুন প্রেরণা লাভ করে। ফলস্বরূপ বাংলায় ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা এবং ঠুংরীরীতির চর্চা রীতিমত আরম্ভ হয়।"[১৮] বাংলাগান মার্গ সংগীতের মত বিপুল সংগীতের আদর্শে রচিত না হলেও এই গান বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব সম্পদ। মার্গ সংগীত থেকেই বাংলাগানের উৎপত্তি। তবে রাগপ্রধান বাংলাগান কথাটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। রাগসংগীতের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাগের রূপ ব্যাখ্যা করা। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী প্রভৃতিতে এই রাগরূপ করা ব্যাখ্যা হয়ে থাকে।

---

[১৫]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ১৭

[১৬]তদেব

[১৭]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ২৫

[১৮]মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*(কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩) পৃ ১০৬

১.১ রাগের সংজ্ঞা

'রাগ' শব্দটি অতি প্রাচীন হলেও রাগের নানা রকম সংজ্ঞা বিভিন্ন যুগে গুণী সংগীতজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত হয়েছে। রাগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নানাজন নানাভাবে একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন, তা হল 'রঞ্জকত্ব'। এই রাগের সৃষ্টিকর্তা কে বা কিভাবে এই রাগগুলো এসছে- এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে 'রাগ' নামের একটি বস্তু অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত রয়েছে যা শিল্পী ও শ্রোতা উভয়ের মনে রঞ্জকতার মাধ্যমে অনাবিল প্রশান্তি সৃষ্টি করে। এই রঞ্জকতার উদ্‌গীরণ যে বিশেষ অবয়ব সৃষ্টি করে এবং স্বরের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তা 'রাগ সংগীত' হিসাবে পরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতেই বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীতের মিশ্রণে এক বিশাল পরিধি লাভ করেছে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে রাগ মানে রঞ্জক। এই হলো রাগের সাধারণ আভিধানিক অর্থ। সংগীতের পরিভাষায় রাগ হলো স্বর ও বর্ণের চিত্তাকর্ষক বা প্রীতিকর রচনা। কিন্তু প্রীতিকর স্বর রচনা করলেই তা রাগ হবে না।

এ বিষয়ে Encyclopedia Britannica তে বলা হয়েছে-

> **Raga** , also spelled ***rag*** **(in northern India)** or ***ragam*** **(in southern India)**, (from Sanskrit, meaning "colour" or "passion"), in the classical music of India, Bangladesh, and Pakistan, a melodic framework for improvisation and composition. A raga is based on a scale with a given set of notes, a typical order in which they appear in melodies, and characteristic musical motifs. The basic components of a raga can be written down in the form of a scale (in some cases differing in ascent and descent).[১৯]

রঞ্জনা-শক্তি বা সংস্কার দিয়ে প্রাণীর মনোরঞ্জন বা চিত্তবিনোদন করে যে সকল স্বর তাদের নাম 'রাগ'। কিন্তু লোকের মনোরঞ্জন করলে বা স্বরবর্ণযুক্ত ধ্বনি হলেই যে 'রাগ' পর্যায়ভুক্ত হবে এমন কোন নিয়ম নেই, কেননা অ আ ই ঈ প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলিতে সুরযোজনা করলে তা থেকে পরিপূর্ণ রাগরূপের প্রকাশ পেতে পারে না, অথচ ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি স্বরগুলির বিস্তারের সঙ্গে স্বরবর্ণ ও গ্রহ, অংশ, ন্যাস, বাদী, সংবাদী প্রভৃতির সহায়তা বা প্রলেপ নিয়ে রাগরূপকে প্রকাশ করা সম্ভব।[২০]

---

[১৯] Definition Raga-https://www.britannica.com/art/raga accessed in 25 december, 2020.

[২০]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ১৫

বিভিন্ন সংগীতগুণীদের উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে 'রাগ' সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। ভারতীয় রাগ-রাগিনীকে সংজ্ঞা দিয়ে যতখানি প্রকাশ করা যায়, তার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি প্রকাশিত হয় রাগকে গায়নের মাধ্যমে, রাগের মূল সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করা যায় রাগ সংগীতের মাধ্যমে। সাংগীতিক ভাষায় রাগ শব্দের অর্থ স্বর ও বর্ণের চিত্তাকর্ষক রচনা। "নির্দিষ্ট সপ্তকের অন্তর্গত বিভিন্ন স্বর সমষ্টি যা নির্দিষ্ট স্বরের প্রাধান্য ও স্বর সমূহের ক্রম পর্যায়িক ভিত্তিতে গঠিত এবং যাকে অন্য সুর সমন্বয় থেকে পৃথকীকৃত করা যায়, সেই স্বর সমষ্টিই রাগ নামে খ্যাত।"[২১]

রাগ সম্পর্কে সংগীত শাস্ত্রকরগণ বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। কেউ লিখেছেন-

> 'রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ' অর্থাৎ 'মনোরঞ্জনকারী স্বর সমষ্টিই রাগ'। যোহয়ং ধ্বনি বিশেষস্তু স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ । রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথ্যতে বুধৈঃ। অর্থাৎ বিশেষ স্বর ও বর্ণ বিশিষ্ট যে ধ্বনি মানব মনকে আনন্দ দান করতে পারে তাই রাগ নামে পরিচিত। 'রঞ্জকঃ স্বরসন্দর্ভো রাগ ইত্যভিধিয়তে'। যা লোক রঞ্জক অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ভাল লাগে এমন স্বর সমষ্টির রচনাই রাগ নামে খ্যাত।[২২]
>
> খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার গ্রন্থ নারদী শিক্ষার (খ্রীঃ ১ম শতক) আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, 'রাগ' শব্দ গ্রামরাগের সংগে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু 'রাগ' বলতে কি বোঝায় তার অর্থবোধক কোন বিবৃতি বা বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা সেখানে নাই।[২৩]
>
> মাতঙ্গের বৃহদ্দেশী গ্রন্থে বলা হয়েছে 'রঞ্জ' শব্দ হতে রাগ পদটির উৎপত্তি। 'রঞ্জ' এর মানে হল রঞ্জিত করা বা মুগ্ধ করা। মাতঙ্গ রাগের সংজ্ঞাও দিয়েছেন। তাঁর মতে রাগ হলো কতগুলো স্বরের সমষ্টি বা গতিময় সুর দ্বারা সুশোভিত হয়ে ওঠে এবং যা আনন্দদায়ক সংবেদনশীলতার অনুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। রাগের গভীরতা, উচ্চতা এবং পরিসর নির্ভর করে শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি, অনুভূতির গভীরতার এবং স্বর বিন্যাসের ক্ষমতার ওপর যার মাধ্যমে তিনি কোন বিশেষ ভাবকে জাগ্রত করে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠাতে সক্ষম হন।[২৪]

---

[২১]মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*(কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩) পৃ ৩৮৩

[২২]তদেব

[২৩]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ১৫৬

[২৪]ম ন মুস্তাফা, *আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে*(ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮১) পৃ ৬৪

২.২ রাগ সম্পর্কিত নানা মতবাদ

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে বিভিন্ন প্রকার রাগের ব্যবহার রয়েছে। এই রাগসমূহকে বিভিন্ন সংগীতগুণী যুগে যুগে নানান শ্রেণিবিন্যাসে বিন্যাস্ত করেছেন। *রামায়ণ* ও *মহাভারত* এই দুটি উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ, যার মধ্যে রামায়ণ অধিক প্রাচীনতর। *রামায়ণে* আর্য এবং অনার্যদের যে দ্বন্দ্ব তা দেখানো হয়েছে। পরবর্তীতে রচিত *মহাভারতে* গান্ধর্বগানের জয়জয়কার প্রকাশ পায়। মার্গ ও দেশী সংগীতের বিবর্তনের ইতিহাসে এ দুটি গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। বাল্মিকী *রামায়ণ* রচনা শুরু করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে এবং তা শেষ করেন ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। ঠিক তার ১০০ বছর পরে *মহাভারত* রচনা করেন বেদব্যাস। সুতরাং খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০-২০০ অব্দের মধ্যবর্তী সংগীতের ইতিহাসের তথ্যগুলি এই দুই মহামূল্যবান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বলে জানা যায়। যদিও গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ সাংগীতিক নয়, তবুও তৎকালীন সংগীতের বিবরণ পাওয়া যায়।

> রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে বৈদিক যাগযজ্ঞের মত রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হতো। এই দু শ্রেণির যজ্ঞে গাথা-নারাশংসী ও আখ্যান সূর করে পাঠ করে গান করা হত। গাথা-নারাশংসী হল বীর পুরুষদের প্রশংসাসূচক স্তুতিগান। রাজন্য বর্গ এবং মুনিঋষিদের চরিত্রাবলী ও ক্রিয়াকলাপকে অবলম্বন করে রচিত আখ্যান সুর করে গান করা বা আবৃত্তি করা হত। রাজসূয় যজ্ঞে নৃত্যগীতের আয়োজন থাকতো।[২৫]

একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রামায়ণের যুগে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, পুরোহিত ও মুনিঋষিগণ সংগীত চর্চা করতেন। প্রাচীনভারতে বংশানুক্রমে মুখ মুখে গান করার রীতি ছিল। সামগ ও যাগবিলাসী ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিকদের মধ্যে সামগান সীমাবদ্ধ ছিল। ছিল গন্ধর্ব সংগীতের প্রচলন এবং সাথে বেনু, বীণা ও মৃদঙ্গের সহযোগ। রামায়ণের যুগে গানে মাধুর্যের বা মধুর স্বরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হত। সেই সঙ্গে কথার প্রকাশ ভঙ্গির দিকেও জোর দেওয়া হত। গায়ক ও বাদকেরা শ্রী সম্পন্ন ও সুবেশিত থাকত।[২৬]

ভরত নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায়ে গান্ধর্বগান সম্পর্কে বলেছেন-

> যত্তু তন্ত্রীগতং প্রোক্তং নানা তোদ্য সমাশ্রয়ম্ ।
>
> গান্ধর্ব ক্ষিতি তজজ্ঞয়ং স্বরতাল পদাশ্রয়ম্ ॥৮॥[২৭]

---

[২৫]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ২৫

[২৬]তদেব

[২৭]ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, সম্পাদক ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়(কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন ১৯৯৫) পৃ ৩

এখানে তন্ত্রী শব্দ বলতে বীণাকে বোঝাচ্ছে। নানা তোদ্য বলতে বীণাদি তন্ত্রী বাদ্যযন্ত্র, সুষির বা বাঁশি, ঘন ও মুরজাদি অনবদ্ধ। অর্থাৎ বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে স্বর, তাল ও পদযুক্ত সংগীতের নাম গান্ধর্ব।[২৮]

গান্ধর্ব ত্রিবিধিং বিদ্যা, স্বরতাল পদাত্মকম্ ।

ত্রিবিধস্যাপি বক্ষামি লক্ষণং কর্ম চৈব হি ॥১১॥[২৯]

গান্ধর্ব গানের আঙ্গিক উপাদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এতে রয়েছে স্বর, তাল ও পদ। গান্ধর্ব গানের যে উপাদান স্বর, তাল, পদ এবং তাদের মধ্যে সামান্যভাবে শ্রুতি ও গ্রাম-এর বোধক হলেও নিজস্ব রূপ ষড়জাতি সাতস্বরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। রামায়ণে কুশলব যে গান গাইতেন সেটা গান্ধর্ব সংগীতই। মহাভারতের সমাজেও গান্ধর্ব সংগীত এর প্রচলন ছিল। মহাভারতে গায়ক, নর্তক, স্তোম, বাদক, দেবদুন্দুভি, অপ্সরাদের নৃত্যগীত, গাথাগান, শঙ্খ, বেনু, মৃদঙ্গ, স্তুতি, তাল, লয়, মূর্চ্ছনা প্রভৃতির উল্লেখ আছে।[৩০]

গুপ্তযুগের কবি কালিদাসের কাব্য ও নাট্যগ্রন্থে তৎকালীন সংগীতের অবয়ব ও সংগীত চর্চার নিদর্শন স্পষ্ট। এ সময় গার্ন্ধব ও মার্গ সংগীত লোপ পেয়ে অভিজাত দেশী সংগীতের প্রচলন ঘটে। কালিদাস রচিত গ্রন্থগুলিতে সংগীতের 'রাগ' শব্দটির বহুল ব্যবহার রয়েছে। এ সময় গানগুলি প্রবন্ধ পর্যায়ভুক্ত ছিল। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও দেশী রাগগুলি নির্দিষ্ট ঋতু ও প্রহর মেনে গাওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়াও গুপ্তযুগে সংকলিত মার্কন্ডেয় পুরাণ, বায়ূপুরাণ, বৃহৎধর্ম পুরাণ ইত্যাদিতে সংগীত সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন: সবচেয়ে প্রাচীন বায়ুপুরাণ মার্কন্ডেয় এর ২৩ অধ্যায়ে সংগীতের বিবরণ রয়েছে।[৩১]

পুরাণের অপর এক প্রকার-বৃহৎ ধর্ম পুরাণে প্রত্যক্ষভাবে সংগীতের উল্লেখ রয়েছে। এই পুরাণে সংগীতের রাগকে পুরুষ ও স্ত্রী এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন: ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনী এই বর্গীকরণটি বৃহৎধর্ম পুরাণ হতে প্রাপ্ত। তাছাড়া ৬৬টি শ্রুতি, সাতটি শুদ্ধ স্বর এবং এদের আরোহী অবরোহীক্রমে ৫ কোটি ৫ লক্ষ ১ হাজার রাগ রাগিনীর বিবরণ পাওয়া যায়। ৬ টি প্রধান রাগ এবং ৩৬ টি রাগিনী সহ তাদের পরিচারক এবং পরিচারিকা হিসাবে অন্যান্য রাগ রাগিনীর পরিচয় দিয়েছেন। তবে বর্তমানে প্রচলিত রাগ রাগিনীর সাথে এদের কোন মিল নেই। বৃহৎধর্ম পুরাণে গান্ধারী ও শ্রীরাগের ধ্যানরূপের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র।[৩২]

---

[২৮]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ২৩

[২৯]ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, সম্পাদক ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়(কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন ১৯৯৫) পৃ ৩

[৩০]প্রভাতকুমার গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩

[৩১]তদেব পৃ ৩০-৩১

[৩২]স্বপন নস্কর, *ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা* প্রথম খন্ড(কলকাতা: শিল্পী প্রকাশিকা, ২০০৯) পৃ ৩৯-৪২

ভরতের আগমন এবং তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থ 'নাট্যশাস্ত্র' এর রচনাকাল নিয়ে অনেক মত প্রচলিত। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীনকালে ভরত একটি উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং অভিনেতা বা নটকে 'ভরত' আখ্যা দেওয়া হত। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে একাধিক ভরত নাট্যশাস্ত্রকে সম্পূর্ণ রূপদান করেছেন। "খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ১৮ টি জাতিকরণের পরিচয় পাই। ভরত শুদ্ধ ৭টি + বিকৃত ১১টি জাতি রাগের উল্লেখ করেছেন।"[৩৩] ড. কৃষ্ণমাচারিয়া, ড. ভান্ডারকর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখের মতে ভরতের আবির্ভাব ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। ড. কে. সি পাণ্ডের মতে ভরত খ্রিষ্টীয় চতুর্থ থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। আবার অনেকের মতে, ভরত খ্রিষ্টীয় ৩য় শতকের লোক। মতভেদ রয়েছে, নাট্যশাস্ত্র রচনাকাল নিয়েও। কেউ কেউ একে খ্রিষ্টীয় ২য় শতকের গ্রন্থ মনে করেন। অনেকের মতে, নাট্যশাস্ত্রের সংগীতের অধ্যায়গুলো খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতকে রচিত। তবে ড. মনমোহন ঘোষের মতে, নাট্যশাস্ত্রে সংগীত অধ্যায় (২৮শ-৩৩শ) গুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, খ্রিষ্টীয় ২য় শতকের পূর্বে এই গ্রন্থটি রচনা হয়নি। নাট্যশাস্ত্রের রচনা কাল নিয়ে যতই মতভেদ থাকুক না কেন তা পূর্ণরূপে বিকাশ ঘটে খ্রিষ্টীয় ৮ম শতকে।[৩৪] নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখিত ৬ রাগ ও ৩০ রাগিনীগুলো হল : রাগ - ভৈরব, মালব কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ। রাগিনীগুলো হল ভৈরবী, ললিতা, বরাটী, বহুলী, মধুমাধবী, টোড়ী, খম্বাবতী, কুকুভা, গৌরী, বিদ্যাবতী, রামকেলী, আসাবরী, মালবী, দেবালী, কামোদী, গুর্জরী, কেদারী, গেন্ডা, রুদ্রাবতী, সৈন্ধবী, সোহনী, কাফী, ঠুমরী, বিচিত্রা, মল্লারী, কানাড়া, দেশী, সারঙ্গা ও রতিবল্লভা। "সংগীত মকরন্দে নারদ (২য়) দু রকমভাবে রাগশ্রেণির পরিচয় দিয়েছেন ঃ (১) প্রথম-ভুপাল, ভৈরব, শ্রী-পটমঞ্জরী, নাট, বঙ্গাল, বসন্ত ও মালব; (২) দ্বিতীয়-শ্রী, পঞ্চম, মেঘ, নট নারায়ণ ও ভৈরব। মকরন্দকার রাগ-রাগিনী পুত্র ইত্যাদি বর্গীকরণ স্বীকার করেছেন।"[৩৫] সংগীত শাস্ত্রকার মতঙ্গ *বৃহদ্দেশী* গ্রন্থে সর্বপ্রথম রাগের রঞ্জকত্বের উপর আলোকপাত করেন এবং রাগ গায়নশৈলীর স্পষ্টতা প্রদর্শন করেন। তিনি সংগীতকে নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। অনিবদ্ধ হল আলাপ এবং কথা। রাগ, তাল প্রভৃতি যুক্ত সংগীত হল নিবদ্ধ সংগীত মতঙ্গ স্বরের বিন্যাস এবং উদহরণ সহ কুকুভ, মধ্যমগ্রামিকা, শতবাহিনী, ভোগবর্ধনী, মধুকরী, শকমিশ্রিতা, ভিন্নপঞ্চমী, প্রথম মঞ্জুরী, ছোবাটি প্রভৃতি হিন্দোল রাগের ভাষারাগ ভাবিনী, মাঙ্গালী সৈন্ধবী, গুর্জরী প্রভৃতির পঞ্চমের ও গান্ধারী, পৌরালী, বেদমধ্যমা প্রভৃতি সৌবীরকের ভাষারাগ, শুদ্ধাভিন্না, বরাটি প্রভৃতি ভিন্ন পঞ্চমের ও মাঙ্গালী, দ্রাবিড়ী, নাদাখ্যা, রেবগুপ্তা প্রভৃতি পঞ্চম ষাড়বের ভাষারাগ গুলির পরিচয় দিয়েছেন। রাগ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মতঙ্গ

---

[৩৩]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ২০৬।

[৩৪]দেবব্রত দত্ত, *সংগীততত্ত্ব*-দ্বিতীয় খন্ড(কলকাতা: ব্রতী প্রকাশনী, ২০১২) পৃ ২৯-৩৫

[৩৫]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৭

বলেছেন যে, স্বরধ্বনিযুক্ত (ব্যঞ্জনবর্ণ ও বটে) যে ধ্বনি তরঙ্গ মানুষের মনে প্রীতি ও আনন্দের সঞ্চার করে তাকেই রাগ বলে। চিত্তকে রঞ্জিত করে বলেই তা রাগ। নাট্যপ্রয়োগের উপযোগী সাতটি রাগগীতির উল্লেখ করেছেন। সেগুলির যথাক্রমে; শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগ, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

প্রথমা শুদ্ধা গীতি: স্যাদ্ দ্বিতীয়া ভিন্নকা ভবেৎ
তৃতীয়া গৌড়িকা চৌব রাগ গীতিশ্চ তুর্থিকা ॥
সাধারণী তু বিজ্ঞেয়া গীতজ্ঞৈ: পঞ্চমী তথা।
ভাষাগীতিস্ত ষষ্ঠী স্যাদ্ বিভাষা চৈব সপ্তমী ॥

তিনি আরও বলেছেন যে, গ্রাম রাগ থেকে ভাষারাগ, ভাষারাগ থেকে বিভাষা এবং বিভাষা থেকে অর্ন্তভাষা রাগের সৃষ্টি।[৩৬] *বৃহদ্দেশী* গ্রন্থে রাগ সমূহকে ভাগ করা হয়েছে এইভাবে-

(১) গীতি ৭টি - শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগ, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা।

(২) সাধারণী গীতির মধ্যে শক (সিথীয়ানদের জাতির সুর-বিদেশী), ককুভ, হর্মান (হর্মান শব্দটিও বিদেশী-আর্মোনিয়া), রূপ সাধিত, গান্ধার পঞ্চম, ষড়জ-কৈশিক অর্ন্তভুক্ত। (৩) রাগগীতির মধ্যে টক্ক (টঙ্কী), সৌবীর, মালব পঞ্চম, এড়ব, মালব-কৌশিক, বোট্ট (ভোট দেশ তথা ভূটানের জাতীয় সুর), হিন্দোলক ও টক্ক কৈশিক।

(৪) ভাষাগীতির মধ্যে (১) টক্ক রাগে - ত্রাবণা (ত্রিবেণী) প্রভৃতি ১৬টি দেশী রাগ, (২) সৌবীরক রাগে - সৌবীরী প্রভৃতি ৪টি দেশী রাগ; (৩) পঞ্চমরাগে - আভীরী প্রভৃতি ৮টি (এদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যা, অন্ধ্রদেশীয় আন্ত্রী, গুর্জরী প্রভৃতি আঞ্চলিক রাগ), (৪) ভিন্ন ষড়জ রাগে - বিশুদ্ধাদি ৯টি দেশরাগ (এর মধ্যে কালিন্দী, পুলন্দী বা পুলিন্দিকা প্রভৃতি আঞ্চলিক রাগ), (৫) মালব কৌশক রাগ-শুদ্ধাদি ৮টি; (৬) বোট্টরাগে মঙ্গলা; (৭) হিন্দোলকো-বেসরী প্রভৃতি ৫টি দেশী রাগ ও (৮) টক্ককৈশিক-দ্রাবিড়ী, মালবা ও ভিন্নলতিকা (লালিতা) তিনটি রাগ।[৩৭]

মতঙ্গের *বৃহদ্দেশী* গ্রন্থে রাগের উল্লেখ থাকলে রাগ সম্পর্কিত আরো তথ্য দিয়েছে কবি লোচন তাঁর *রাগ তরঙ্গিনী* গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল জনক-জন্য মেল নির্ধারণ। লোচন ১২টি জনক এর কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হল ভৈরবী, টোড়ী, গৌরী, কর্ণাট, কেদার, ইমন, সারং, মেঘ, ধানশ্রী, পূর্ব, মুখারী এবং দীপক। বর্তমান ঠাট পদ্ধতি লোচনের এই ধারণা থেকে অনুসৃত। রাগ বিশ্লেষণে তিনি শুদ্ধ ও বিকৃত মিলে ১২ টি

---

[৩৬]স্বপন নস্কর, *ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা*(কলকাতা: শিল্পী প্রকাশিকা, ২০০৯) পৃ ৮২

[৩৭]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ২০৬

স্বরের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন। লোচনের সময়ে মার্গ ও দেশী সংগীত এর প্রচলন ছিল। তাঁর মতে প্রাচ্য রাগ ১২টি, এই রাগগুলোই সব রাগের জনক। জনক রাগ থেকেই উৎপন্ন রাগসমূহকে তিনি জন্য রাগ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই রকম প্রায় ৮টি রাগের কথা রাগতরঙ্গিনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তার মধ্যে মেঘ থেকে ১০টি, কেদার থেকে ১টি, কর্ণাট থেকে ২০টি, গৌরী থেকে ২৬টি জন্য রাগ এর উল্লেখ করেছেন।[৩৮] লোচন হনুমন্মতের ছয় রাগ ও তার পাঁচটি করে রাগিনীর উল্লেখ করছেন। এই মত অনুযায়ী রাগ ও তাদের রাগিনী গুলো হল:

ভৈরব - বঙ্গালী, মধু মাধবী, বরাড়ী, সুঘর ভৈরবী ও সৈন্ধবী।

কৌশিক - টোড়ী, খম্বাবতী, গৌরী, গুণক্রী ও কুকুভ।

হিন্দোল - বেলাবল, দেশাখ, রামকিরী, ললিতা ও পটমঞ্জরী।

দীপক - কেদার, কানাড়া, দেশী, কামোদ ও বিহগড়া।

শ্রী - বসন্ত, মালব, মালবশ্রী, ধনাসী ও আসাবরী।

মেঘ- মল্লরী, দেশীকা, ভূপালী, টঙ্কক ও গুর্জরী।[৩৯]

লোচন তাঁর গ্রন্থে ভাটিয়ার, যোগীয়া, মালব, সম্ভোগিনী প্রভৃতি নতুন রাগের বর্ণনা দিয়েছেন। কতিপয় ঐতিহাসিক মতে, তিনিই ঠাট-রাগ ধারণার প্রবর্তক। তৎকালীন প্রচলিত রাগ সমূহকে ১২টি মেল ভূক্ত করেন - ভৈরবী, টোড়ী, গৌরী, কর্ণাট, কেদার, ইমন, সারং, মেঘ, বনাশ্রী, পূর্বা, মুখরী ও দীপক। এই দ্বাদশ মেলের অন্তর্গত প্রায় ৭৫টি রাগ এর পরিচয় পাওয়া যায়। লোচনের উল্লেখিত বহু রাগরূপ এখনো অপরিবর্তিত রূপে টিকে আছে। যেমন: দক্ষিণ ভারতে নীলাম্বরী, দেওগান্ধার বা দেবগান্ধার, সামন্ত সারং, বড় হংস সারং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তীব্রতম মা, কোমল ধা, তীব্রতম নি, কাকলি অর্থাৎ বিকৃত স্বররুপে তিনি ব্যবহার করেছেন।[৪০] শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাসে যে কয়েকজন সংগীত শাস্ত্রবিদ তাঁদের অমরকীর্তির জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে শার্ঙ্গদের অন্যতম। শার্ঙ্গদেব সংগীতের শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক এই দুই বিভাগেই পণ্ডিত ছিলেন। তিনি *সংগীত রত্নাকর* নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শার্ঙ্গদেব ধারাবাহিকভাবে সংগীতের বিস্তারিত ও বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ দিয়েছেন এই গ্রন্থে।

---

[৩৮]স্বপন নস্কর, *ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা*(কলকাতা: শিল্পী প্রকাশিকা, ২০০৯) পৃ ১১০-১১৪

[৩৯]তদেব পৃ ১১২

[৪০]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ৪৭

সংগীত রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব গ্রামরাগরূপে শুদ্ধ, ভিন্নক, গৌড়, বেসরা, সাকিরিত (বা সাধারণ) উপরাগ এবং গর্ন্ধব যাষ্টিকের মতানুযায়ী আরো ১৫টি জনকরাগের পরিচয় দিয়েছেন। "প্রকৃতপক্ষে শার্ঙ্গদেবও পার্শ্বদেবের মতো গ্রামরাগ, উপরাগ, রাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তভাষা, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গভেদে রাগগুলিকে ভাগ করে পরিচয় দান করেছেন। সংগীত রত্নাকরে বিদেশী রাগ হিসেবে শাক, শকতিলক, বোট্ট, তুরষ্কতোড়ী, তুরষ্কগৌড় প্রভৃতি রাগের পরিচয় আছে।"[৪১] রাগের পরিচয়, তাদের ভাবরূপ ও রসরূপ এবং বর্তমানযুগে প্রচলিত বহুরাগের মৌলিক বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এগুলো দেশী রাগের অন্তর্গত। শার্ঙ্গদেবের মতে, রাগের মোট সংখ্যা ২৬৪টি। এই ২৬৪ রাগদের ভিতর গ্রামরাগ ৩০ + উপরাগ ৮ + রাগ ২০ + ভাষারাগ ৯৬ + বিভাষারাগ ২০ + অর্ন্তভাষা রাগ ৪+ রাগাঙ্গ ২১ + ভাষাঙ্গ ২০ + ক্রিয়াঙ্গ ১৫ + উপাঙ্গ ৩০ = ২৬৪ রাগ। অথবা গ্রামরাগ ৩০ + উপরাগ ৮ + রাগ ২০ + ভাষা ৯৬ + বিভাষা ২০ + অর্ন্তভাষা ৪ + (পূর্বপ্রসিদ্ধ) রাগাঙ্গ ৯ + ভাষাঙ্গ ১১ + ক্রিয়াঙ্গ ১২ + উপাঙ্গ ৩ + (অধুনা প্রসিদ্ধ) রাগাঙ্গ ১৩ + ভাষাঙ্গ ৯+ ক্রিয়াঙ্গ ৩ + উপাঙ্গ ২৭ = ২৬৪ রাগ।[৪২] পার্শ্বদেব রচিত গ্রন্থ *সংগীত সময়সার* দক্ষিণ ভারতে অধিক প্রচলিত হয়। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং ১২৬০-৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। পার্শ্বদেব ১০২টির মত রাগ নাম উল্লেখ করেছেন, এর মধ্যে ভৈরব ও ভৈরবী রাগ নাম দুটি সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

পার্শ্বদেবের বর্গীকৃত রাগগুলো হল:

১। রাগাঙ্গ রাগ ২০টি, এর মধ্যে সম্পূর্ণ রাগ ১২টি। এগুলো হল - মধ্যমাদি, শঙ্করাভরণ, টোড়ী, দেশী, হিন্দোল, শুদ্ধবঙ্গাল, আম্রপঞ্চম, ঘন্টারব, সোমরাগ, মালশ্রী, দীপ ও বরাটি। ষাড়বরাগ ৪টি, এগুলো হল - গৌড়, দেশী, ধন্নাসী ও দেশাখ্যা। ঔড়বরাগও ৪টি :- ভৈরব, শ্রী, মার্গহিন্দোল ও গুন্ডক্রী।

২। ভাষাঙ্গ রাগ ৪৮টি। এর মধ্যে সম্পূর্ণ রাগ ২১টি এগুলো হল : কৈশিকী, বেলাবলী, শুদ্ধ, বরাটি , আদিকামোদ, নাট্টা, আভিরী, বৃহদ্দাক্ষিণাত্য, লঘুদাক্ষিণাত্য, পৌরালী, ভিন্ন পৌরালী, মধুকারী, রঙ্গন্তী, গোরঙ্গী, প্রথম মঞ্জরী, সালবাহিনী, নট্টনারায়ণ, উৎকলী, বেগরঞ্জি, তরঙ্গিনী, ধ্বনি, ও নাদন্তরী।

৩। ষাড়ব রাগ ১১টি। এগুলো হল: কর্ণাট বঙ্গাল, সাবেরী, অন্ধালী, শ্রীকণ্ঠি, উৎপলি, গৌড়ী, শুদ্ধা, সৌরাষ্ট্রী, ভম্মানি, সৈন্ধবী ও ছায়া। ঔড়বরাগের সংখ্যা ১৬টি, এগুলো যথাক্রমে- নাগধ্বনি, আহীরি, কাম্বোজ, পুলিন্দি, কচ্ছোলী, চোহারী, গৌড়ী, গান্ধারগতি, ললিতা, ত্রাবণী, ডোম্বকি, কালিন্দি, খসিকা ইত্যদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪। উপাঙ্গরাগ ৩১টি। এর মধ্যে সম্পূর্ণরাগ ১৯ টি - সৈন্ধব বরাটি, অন্তল বরাটি, অবস্থান বরাটি, দ্রাবিড় বরাটি, প্রতাপ বরাটি, স্বরবরাটি, তুরস্ক বরাটি, সৌরাষ্ট্রগুর্জরী, দক্ষিণগুর্জরী, দ্রাবিড় গুর্জরি, কর্ণাট গৌড়, দ্রাবিড় গৌড়, ছায়াগৌড়, লাউলী

[৪১]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ২০৬

[৪২]স্বপন নস্কর, *ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা*(কলকাতা: শিল্পী প্রকাশিকা, ২০০৯) পৃ ৮৯

গৌড়, ভৈরবী, সংহ্লাকামোদ, দেবাল, মহুরি ও ছায়ানট্টা। ষাড়বরাগ ৭টি, যথা : মহারাষ্ট্রগুর্জরী, খংভাতি, গুরুঞ্জি, রামক্রি, হুংজি, মল্লারি ও ভল্লাতি। ঔড়বরাগ ৫ টি, যথা : ছায়াতোতি, দেশালগৌড়, প্রতাপবেলাবলী, পূর্ণটি, মড়ুহাড়।

৫। ক্রিয়াঙ্গরাগ ৩টি, এরমধ্যে ২ টি সম্পূর্ণ রাগ দেবকী ও ত্রিনেত্রকী এবং ষাড়বরাগ ১টি স্বভাবক্রী। এতে পার্শ্বদেব ঔড়বরাগের প্রকার উল্লেখ করেননি।[৪৩]

আনুমানিক ১৪৫০-৬০ খ্রিষ্টাব্দে কল্লিনাথ সংগীত রত্নাকরের টীকা *কলানিধি* রচনা করেন। এর ফলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সংগীত রত্নাকরের জটিলতা দূর হয়। কল্লিনাথের মতে ৬ রাগ ৩৬ রাগিনী নিম্নরুপ-

রাগ		রাগিনী
শ্রী	-	কৌশিকী, দেবগান্ধারী, গৌরী, কোলাহলী, ধবলা ও রুদ্রনী।
বসন্ত	-	পটমঞ্জরী, গুণকেলী, দেশাখ্যা, গোন্ডকিরী, আন্ধালী,ও ধাংকী।
পঞ্চম	-	বরাটী, আসাবরী, ত্রিবনী, আহিরী, ককুভা ও স্তুতীর্থা ।
মেঘ	-	কামোদী, ধনাশ্রী, বঙ্গাল, দেবালী, মধুরা ও দেবতীর্থ।
নট নারায়ণ	-	পূর্বী, গান্ধারী, ত্রিবংকী, তৈলঙ্গী, সিন্ধু মাল্লারী ও রামা।[৪৪]

কর্ণাটকী পন্ডিত পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল রচিত *সদ্রাগচন্দ্রোদয়* গ্রন্থটিতে ঊনিশটি মেল এবং পঁয়ষট্টিটি রাগের পরিচয় রয়েছে। পরবর্তী রচনা *রাগমঞ্জরী*তে আছে বিশটি মেল এবং পঁয়ষট্টিটি রাগ। এছাড়াও পুণ্ডরীকের মৃত্যুর পূর্বে আরো একটি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় যার নাম *রাগমালা*। এতে ছয়রাগ, ত্রিশ রাগিনী এবং তাদের পাঁচটি করে রাগপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৫] "সোমেশ্বরের মতে ৬টি রাগ - শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ ও নট্টনারায়ণ।"[৪৬]

হনুমন মতে রাগ ও রাগিনীদের নাম -

১। ভৈরব-মধ্যমাদি (তথা মধুমাধবী), ভৈরব, বঙ্গালী, বরাটী (বা বরাটিকা) ও সৈন্ধবী

২। মালব কৌশিক- তোড়িকা বা তোড়ী, খম্বাবতী, গৌরী, গুনক্রী (গুনকিরী) ও ককুভা

৩। হিন্দোল - বেলাবলী, রামক্রী (রামকিরী), দেশাখ্যা, পটমঞ্জরী ও ললিতা (ললিত)

---

[৪৩]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ১৬৩

[৪৪]স্বপন নস্কর, *ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা* দ্বিতীয় খন্ড(কলকাতা: শিল্পী প্রকাশিকা, ২০০৯) পৃ ১০৪।

[৪৫]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ৫১

[৪৬]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, প্রাগুক্ত পৃ ২০৬

৪। দীপক - কেদারী (কেদারিকা), কানাড়া, দেশী, কামোদী ও নাটিকা,

৫। শ্রী রাগ - বাসন্তী (বাসন্তিকা), মালবী, মালশ্রী, ধনাশ্রী ও আসাবরী,

৬। মেঘ - মল্লারী, দেশকারী, ভূপালী, গুর্জরী ও টঙ্কী।

হনুমান মতে রাগ সংখ্যা ৬টি + রাগিনী ৫টি ক'রে ৬×৫=৩০, ৩৬টি রাগ ও রাগিনী।[৪৭]

[৪৭]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ২০৮

১.৩ রাগ সংগীত ও এর প্রকারভেদ

ভারতীয় রাগসমূহ গায়নের মাধ্যমেই রাগের চলন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। ভারতীয় রাগ-রাগিনী গায়নের জন্য প্রাচীনকাল হতেই বিভিন্ন ধারার গীতিরীতির প্রচলন রয়েছে। অতি প্রাচীনকাল হতে প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক ইত্যাদি যে সকল তালবদ্ধ গান ও তালবিহীন অনিবদ্ধ গান ছিল তা কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুমরী টপ্পা, তারানা, গজল ইত্যাদি গীত অবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে। নিজস্ব স্বাতন্দ্র্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং গীত অবয়বকে গীতিরীতি বা গায়ন শৈলী বলা হয়। প্রাচীন এই সব গীতিরীতিই পরবর্তীকালে ভারতীয় রাগসংগীতের দুটি প্রধান গীতিরীতি ধ্রুপদ ও খেয়ালের প্রবর্তন ঘটিয়েছে। এর পরবর্তী যুগে আরো দুটি গীতিরীতি টপ্পা ও ঠুমরীর প্রচলন হয়েছিল। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রধান চারটি গীতশৈলীর মধ্যে ধ্রুপদ ও খেয়াল দুটি মূল ধারা এবং টপ্পা ও ঠুমরী এই দুই শ্রেণিকে উপশাস্ত্রীয় ধারায় গণ্য করা হয়। উপশাস্ত্রীয় ধারায় গজল, কাজরী, চৈতী, ভজন, হোরী ইত্যাদি অন্যান্য দেশীয় অংগের গায়ন শৈলী গুলোও রয়েছে। তন্মদ্ধে টপ্পা ও ঠুমরীতে রাগের শুদ্ধতা বেশী ধরে রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। রাগপ্রধান বাংলাগানে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরীর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যদিও রাগপ্রধান গান সৃষ্টির প্রারম্ভে ধ্রুপদাঙ্গীয়/খেয়ালঙ্গীয় গান, বাংলা খেয়াল, বাংলা টপ্পা, বাংলা ঠুমরী ইত্যাদি পরীক্ষামূলক গীতধারার উদ্ভব হয়েছিল। এই গানগুলোকে রাগপ্রধান বলা যায় না। কেননা, এই শ্রেণির গানে হিন্দি কথার স্থলে বাংলা কথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল যা রাগপ্রধান গানের শর্ত পূরণ করে না। ধ্রুপদ খেয়াল কখনই বাংলা ভাষায় যথাযথ ভাব প্রকাশ করতে পারে নি। একারণেই রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টির গতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। রাগ-রাগিনী যথাযথ ব্যবহার বাংলা কাব্যসংগীতে সফলভাবে প্রয়োগ করার মাধ্যমেই রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টি হয়। তবে রাগপ্রধান বাংলাগানে খেয়াল ও ঠুমরীর বৈশিষ্ট্যগুলো অধিক পরিলিক্ষিত হয়, যা উক্ত অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায় গুলোতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় অগণিত রাগ-রাগিনীর সবগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করতে গেলে একটি গবেষণা যথেষ্ট নয়। রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগ রূপ ও সুরবৈচিত্র্য বিষয়ে আলোচনার পূর্বে ভারতীয় রাগ-রাগিনীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক সম্পর্কে উক্ত অভিসন্দর্ভে আলোকপাত করা হল। যেহেতু রাগপ্রধান বাংলাগানে রাগই প্রধান, তাই রাগের সংজ্ঞা, রাগের বৈশিষ্ট্য, ঠাট-রাগ, জনক-জন্য রাগ, রাগ সম্পর্কিত মতবাদ, রাগসংগীতের প্রকারভেদ ইত্যাদি বিশেষ দিকগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে রাগপ্রধান গানে রাগের প্রয়োগকে আরও সহজ ভাবে উপস্থাপন করবে।

"বাংলাদেশে ঠিক কবে থেকে এবং কিভাবে ধ্রুপদ বা খেয়ালের বিকাশ হয় সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কারণ হিন্দুস্থানী রাগ সংগীত বলতে ঠিক যা বোঝায়, বাংলাদেশে তার প্রচার বা প্রসার সম্বন্ধে কোনও প্রামানিক গ্রন্থ বা নিদর্শন আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি।"[৪৮] "প্রাচীন প্রবন্ধের অনুকরণে সৃষ্ট গীত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুফী কব্বাল মুসলমান গায়কদের সহায়তায় আমীর খুসরোর দ্বারা প্রবর্তিত এবং প্রচারিত হয়েছিল। এই বস্তুটি খেয়ালের জনক। প্রথম ধ্রুপদের উল্লেখ পাচ্ছি পঞ্চদশ শতাব্দীতে গোয়ালিয়রের মানসিং তোমরের সময়। তাহলে উপর্যুক্ত থিয়োরি অনুসারে খেয়াল জন্মেছে ধ্রুপদের আগে।"[৪৯] খেয়াল ও ধ্রুপদের উদ্ভব সম্পর্কে কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর *খেয়াল ও হিন্দুস্থানী সংগীতের অবক্ষয়* গ্রন্থে এমনই বলেছেন। ড. উৎপলা গোস্বামী বলেছেন,

> সালগসূড় প্রবন্ধের অন্তর্গত ধ্রুবশ্রেণীর প্রবন্ধে ধ্রুব অংশের উল্লেখ না থাকতে পারে; সে ক্ষেত্রে উদ্‌গ্রাহের দুই অংশের এক অংশই ধ্রুব এর প্রতিনিধিত্ব করত এবং পরবর্তীকালে উদ্‌গ্রাহের এই দ্বিতীয় অংশই 'স্থায়ী' (ধ্রুব=ধ্রু, স্থির হওয়া + অ । সুতরাং এই স্থির থাকা অংশই স্থায়ী) নামে অভিহিত হয়েছে এবং প্রথম অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে। এর পরের অংশ 'অন্তর' পরবর্তীকালে 'অন্তরা' নামে অভিহিত এবং আভোগের (ধ্রুব প্রবন্ধে আভোগের দুটি খন্ড) প্রথম খন্ড 'সঞ্চারী' এবং দ্বিতীয় খন্ডে 'আভোগ' নামে পরিচিত হয়েছে। সাহিত্য রসের ক্ষেত্রে যেমন সঞ্চারী (বা ব্যাভিচারী) ভাব স্থায়ীভাবের পরিণতি রসকে পরিপুষ্টি দান করে তেমনি প্রবন্ধ সংগীতের সঞ্চারী অংশ 'স্থায়ী'তে প্রস্তাবিত আকাঙ্খার পরিপুষ্টি সাধনে সাহায্য করে। সুতরাং বর্তমানের ধ্রুপদ সালগসূড়ের অন্তর্গত ধ্রুবগীতির পরিবর্তিত রূপ। পদ বলতে সমগ্র গানটিকেই বোঝাতো তাই ধ্রুবপদ কথাটি প্রথমে আসে এবং পরবর্তীকালে সংক্ষেপিত হয়ে ধ্রুপদ নামকরণ হয়।[৫০]

ধ্রুপদের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মতামত গুলো পর্যালোচনা করা হল- ধ্রুপদের পৃষ্টপোষকতায় রাজা মান সিং তোমরের অবদান সম্পর্কে N. Augustus Willard তাঁর Music of India (1962) গ্রন্থে উল্লেখ্য করেছেন-

> In the following Years music received futher impetus from rulers, some of whom were excellent musicians them selves. His principal contribution was the rejuvenation of the

---

[৪৮]মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*(কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩) পৃ ৯১

[৪৯]কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *খেয়াল ও হিন্দুস্থানি সংগীতের অবক্ষয়*(কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০৩) পৃ ২১

[৫০]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ৫৫

traditional from of song, Dhrupad (sanskrit Dhruvapada) by his compositions in Hindi. One of these was the Hindu Raja, Man singh Tomwar of Gwalior (1486-1516).[৫১]

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুধাবন এবং বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞদের মতাদর্শ অনুযায়ী আমাদের মনে এই কথাটিই জাগে যে, প্রবন্ধ যুগের প্রচলিত সালগসূড় প্রবন্ধগীতির পরিবর্তনেই ধ্রুপদ এর আবির্ভাব ঘটে। ভিন্নমতে, শুদ্ধ প্রবন্ধ গানের সাথে একাধিক ছায়ালগের মিশ্রণে ধ্রুপদের উদ্ভব ঘটেছে। বলা বাহুল্য প্রচলিত লোকসংগীত বলতে আমরা যা বুঝি সেই অর্থে ধ্রুপদকে লোকসংগীতের ফল বলা যায় না। তবে, প্রবন্ধগান কিভাবে ধ্রুপদ হলো - এ বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

> প্রাচীনকাল থেকে সংগীতচর্চার ধারাবাহিকতায় একটা পর্যায়ে এসে সংগীতের রূপ বা অবয়ব ধ্রুপদ ও খেয়ালে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কেবল ধ্রুপদ ও খেয়ালের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত অনেক পার্থক্য আছে। ধ্রুপদ হচ্ছে ধ্রুবপদ বা স্থির। আমরা আসলে যখন গান করি আমরা একটা শব্দকে ধ্বনিতে প্রকাশ করি। কিছু শব্দ আছে স্থির বা ধ্রুব আবার কিছু শব্দ আছে অস্থির বা চঞ্চল। ধ্রুপদ ভেঙেই করা হয়েছে খেয়াল। অর্থাৎ স্থিরতাকে ভেঙে চঞ্চলতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[৫২]

ধ্রুপদ সম্পর্কে বলা যায় যে, ধ্রুব শব্দটির অর্থ হল স্থির বা পবিত্র এবং পদ শব্দের অর্থ গান। অর্থাৎ ধ্রুপদ শব্দের অর্থ হল স্থির ও পবিত্র গান। অনেকে মনে করেন, 'ধুরপদ' শব্দ থেকে ধ্রুপদের উৎপত্তি। আবার ধ্রুপদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সুপ্রাচীনকাল হতেই 'ধুর্গান' নামক এক প্রকার গান প্রচলিত ছিল যার পরিবর্তিত রূপই ধ্রুপদ।

ধ্রুপদের বৈশিষ্ট্য

১. ধ্রুপদ গানের অবয়ব খেয়ালের চেয়েও বড়। এত চারটি তুক বা বিভাগ রয়েছে। এগুলো হল - স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। কখনও কখনও স্থায়ী ও অন্তরা এই দুই তুক বিশিষ্ট ধ্রুপদকে তিওট বা তেওট বলা হয়।
২. ধ্রুপদ বজ্র ভাষায় রচিত। অনেক গ্রন্থে একে মধ্যদেশীয় ভাষাও বলা হয়। কিন্তু ব্রজভাষার সঙ্গে মৈথিলী অপভ্রংশ বা অবহট্টের প্রভেদ রয়েছে। অবহট্টকে মিথিলায় মধ্যদেশীয় ভাষাও বলা হয়। মধ্যদেশ বলতে তিরহুত অঞ্চলকে

---

[৫১]https://books.google.com.bd/books?id=hGLRqLscf78C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=dhrupad+origin+by+captain+willard&source=bl&ots=gJbDsbr6TU&sig=ACfU3U1FE6G7N51LgEUwHwog3KR7XdaWw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjqmM7F3u7tAhXt6XMBHY4ZDXgQ6AEwDHoECBsQAg#v=onepage&q=dhrupad%20origin%20by%20captain%20willard&f=false/ accessed in 27th December, 2020.

[৫২]অনুপ বড়ুয়া, ধ্রুপদ ও খেয়ালের অলঙ্করণ, *বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা ও গুনীজন*, সম্পাদক শামীম আমিনুর রহমান, (ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ২০১৪) পৃ ৭৬

বুঝায়। তবে ব্রজভাষার সূত্রে অনেক মৈথিলী পদাবলীকে ব্রজবুলি বলে থাকেন। এছাড়াও রাজস্থানী ভাষা, গ্রাম্য হিন্দি ইত্যাদি ভাষাতেও ধ্রুপদ রচিত হয়েছে।

৩. ধ্রুপদ পাখোয়াজ সহযোগে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে দেশী তাল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতি দ্রুত, গুরু, প্লুত এই রকম মাত্রায় নির্দিষ্ট হত।

৪. ধ্রুপদ গাইবার সময় রাগ অবয়ব কঠোর ভাবে মানা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন রাগে ধ্রুপদ গায়ন অত্যন্ত জনপ্রিয়।

৫. ধ্রুপদ গায়কদের কলাবন্ত বলা হয়।

৬. এটি গম্ভীর প্রকৃতির গীতিরীতি

৭. গম্ভীর প্রকৃতি হওয়ার কারনে এই গানে চৌতাল, সুরফাঁক, ঝাঁপতাল, তেওড়া, রূপক, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রৌদ্র , মত্ত, গণেশ, গজঝম্প ইত্যাদি তাল পাখোয়াজে বাজানো হয়।

৮. এই গান প্রধানতঃ বীর, শৃংগার ও ভক্তি রসাত্মক।

৯. ধ্রুপদ বিশেষ অংগের গান, এটি কোমল ও ধীর লয়ের হয়ে থাকে। ধ্রুপদ গাইবার আগে 'ওম, লোম, তোম, তানা, দেরে, দানি ইত্যাদি কিছু অর্থহীন শব্দ দ্বারা আলাপ করা হয়।

১০. ধ্রুপদের গাওয়ার বিশেষ রীতিকে ধ্রুপদের বাণী বলা হয়। এই বাণী চার প্রকার । এগুলো হল -

গোবরহার বা গৌড়হার বা গওহর বানী, খান্ডার বাণী, ডাগর বাণী ও নৌহার বা নওহর বাণী

মুঘল শাসনামলে ধ্রুপদের গাম্ভীর্যময় পদাচারণার মাঝেই খেয়ালের আবির্ভাব ঘটেছিল। খেয়াল গানের উদ্ভব ধ্রুপদের অনেক পরে হয়েছিল। ধ্রুপদের জনপ্রিয়তার ভিরে খেয়াল গান প্রথম দিকে খ্যাত হয় নি, অনেকটা অবহেলিত ছিল বলা যায়। Captain Willard তাঁর ***A Treatise on the Music of Hindoostan*** এ খেয়াল সম্পর্কে বলেছেন, "In the Kheyal the subject generally is a love tale, and the person supposed to utter it, a female. The style is extremly graceful, and replete with studied elegance and embellishment."[৫৩] "খেয়াল মূলত: আরবী শব্দ। যার অর্থ চিন্তা, উদ্দাম, কল্পনা, ভাবনা, যথেচ্ছাচার ইত্যাদি।"[৫৪] অনেকে একে খ্যাল, খয়াল ইত্যাদি বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে খেয়াল গান বলতে স্বভাবই এমন গানের কথা মনে হয়, যা একান্তই কল্পনাত্মক ও গায়কের মর্জির উপর নির্ভরশীল। এই গীতিরীতির নাম খেয়াল হওয়ায় কারণ-বিষয়বস্তু ও কল্পনার দিক থেকে এ গান সম্পূর্ণই গায়কের কল্পনা প্রসূত।

---

[৫৩]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ১১৪

[৫৪]তদেব পৃ ১১২

খেয়াল গান চটুল প্রেমসংগীত। এর বিষয়বস্তু প্রেম ও বিরহাত্মক। প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসা, বিরহ, অভিমান, অপেক্ষা, শাশুড়ি-ননদের সাথে মনোমালিন্য ইত্যাদি বিষয়কে ঘিরেই খেয়ালের বিষয়বস্তু গড়ে ওঠে। কখনও কখনও ঈশ্বর প্রেম, ঈশ্বরস্তুতি, প্রকৃতির বর্ণনাও খেয়ালের বাণীতে পাওয়া যায়। খেয়ালে গাঢ়তা, বদ্ধ কাঠিণ্য না থাকার জন্যই তারল্য তার চরিত্র লক্ষণ। খেয়ালের ধর্ম হল তালবন্ধন থেকে মুক্তি, সুরের রেখায়িত গতি, বিচিত্র সাবলীল প্রবাহ। ধ্রুপদের সাথে খেয়ালের প্রধান পার্থক্য হল, রাগে বিস্তারের ক্ষেত্রে এবং অলংকরণের ক্ষেত্রে খেয়াল গানে স্বাধীনতা অনেক বেশী। খেয়াল গান চঞ্চল প্রকৃতির গান। এর চলন ধ্রুপদের মত গুরুগম্ভীর নয়। সংগত যন্ত্র হিসেবে তবলা খুব জনপ্রিয় এই গানে। খেয়াল সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম মেনে চলে না, গায়কের মর্জি অনুসারে গাওয়া হয়।

খেয়ালের বৈশিষ্ট্য

১. খেয়াল গান চটুল প্রকৃতির শৃংগার রসাত্মক গান।

২. দুইটি তুক থাকে: স্থায়ী ও অন্তরা।

৩. খেয়াল গানে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই, গায়কের মর্জিমত গাওয়া হয়।

৪. প্রায় সব রাগেই গাওয়া হয়। এতে রাগের অবয়ব সম্পূর্ণরূপে মানা হয়। রাগের সময় অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খেয়াল পরিবেশন করা হয়।

৫. বিভিন্ন রকম অলংকার যেমন- মীড়, গমক, লয়কারী, সরগম, তান, গিটকিরি, মুর্কী - ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়।

৬. খেয়াল গান দুই প্রকার, বড় খেয়াল ও ছোট খেয়াল। বড় খেয়ালের পর ছোট খেয়াল গাওয়া হয়।

৭. খেয়াল গান সাধারণত তবলার সংগত করা হয়। বর্তমানে তবলার পাশাপাশি তানপুরা, হারমোনিয়াম, সারেঙ্গী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বেশ জনপ্রিয়।

৮. আ-কার সহযোগে মধ্য ও দ্রুত লয়ে তান করা হয়। এছাড়াও সপাট তান, বোলতান ইত্যাদি করা হয়।

৯. খেয়াল গান হিন্দি, পাঞ্জাবী, উর্দু, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় রচিত।

"অনেকের ধারণা যে আদিরস বিষয়ক গানকেই টপ্পা বলে। কিন্তু তা ঠিক নয়। গানের একটি পৃথক রীতির নাম টপ্পা।.....তবে এর গতি দ্রুত ও প্রকৃতি হালকা হবার দরুণ এটা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গানের উপযোগী নয়। তবে ব্রহ্ম সংগীত টপ্পার সুরে রচিত হয়েছে।"[৫৫] টপ্পা গানের প্রকৃতি খেয়াল অপেক্ষা ভিন্ন। হালকা তান ও গিটকিরি সমন্বিত এই গান আরম্ভের পূর্বে আলাপ করার রীতি নেই, স্থায়ী ও অন্তরা গেয়ে অলংকারযুক্ত বিস্তার করতে হয়। খেয়ালের দ্রুত ও সপাট তান টপ্পার নীতি বহির্ভূত। টপ্পায় জোড়া জোড়া স্বর নিয়ে কথার সঙ্গে মিলিয়ে গমক তান করার

[৫৫]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ২১৩

নীতিকে অনুসরণ করে চলতে হয়। এই গান কণ্ঠে আনা সাধনা সাপেক্ষ। সরল স্বাভাবিক আন্তরিকতার স্পর্শই টপ্পাগানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। টপ্পাতে খডড়া, জমজমা, মুরকী, খট্‌কা, ইত্যাদি অলংকার প্রয়োগ করা হয়। পাঞ্জাবী টপ্পা ৪ প্রকার গায়ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এদেরকে 'বান' বলা হয়। এগুলো হল: লড়িদার, গুথাওদার, ফন্দাদার ও খড্ডাদার। ড. বিমল রায়ের মতে, "খেয়ালের ন্যায় গানের কয়েকটি শব্দের সামান্য বিস্তার দেখাইয়া কথার তান দিয়া গানের মুখে আসা টপ্পার একটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্য তানটি টপ্পার প্রকৃতি অনুযায়ী হইয়া থাকে।"[৫৬] বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী মন্তব্য করেছেন - "Formerly the camelriders of Punjab used to sing Tappa as their folk song but Gholam Nabi of Ayodhya improvised the old form to a great degree by incorporating various Alamkaras and bought it to the standard of classical music."[৫৭]

টপ্পার বৈশিষ্ট্য

১। টপ্পা দুই তুক বিশিষ্ট, স্থায়ী এবং অন্তরা।

২। ভৈরব, খাম্বাজ, কালিংড়া, দেশ, সিন্ধু প্রভৃতি রাগে টপ্পা গাওয়া হয়। তবে কাফী, ঝিঁঝিট, বারোঁয়া, পিলু ইত্যাদি আধুনিক রাগেও টপ্পা গীত হয়।

৩। এর গতি দ্রুত এবং প্রকৃতি হালকা।

৪। যৎ, পাঞ্জাবী, ঠেকা, আদ্ধা, টপ্পা প্রভৃতি তালে গীত হয়।

৫। লয়ের কৌশল টপ্পায় বেশি দেখা যায়। এক একটি শব্দের উপর ছোট ছোট তান ও গমকের সাহায্যে এক অপরূপ ছন্দের হিল্লোল তোলা যায় এই গানে। এই হালকা তানগুলি যখন ঢেউয়ের দোলার মত শব্দের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়, তখনই ফুঠে ওঠে টপ্পা গানের প্রকৃত ভাব রসটি।

---

[৫৬]স্বপন নস্কর, *ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা* দ্বিতীয় খন্ড(কলকাতা: শিল্পী প্রকাশিকা, ২০০৯) পৃ ২৭৩

[৫৭]https://books.google.com.bd/books?id=gQWLaIHjIC&pg=PA146&dq=tappa+song&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiapfTbpZvuAhUuzzgGHXmjAKcQ6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=tappa%20song&f=false,accessed in 14 January, 2021.

টপ্পার গায়কী মূলত খেয়াল ও ধ্রুপদের গায়কী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাচীন রাগের মধ্যে ভৈরব, খাম্বাজ, কালিংড়া, দেশ, সিন্দু, ইত্যাদি রাগে গীত হয়। তবে কাফী, ঝিঁঝিট, বারোঁয়া, পিলু ইত্যাদি আধুনিক রাগেও গীত হয়। যৎ, পাঞ্জাবী ঠেকা, আদ্ধা, টপ্পা প্রভৃতি তালেও গাওয়া হয়। টপ্পা শব্দটি হিন্দী ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ লম্ফ বা লাফ। পাঞ্জাবের উট চালকরা এক প্রকার চটুল গীত পরিবেশন করতেন চলাচলের সময়। উটের পিঠে চলার সময় অতিরিক্ত ঝাঁকুনীতে গায়নরীতিতে বিশেষত্ব তৈরী করেছিল। এই বিশেষ গীত কালক্রমে বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের টপ্পায় পরিনত হয়েছে। কিন্তু টপ্পা গানে করুণ ও বিরহ রসের প্রাধান্য বেশী। টপ্পা গানকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় - প্রেম বিরহের চটুল গীতকেই টপ্পা বলে। অনেকের মতে, টপ্পা প্রাচীন বেসরা গীতিরীতির অনুকরণে গীত হয়। টপ্পা গানের মূল বৈশিষ্ট্য হল- বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সূক্ষ্ম গিটকিরি যুক্ত তান, জমজমা প্রয়োগ করা হয়। খেয়াল ও টপ্পা গানের মত ঠুমরীও প্রাথমিক অবস্থায় সমাজে অনাদৃত ছিল। এই গানে রাগের বিশুদ্ধতা অপেক্ষা ভাবের বিশুদ্ধতার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। এই গানের প্রচলন ছিল শুধুমাত্র বাঈজীদের মধ্যে। কালের বিবর্তনের সাথে মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটলে সংগীত দরবারে ঠুমরী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঠুমরী বা ঠুংরী কথাটি এসেছে হিন্দি 'ঠমক'[৫৮] থেকে। এর অর্থ হল নাচের একটি বিশেষ গতিভঙ্গি। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ঠুংরির(ঠুমরী) পরিচয় প্রথম প্রকাশ করে বললেন- "ঠুংরি অতি ক্ষুদ্র রাগে এবং ক্ষুদ্র তালে রচিত হইয়া থাকে, ইহার সুপারিপাট্য এমন মধুর যে, অতি শীঘ্রই লোকের চিত্ত হরণ করে।"[৫৯] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *'গীতসূত্রসার'* গ্রন্থে বলেছেন- "যে সকল গানে টপ্পার রাগিনীতে এবং আদ্ধো কাওয়ালী ও ঠুংরি তালে গীত হয় তাকে ঠুংরি গান কহে।"[৬০] ঠুংরি বা ঠুমরী একদিকে যেমন তাল হিসেবে পরিচিত অন্যদিকে ঠুমরী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি গীতশৈলী হিসেবে খ্যাত। আবার ক্যাপ্টেন উইলার্ড এর মতে, ঠুমরী একটি রাগ বিশেষ। অনেকে ঠুমরী গানকে প্রচলিত চৈতী বা কাজরী গানের রূপান্তর বলে মনে করেন। ঠুমরীগানের সঠিক উৎপত্তি কাল জানা যায়না। এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে সর্বজনগ্রাহ্য মতটি হল, অষ্টাদশ শতকেই ঠুমরীর প্রচলন ঘটেছিল। অনেকে মত পোষন করেন যে, লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ ঠুমরীর জনক। এই বিষয়ে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। কারণ ওয়াজেদ আলী শাহ ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লক্ষ্ণৌর নবাব ছিলেন। ঠুমরীর প্রচলন তারও অনেক আগে হয়েছিল। তবে ওয়াজেদ আলীর সময়কাল ঠুমরীর স্বর্ণযুগ। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

---

[৫৮]ঠমক- বিশেষ ভঙ্গিমা যুক্ত চলন যা নাচের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

[৫৯]শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা*(কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্স, ১৯৭২) পৃ ১৩৬

[৬০]তদেব

ঠুমরীর বৈশিষ্ট্য

- শৃঙ্গার রসাত্মক ক্ষুদ্র প্রকৃতির গান হলেও ঠুমরীতে কোনরূপ চপলতা চঞ্চলতা নেই।

- ঠুমরীর সুরে দুটি সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়, গাইবার রীতি ও সুর বৈচিত্র্য।

- ঠুমরীর গায়নরীতি ধ্রুপদ, খেয়াল অপেক্ষা ভিন্ন, সরল ও মোলায়েম কণ্ঠে এ গান পরিবেশিত হয়।

- গানের বাণী সংক্ষিপ্ত হলেও রাগ মিশ্রণে এর সুরবৈচিত্র্য অনেক বেশি। এই বৈচিত্র্যকে 'জাংলা' বলে।

- রঞ্জকত্ব ও নিত্যনূতনত্বই হল ঠুমরীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ঠুমরী গানের স্থায়ী অংশের শেষে বাক্যাংশকে সুরবৈচিত্র্যের সাহায্যে বিস্তার করা হয় একে বলে 'বোল বনানা'। এই ক্রিয়ার নানা প্রকার অলংকার ও ক্ষুদ্র প্রকৃতির তান প্রয়োগ করা হয়। বিস্তারের সাহায্যে কলিটিতে যথাযথভাবে পরিস্ফূট করে তার সপ্তকে পৌঁছালে স্থায়ীর পরিসমাপ্তি ও অন্তরার শুরু হয়। এই অংশে গায়ক ইচ্ছামত স্বর সংযোজনেই বিস্তার করে থাকেন। ছোট আকৃতির গীত হলে কি হবে, ঠুমরীর গায়নশৈলী বেশ জটিল এবং এটি গাইবার জন্য বিশেষ তালিমের প্রয়োজন। তৈরী গলা, রাগে বিশেষজ্ঞ ও তালে দক্ষতা না থাকলে ভাল ঠুমরী গাওয়া সম্ভব নয়।

১.৪ রাগের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ

ভারতীয় সংগীতে রয়েছে অসংখ্য রাগ-রাগিনী। এসব রাগ-রাগিনীকে আলাদা ভাবে মনে রাখা ও চিহ্নিত করার জন্য কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হয়েছে। যেমন-

১। প্রতিটি রাগ কোন না কোন ঠাটাশ্রিত হতে হবে। রাগে ব্যবহৃত স্বর সমূহ উক্ত ঠাটের অবয়ব মেনে চলবে। যেমন- ইমন, ভূপালী, হামীর, কেদার এই রাগগুলি কল্যাণ ঠাটের রাগ। এইসব রাগের চলন কল্যাণ ঠাটের কাঠামোকে অনুসরণ করে চলে।

২। রাগে অবশ্যই দশটি লক্ষণ থাকবে। লক্ষণগুলো হল- গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়ত্ব এবং ঔড়বত্ব। প্রাচীনকালে এই দশটি লক্ষণ রাগের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বহন করত। বর্তমানে এই দশ লক্ষণ ব্যবহার প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

৩। রাগে কতগুলো বিশেষ বিশেষ স্বরের ব্যবহার রয়েছে। যেমন- বাদীর স্বর রাগের প্রাণ স্বর। এই স্বর সংশ্লিষ্ট রাগে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। সমবাদী স্বর- বাদী স্বরের পরে যে স্বরটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ তাকে সমবাদী স্বর বলা হয়। ন্যাস স্বর- বিশ্রাম বা বিশ্রান্তি স্বর। একেকটি রাগে দুই বা ততোধিক ন্যাস স্বর থাকে। অনুবাদী স্বর- বাদী সমবাদী ব্যাতিত বাকি সব স্বরকেই অনুবাদী স্বর বলা হয়। বিবাদী স্বর- রাগে যে স্বরটি স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহৃত হয় না তাকে রাগের বিবাদী স্বর বলা হয়। বর্জিত স্বর- রাগে যে স্বরগুলোর প্রয়োগ নিষেধ তাকে বর্জিত স্বর বলে।

৪। রাগে নির্দিষ্ট স্বরবিন্যাস থাকে, যেগুলোকে একত্রে রাগে পকড় বলা হয়। এই স্বরগুলো দ্বারা রাগের পরিচয় প্রকাশ পায়।

৫। রাগের আরোহ-অবরোহ থাকবে।

৬। রাগের আরোহ-অবরোহের স্বর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে জাতি বিভাগ করা হয়। রাগের জাতি প্রধানত তিনটি- সম্পূর্ণ-ষাড়ব-ঔড়ব।

৭। রাগের গায়ন সময় নির্দিষ্ট থাকে। ঋতু ভিত্তিক রাগ ব্যতীত অন্যান্য রাগগুলো দিন বা রাতের নির্দিষ্ট সময়ে গাওয়ার নিয়ম রয়েছে।

৮। রাগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রঞ্জকত্ব। রাগ মানুষের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম ।

৯। পাঁচ স্বরের কম বা সাত স্বরের বেশী স্বর দিয়ে কখনও রাগ হয় না। সব সময় স্বরগুলির চলন ক্রমিক হয় না, কখনও কখনও বক্রগতিরও হয়।

১০। রাগ গাওয়ার জন্য যে সব গীতের অবয়বের আশ্রয় নেওয়া হয় তাকে রাগসংগীত বলে। যেমন- ধ্রুপদ, খেয়াল।

১১। বাদী স্বরভেদে রাগের অঙ্গ নির্ধারণ করা হয়। রাগের অঙ্গ দু'প্রকার; পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ।

১২। প্রতিটি রাগের প্রকৃতি ভিন্ন, রাগের চলন ও প্রকৃতি পরস্পর নির্ভরশীল।

প্রাচীনকালে(যতিযুগ) রাগের শ্রেণিবিন্যাস করা হত রাগে ব্যবহৃত স্বর সংখ্যার ভিত্তিতে। কিন্তু রাগে সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার পর পন্ডিত ব্যক্তিগণ এক রাগ হতে অপর রাগের সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্যের ভিত্তিতে রাগের শ্রেণিপ্রকরণ করতে শুরু করেন। এই শ্রেণির রাগ সমূহকে গ্রামভাষা, অন্তরাভাষা এবং বিভাষা-ভাষা বলা হত, যা পরবর্তী যুগে ক্রিয়াঙ্গ, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ এবং উপাঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। এই শ্রেণি প্রকরণই পরবর্তীকালে শুদ্ধ, শংকর ও ছায়ালগ এই তিন শ্রেণিতে উপণীত হয় এবং এর পরে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীতে ভাগ করা হয়।[৬১]

> রাগের প্রাচীন রূপ যতদূর জানা যায় জাতিগায়ন নামে অভিষিক্ত ছিল। স্বর ও বর্ণযুক্ত সুন্দর রচনা সমূহ ছিল জাতি গায়নের পরিচায়ক। প্রাচীনকালে জাতির ১০ লক্ষণ মানা হত। গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ঔরবত্ব, ষাড়বত্ব, মন্দ্র ও তার, এই লক্ষণ সমূহকে মহর্ষি ভরত দর্শবিধি' জাতি লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। সংগীত রত্নাকর গ্রন্থে জাতির ১৩টি লক্ষণ মানা হয়েছে। অর্থাৎ উপরিউক্ত দশটি লক্ষণ ছাড়াও সন্যাস, বিন্যাস ও অন্তমার্গ এই তিনটি লক্ষণ যুক্ত হয়েছে।[৬২]

রাগের জাতি হল রাগে ব্যবহৃত স্বরসংখ্যা অনুযায়ী রাগের শ্রেণিবিভাগ। আমরা জানি যে, সংগীতে শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়ে মোট ১২টি স্বর রয়েছে। বিভিন্ন রাগে (ঠাট ভেদে) স্বরের কম বা বেশী হতে পারে। তবে রাগগুলি যে ঠাটের অর্ন্তগত তাদের স্বরসংখ্যা ও স্বরবিন্যাস ঐ ঠাটের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হয়ে থাকে। একেকটি রাগে আরোহণ ও অবরোহণ মিলিয়ে তিনভাবে জাতি বিভাগ করা হয় ১। সম্পূর্ণ ২। ষাড়ব ৩। ঔড়ব। সম্পূর্ণ এই অর্থে যে রাগে ৭ স্বরের ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন: ইমন, কাফী। একইভাবে ৬ স্বর ব্যবহৃত হলে তাকে ষাড়ব এবং ৫ স্বর ব্যবহৃত হলে তাকে ঔড়ব বলা হয়। আরোহণ-অবরোহণেও রাগভেদে স্বর সংখ্যা কম বা বেশী হতে পারে। তবে আরোহণ অবরোহণের সমষ্টি অবশ্যই ১২ হবে। এভাবে আমরা রাগের ২৭টি রূপ পেয়ে থাকি। রাগের জাতি বিভাগ রাগের শুদ্ধতা বা মিশ্রণ অনুযায়ীও নির্ধারণ করা যায়। যেমন: যে রাগ অন্য কোন রাগের মিশ্রণে উদ্ভুত হয়নি তাকে শুদ্ধরাগ

---

[৬১]ম ন মুস্তাফা, *আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে*(ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮১) পৃ ৬৫-৬৬

[৬২]মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*(কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩) পৃ ৩৮৩

বলে। যে কোন জনক ঠাটের জন্য রাগই শুদ্ধ রাগ। এরপরে দুটি শুদ্ধরাগ মিশ্রিত হয়ে অথবা যে রাগের মধ্যে অন্যরাগের ছায়াপাত ঘটেছে তাকে ছায়ালগ বা সালঙ্ক রাগ বলে যেমন: নট বেহাগ। আরেক প্রকার শ্রেণি রয়েছে যেখানে শুদ্ধ ও ছায়ালগ রাগের মিশ্রণ ঘটেছে একে সংকীর্ণ রাগ বলে। রাগের এই রূপ শ্রেণিবিন্যাস করার ফলে রাগরূপ নির্ধারণ করা খুব সহজ হয়ে গেছে। ঠাটের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রাগের চলন, জাতিবিভাগ অনুযায়ী রাগের আরোহ অবরোহে স্বরসংখ্যার বিন্যাস এ দুটি বিষয় এই শ্রেণিবিভাগ থেকে বুঝতে পারা যায়। সময় অনুযায়ী রাগের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান অবধি সকাল বেলার রাগ হিসেবে গাওয়া হয়। এছাড়াও ঋতু অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিনীর পরিবেশনরীতি ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সে অনুযায়ী রাগ সংগীতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, দিন-রাতের প্রহর অনুযায়ী রাগ এবং ঋতু অনুযায়ী রাগ। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতে দিন ও রাতের প্রহর অনুযায়ী রাগ-রাগিনী তিনভাগে বিভক্ত-দিবাগেয়, সন্ধ্যাগেয় ও ঊষাগেয়। দিবারাত্রির প্রধান এই তিন সময়কালকে আরও নির্দিষ্ট করে সেনী ঘরানায় রাগিনীর সময়কাল এই প্রকারে নির্ধারিত ঃ

ভোর ৪-৫/৩০ ঃ ললিত, পঞ্চম, ভাটিয়ার , বিভাস ইত্যাদি।

৫/৩০-৭ ঃ মেঘরঞ্জনী, বিভাস, যোগীয়া, কালেংড়া, প্রভাত, রামকেলী, গুণকেলি, ভৈরব ইত্যাদি।

১০-১১/৩০ ঃ ভৈরবী, আশাবরী, টোড়ী, জৌনপুরী, দেশী, খট প্রভৃতি।

১১/৩০-১ ঃ সুহা, সুখরাই, দেওশাখ, সারং ইত্যাদি।

১-৪ ঃ হংসকিঙ্কনী, পটমঞ্জরী, প্রদীপকী, ধানি, ভীমপলশ্রী, ধানশ্রী, পিলু , মুলতান ইত্যাদি।

৫/৩০-৭ ঃ পুরিয়া, মারোয়া, জয়েৎ, মালি গৌরা, সাজগিরি, বরাটি ইত্যাদি।

৭-১০ ঃ ইমন, ভূপালী, শুদ্ধকল্যাণ, জয়েৎ কল্যাণ, চন্দ্রকান্ত, হাম্বীর, কামোদ, শ্যাম, ছায়ানট, বেহাগ, হেমকল্যাণ, নট, মলুহা, শংকরা, দূর্গা, মান্ড, পাহাড়ী ইত্যাদি।

১০-১১/৩০ ঃ খাম্বাজ, ঝিঁঝিঁট, তিলং, খাম্বাবতী, রাগেশ্রী, গারা, সোরট, দেস, তিলককামোদ, জয়জয়ন্তী ইত্যাদি।

১-৪ ঃ দরবারী কানাড়া, আড়ানা, নায়কী কানাড়া, কৌশিকী কানাড়া মালকোষ ইত্যাদি।[৬৩]

আনুমানিক চৌদ্দশো খ্রিষ্টাব্দে রচিত লোচনের *'রাজতরঙ্গিনী'* গ্রন্থে রাগের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছিল। তখনকার উত্তর ভারতীয় সংগীতের উপর প্রামান্য গ্রন্থ হিসেবে এই বইটিতে বহু প্রচলিত রাগের বর্ণনা দেয়া হয়েছিল। মুসলমান কর্তৃক আবিষ্কৃত রাগের উল্লেখ এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। পাটনার জমিদার এবং বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ মোহাম্মদ রেজা কর্তৃক প্রবর্তিত রাগের শ্রেণিবিন্যাসই সর্বকালের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *'নাগমতই-আসফি'* গ্রন্থে তিনি গঠন প্রকৃতির

[৬৩]কিশোর চক্রবর্তী, রসাস্বাদনের প্রক্ষাপটে রাগ রাগিনীর শ্রেণিবিভাজন একটি ভাবনা, সম্পাদক: অনিল আচর্য, অনুষ্টুপ প্রাক্- শারদীয় সংখ্যা, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৪ (কলকাতা: ২০১৪) পৃ ২১-২২

ভিত্তিতে রাগের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। তিনি পুরাতন স্বরগ্রামকে বাদ দিয়ে 'বিলাবল' কে একমাত্র শুদ্ধ স্বরগ্রাম হিসেবে গণ্য করেন। রাগের গঠন ভিত্তিক শ্রেণি প্রকরণকে আরো একধাপ এগিয়ে নেন পন্ডিত ভাতখন্ডে। তাঁর প্রসিদ্ধ *"শ্রী মাললক্ষণ সংগীতম্(*১৯২৯) গ্রন্থে তিনি মালকা বা ঠাটের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন এবং সিদ্ধ বা গৌণ রাগেরও সবিস্তার বিশ্লেষণ করেন। '*নাগমাতই-আসফি*'র গ্রন্থকার মোহাম্মদ রেজার মতোই পন্ডিত ভাতখন্ডে 'বিলাবল'কে শুদ্ধ স্বরগ্রাম হিসাবে গণ্য করেন।[৬৪]

উত্তর ভারতীয় রাগসংগীত তথা হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির রাগ-রাগিনীর শ্রেণিবিভাজন এই প্রকারে করা যেতে পারে- (১) অবয়ব তথা গঠনগত শ্রেণিবিভাগ (২) সময় গত শ্রেণিবিভাগ (৩) রূপ ও রসগত শ্রেণিবিভাগ

ছক ২: ভারতীয় রাগ সংগীত

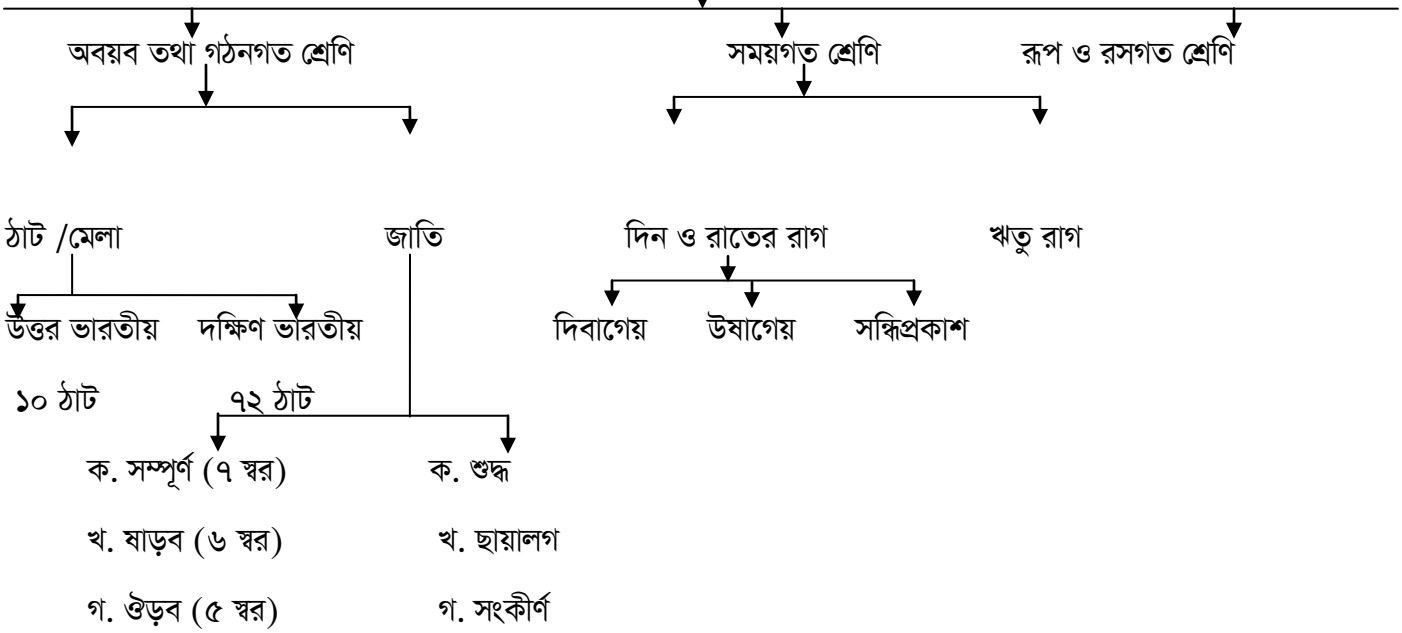

ভারতীয় সংগীতের রাগ পরিবেশনের সময় নির্ধারণ করতে কতগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন : রাগে ব্যবহৃত স্বরানুসারে, অধ্বদর্শক স্বর এবং বাদীস্বর অনুসারে রাগের সময় নির্ধারণ করা হয়। সপ্তকের ১২টি স্বরের মধ্যে থেকে৫টি বা ৭টি স্বর দিয়ে রাগ রচিত হয়। এই রাগ কেবল শুদ্ধ বা শুদ্ধ বিকৃত স্বর সমন্বয়েও রচিত হতে পারে। আর এই স্বর সমন্বয় অনুসারে রাগ পরিবেশনের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে সকাল ও সন্ধ্যা ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত, তবে ব্যতিক্রম হিসেবে ধ স্বরটি শুদ্ধ হতে পারে ; যেমন মারোয়া ঠাটের সন্ধিপ্রকাশ রাগগুলি। কিন্তু ঐ রাগগুলিতে ধ স্বরটি যাই থাকুক না কেন - র এবং গ স্বর দুটি যথাক্রম কোমল শুদ্ধ থাকা অনিবার্য। সকাল ও সন্ধ্যা ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত গাওয়া হয় এমন রাগগুলি হল- সোহিনী, বসন্ত, পরজ, কালিংড়া, রামকেলি, মারোয়া, পূরবী ও বিভাস।

[৬৪]ম ন মুস্তাফা, *আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে*(ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮১) পৃ ৬৬

দ্বিতীয়ত, যে সকল রাগে র, ধ, গ তিনটি স্বরই শুদ্ধ থাকবে তাদের পরিবেশন সময় সকাল সন্ধ্যা ৭টা থেকে ১০টা বা ১২টা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এমন রাগগুলি হল- দেশকার, গৌড় সারং, দূর্গা, বেহাগ, হাম্বীর, কেদার, জয়জয়ন্তী, ইমন, ভূপালী ও শংকরা। তৃতীয়ত, যে সকল রাগে গ ও ন স্বর দুটি কোমল থাকে সেই রাগগুলি পরিবেশনের সময় নির্ধারিত হয়েছে সকল ১০টা বা ১২ টা হতে বিকাল ৪টা এবং রাত ১০টা বা ১২টা হতে ভোর ৪টা পর্যন্ত। যেমন- ভীমপলশ্রী, আসাবরী, ভৈরবী, রাগেশ্রী, কাফী, দরবারী কানাড়া, আড়ানা এবং মালকোষ। রাগসংগীতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাগের রূপ ব্যাখ্যা করা। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী/ঠুংরী প্রভৃতির সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের আলোকেই এই রাগরূপ প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

১.৫ ঠাট ও রাগ

ঠাট বা মেল, ভারতীয় রাগ সংগীতের খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঠাট বা মেল হল রাগের কাঠামো। যদিও ঠাট ধারনার প্রবর্তন রাগের বহুকাল পরে হয়েছে। অসংখ্য রাগ রাগিনীকে একটি নির্দিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঠাটের প্রচলন ঘটেছিল। বর্তমানের রাগের জনক বা পিতা বলা হয় ঠাট কে। অর্থাৎ ঠাট থেকেই রাগের উৎপত্তি। আপাত দৃষ্টিতে তা মনে হলেও ঠাট প্রবর্তন করা হয়েছে রাগ সমূহকে নির্দিষ্ট গোত্রভুক্ত করার উদ্দেশ্যে। একটি ঠাটের অন্তর্গত অনেক রাগ রয়েছে। অতএব সহজ কথায় বলা যায় যে, ঠাট হল একটি স্থান বা পাত্র যেখানে সমগোত্রীয় রাগ সমূহ জমা হয় যারা ঐ ঠাটের সূত্র মেনে চলে। "স্বর সপ্তক, মেল, ঠাট বা থাট একই অর্থবাচক। সংগীত শাস্ত্রোক্ত 'ক্রম' ঠাটেরই অন্য নাম। স্বর সপ্তকের ক্রম অনুযায়ী আরোহণকে ঠাট বলে। ঠাটের স্বরগুলি নিজস্ব ক্রমে উচ্চারিত হয়। ঠাট রাগের নিয়ামক। স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত ভেদে অনেক প্রকারের ঠাট সম্ভব।"[৬৫] ভারতীয় সংগীতের প্রাচীন উপাদান গুলোর মধ্যে ঠাট অন্যতম। ঠাটের প্রচলন নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে, ওস্তাদ আমীর খসরু খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে ২২ টি মোকামে (ঠাট) বিভক্তকরণের মাধ্যমে ভারতীয় ঠাট পদ্ধতির দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। আবার ভিন্ন মতে খ্রিষ্টীয় ১৪শ-১৬শ শতকে মাধব বিদ্যারণ্য ১৫ টি মেলের উল্লেখ করেছেন। বিদ্যারণ্যের পর খ্রিষ্টীয় ১৫শ শতকে *স্বরমেলকলানিধি* গ্রন্থে দক্ষিণী পণ্ডিত রামামত্য ২০ টি মেলের পরিচয় দেন। পণ্ডিত সোমনাথ ৬ রকম ভেদ অনুসারে ২৩ টি মেলের কথা উল্লেখ করেছেন। পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল ১৯ টি মেলের পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগে আধুনিক ঠাট পদ্ধতি প্রণয়ন করেন দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতজ্ঞ বেঙ্কটমখী, তিনি ৭২ টি ঠাটের সূত্র প্রদান করেন যা দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল।

ভারতীয় সংগীতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিন যুগ অবধি নানা রাগ-রাগিনীর আবির্ভাব ঘটেছে। এই দীর্ঘ সময়ে কয়েক হাজার রাগ-রাগিনীর মাঝে অনেকগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে আবার অনেকগুলি পরিবর্তিত হয়েছে। রাগ-রাগিনীর সংখ্যা, শ্রেণি এসব নিয়ে অনেক মতভেদ প্রচলিত। তবে অনেক পরিবর্তন, পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে সংগীত গবেষকগণ ভারতীয় রাগ-রাগিনীর সমূহকে একটা নির্দিষ্ট গঠন কাঠামোর মধ্যে এনেছেন। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও মতামত আলোচনা সাপেক্ষে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে রাগ-রাগিনীর শ্রেণিবিভাজন করেছেন। এই শ্রেণিবিভাজনের ফলে ভারতীয় সংগীতে গাণিতিক সূত্রের মত একটা নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরী হয়েছে এবং ভারতে প্রচলিত রাগ-রাগিনীগুলোর বৈশিষ্ট্য, গায়নশৈলী, সময়, রাগরূপ ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা গেছে। বর্তমান সংগীত জগৎ

[৬৫]কিশোর চক্রবর্তী, রসাস্বাদনের প্রক্ষাপটে রাগ রাগিনীর শ্রেণিবিভাজন একটি ভাবনা, সম্পাদক: অনিল আচর্য, অনুষ্টুপ প্রাক্- শারদীয় সংখ্যা, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৪ (কলকাতা: ২০১৪) পৃ ২০

শাস্ত্রীয় বা উচ্চাঙ্গ, উপশাস্ত্রীয় বা আধুনিক সংগীত নিয়ে পরিব্যপ্ত। লোকসংগীত কোনও যুগের অপেক্ষা রাখে না, সে সর্বকালীন। শাস্ত্রীয় সংগীতের ভেতর ধ্রুপদ, খেয়াল, সাদরা ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য। টপ্পা, ঠুমরী, হোরী, রাগপ্রধান ইত্যাদি সংগীত উপশাস্ত্রীয় শ্রেণিভুক্ত, বাকি সব সংগীতকে সুগম বা আধুনিক সংগীতের আওতায় ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ উল্লেখিত সময়কালে ভারতীয় রাগ সংগীতের এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একদল সংগীতজ্ঞ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে রাগ সংগীতের নানারূপ ব্যবহার করছিলেন। আরেকদল রাগ সমূহের যথাযথ রূপ সংরক্ষণে ব্রত হয়েছিলেন। পন্ডিত ভাতখণ্ডে ছিলেন দ্বিতীয় দলে। এই নিয়মের আলোকেই রতনজনকার এবং ভাতখণ্ডেজির প্রচেষ্টায় ভারতীয় রাগ সংগীতে উত্তর ভারতীয় পদ্ধতি ও ১০ টি ঠাটের প্রচলন ঘটেছিল। উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির বিশেষ দিক হল রাগ-রাগিনীর শ্রেণিবিভাগ। এই শ্রেণিবিভাগ বিভিন্নভাবে হতে পারে যেমন: অবয়ব বা গঠনগত শ্রেণিবিভাগ, সময় অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ, রূপ ও রসগত শ্রেণিবিভাগ ইত্যাদি। প্রথমত, অবয়ব বা গঠনগত শ্রেণিবিভাগ দুইভাবে হতে পারে, ঠাট ও জাতি। ঠাট হল রাগের জনক। স্বর সপ্তকের ক্রম অনুযায়ী আরোহণকে ঠাট বলে। এই আরোহণ বিভিন্নভাবে হতে পারে। স্বরের এই ক্রম অনুযায়ী শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর ভেদে অনেক প্রকার ঠাট সম্ভব। দক্ষিণ ভারতে ৭২টি ঠাটের প্রচলন রয়েছে যা প্রণয়ন করেছেন পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমখী। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী যে দশটি ঠাটের নির্বাচন তথা রচনা করেন তা একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সৃষ্ট অন্যদিকে সৌন্দর্যশাস্ত্রের ভিত্তিতেও গঠিত। যে কারণে অসংখ্য রাগ রাগিনীগুলি পণ্ডিতজীর ঠাট রাগ বর্গীকরণের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

> উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রচলিত ১০টি ঠাটে সবসময় সাতস্বর বর্তমান থাকে কিন্তু রাগে আরোহণ বা অবরোহণকালে এক বা একাধিক স্বরের বর্জিত রূপ একান্তই অপরিহার্য আর এই বিশেষ ব্যাপারটিই ঠাটকে রাগপদবাচ্য করে তোলে। অর্থাৎ ঠাট তথা উপাদানকে রাগে তথা রূপে পরিণত করে। কারণ, ঠাটের স্বাভাবিক স্বরক্রমের বিন্যাসের অন্তর্গত এক বা একাধিক স্বরের বর্জনে তথা স্বরলুপ্তির ফলে উদ্ভুত ব্যপ্তস্থান স্বরের স্বাভাবিক পারম্পর্যকে ভঙ্গ করে একটি বিশেষত্ব দান করে একটি ভঙ্গি বা ঢং সৃষ্টি করে। এই ভঙ্গি বা ভঙ্গিমাই রূপাভাস, রূপ। রাগ তথা রূপসৃষ্টির এটিই অবয়বগতভাবে প্রাথমিক পর্যায়। রূপসৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে থাকে স্বরসপ্তকে ব্যবহৃত স্বর সমূহের নানা প্রকার স্থানিক ভঙ্গিম বিন্যাস। উত্তর ভারতীয় সংগীতে রাগ পদবাচ্যতার শর্তানুসারে ঠাট তথা স্বরসপ্তকের স্বাভাবিকক্রমে এক বা একাধিক স্বর বর্জনের যে অনিবার্য নিয়মটি আছে তার একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত আছে; খুব সম্ভবত কাফী ই একমাত্র রাগ যেখানে ঠাট কাফীর ন্যায় রাগ কাফীতেও কোন স্বর বর্জিত না হয়েও রূপ সৃষ্টি করে।[৬৬]

[৬৬] কিশোর চক্রবর্তী, রসাস্বাদনের প্রক্ষাপটে রাগ রাগিনীর শ্রেণিবিভাজন একটি ভাবনা, সম্পাদক: অনিল আচর্য, অনুষ্টুপ প্রাক্- শারদীয় সংখ্যা, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৪ (কলকাতা: ২০১৪) পৃ ২০

ঠাটের বৈশিষ্ট্য

১। ঠাটে স্বরের ক্রমানুসারে শুধু আরোহণ হয়, অবরোহণ হয় না।

২। ঠাটের মোট স্বর সংখ্যা ৭ টি।

৩। ঠাট গাওয়া বা বাজানো যায় না।

৪। ঠাটে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী, বর্জিত, ন্যাস, পকড়, জাতি অল্পত্ব, বহুত্ব এগুলো হয় না।

৫। ঠাটের কোনও গায়ন সময় নেই।

৬। ঠাটের কোন অলংকার নেই।

৭। ঠাটকে রাগের কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

জনক রাগ ও জন্য রাগ

রাজা রঘুনাথ মাধব বিদ্যারণ্যের সংগীতসার গ্রন্থে প্রতিপাদ্য জনক ও জন্য রাগগুলির উল্লেখ করে বলেছেন -

কর্নাট সিংহাসন ভাগ্যবিদ্যারন্যাভিদ শ্রীচরনা গ্রনীভ্যঃ।

আরভ্য রাগান্ প্রচুর প্রয়োগান্ পঞ্চাশতং(?) চাকলয়ে ষড়ুজ্ঞান

রাগস্তু পঞ্চাশদিহোপদিষ্টা নট্টদয়ঃ সর্ব জগৎ প্রসিদ্ধাঃ

বিদ্যারণ্যের মতে ১৫টি জনক রাগ বা মেল- নট্ট বা নট, গুর্জরিকা বা গুর্জরি, বরাটিকা বা বরাটি (বরালীও), শ্রী, ভৈরবিকা বা ভৈরবী, শংকরাভরণ, আহরিকা বা আহীরি বা আহীরি, বসন্ত ভৈরবী, সামন্ত, কম্বোদি বা কাম্বোধী বা কাম্বোজী, মুখারিকা, মুখারী বা মুখারী বা আহীরি, শুদ্ধরামক্রিয়া, কেদার গৌড় বা কেদারগৌল, হীজুজ্জিকা বা হেজুজ্জী, দেশাক্ষি বা দেশাক্ষী। রঘুনাথ বলেছেন; মেলাঃ ক্রমাৎ পঞ্চদশোপদিষ্টাঃ। বিদ্যারণ্যের এই পনেরটি জনক রাগ বা মেলের পঞ্চাশটি জন্যরাগ নিরুপিত হয়েছে আক্ষিপ্তিকা, রাগ বর্ধনী, বিদারী প্রভৃতির মাধ্যমে।[৬৭]

দশটি মেল (জনকরাগ) নিম্নলিখিত জন্যরাগ গুলির নিয়ামক। জন্যরাগ জনকমেল অথবা মেল রাগ থেকে সৃষ্ট বা উৎপন্ন হয় না, আসলে জন্য রাগগুলি জনক রাগের (মেল বা থাটের) অন্তর্গত বা সম্পর্কিত। জনক রাগের জন্য রাগগুলি হল ঃ

১। কল্যাণমেল- ইমন, শুদ্ধকল্যাণ, ভূপালী, চন্দ্রকান্ত, জয়ৎ কল্যাণ, পুরিযা, হিন্দোল, মালশ্রী, কেদার, হম্বির, কমোদ, ছায়ানট, শ্যাম, কল্যাণ, গৌড় সারঙ্গ।

[৬৭]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ২০০-২০১

২। বিলাবল- শুদ্ধ বিলাবল, শুক্ল বিলাবল, দেবগিরি, ইম্‌নি, ককুভা, নটবিলাবল, লচ্ছাসাখ, শঙ্করা, বিহাগ, দেশকার, হেমকল্যাণ, মলুহা, নট, মাড়, গুণকলী বা গুণকিরী বা (গুণকিরী), পাহাড়ী (পাহাড়িকা), দূর্গা প্রভৃতি।

৩। খম্‌বাজ (খমাজ)- খম্‌বাজ, ঝিঝোটি, সোরটী, খম্‌বাবতী, তিলঙ্গ্‌, (তিলঙ্), দূর্গা, রাগেশ্বরী, জয়জয়ন্তী, তিলোককমোদ, গারা, দেস বা দেশ প্রভৃতি।

৪। ভৈরব- ভৈরব, কলিঙ্গ্‌(কলিঙ্গ্‌ড়া), সৌরাষ্ট্রী, জোগিয়া (বা যোগীয়া), গৌরী, রামকলী, (রামকেলী বা রামকিরী), প্রভাতী, আহীর ভৈরব, আনন্দ ভৈরব, বঙ্গ্‌গাল- ভৈরব, শিবমত-ভৈরব, বিভাস, মেঘরন্‌জনী, গুনক্রী, গুণকরী বা গুণকিরী প্রভৃতি।

৫। পূর্বী- পূর্বী, গৌরী, রেবা, শ্রী, দীপক, ত্রিবেনী (বা ত্রাবনী), মালবী, টঙ্‌কী, জেতশ্রী (বা জৈতশ্রী), বসন্ত, ধনাশ্রী বা ধানশ্রী, পুরিয়া, পরজ, পুরিয়াধানশ্রী প্রভৃতি।

৬। মারবা- মারবা, পুরিয়া, ললিত (বা ললিতা, সোহনী (বা সোহিনী), বরারী (বা বড়ারী), ভাটিয়ার, ভাটিয়ারী, সাজগিরি, মালীগৌরা, পঞ্চম, ললিতা গৌরী, বরাটী (বা বরাটিকা) প্রভৃতি।

৭। কাফী- ধনাশ্রী, সৈন্ধবী, কাফা, ধানী, ভীম পলাসিকা (বা ভীমপলশ্রী), প্রদীপকী, পীলু, হংসকিঙ্‌কিনী (বা হংসকঙ্কনী), বাগীশ্বরী (বা বাগেশ্রী), বহার বা বাহার, সুহা, সঘরাই, দেশাক্ষী কৈশিক, সহানা (বা সাহানা), নায়কী (কানাড়া), সারংগ, মধুমাধবী, শুদ্ধ সারঙ্গ্‌, পটমঞ্জরী, দেবশাখ, হুসেনী (কানাড়া), সিন্ধড়া, সামন্ত, বড়হংস (সারংগ), রামদাসী মল্লার, মীয়ামল্লার, মেঘমল্লার প্রভৃতি।

৮। আসাবরী- আসাবরী, জৌনপুরী, গান্ধারী, খট, সিন্ধু ভৈরবী, দরবারী, কাহ্নাড়া(বা জৌনপুরী) বা কানাড়া, আড়ানা, জিলাফ, দেবগন্ধার প্রভৃতি।

৯। ভৈরবী- ভৈরবী, মালকোশ(মালব কৌশিক), বিলাসখানি (তোড়ী) প্রভৃতি।

১০। তোড়ী- তোড়ী, গুর্জরী (গুর্জরিকা), মুলতান, (মুলতানী), ত্রয়োদশ তোড়ী প্রভৃতি।[৬৮]

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় রাগসংগীতের নানান দিক সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে রাগপ্রধান গানের উদ্ভবের সাথে যোগসূত্র নির্ণয় করেছে। এই অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে রাগপ্রধান গান, রাগরূপ ও সুরবৈচিত্র্য আলোচনার সময় এই অধ্যায়ের আলোচনাগুলো সংযোগ স্থাপন করবে।

---

[৬৮]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ১৮৮-১৮৯

২য় অধ্যায় ঃ বাংলায় রাগসংগীত চর্চা

২.১ বিভিন্ন ধারার গানে রাগের ব্যবহার

২.২ রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টির নেপথ্যে সংগীতগুণীদের অবদান

২.৩ রাগপ্রধান গানের নেপথ্যে বিভিন্ন গীতশৈলী

বাংলায় রাগসংগীত চর্চা

প্রাচীন বঙ্গদেশে রাগের প্রচলন সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় চর্যাপদ হতে। কেননা প্রতিটি পদের শিরোদেশে রাগ নাম উল্লেখ করা আছে। এগুলো হল: পটমঞ্জরী, গবড়া, অরু, গুর্জরী, দেবক্রি, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধানসী, রামক্রী, বরাড়ী, শীবরী, মল্লারী, মালসী-গবুড়া, শবরী ও বঙ্গাল। এগুলো তৎকালীন বাংলার রাগ, যা আরো আগেই এদেশে প্রচলিত ছিল। বাংলায় চর্যাপদ ছাড়াও গীতগোবিন্দ, নাথগীতিকা, মঙ্গলগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলীর প্রচলন ছিল। এসব সাহিত্য নিদর্শন অতি প্রাচীনকাল হতে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বাংলা সাহিত্য এই সব নিদর্শনের প্রতিটির সংগীত বা কাব্যগীত অংশে রাগ রাগিনীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি দরবারী ধ্রুপদ, খেয়ালের সাথে ধীরে ধীরে বাঙ্গালী সংস্কৃতির সম্পর্ক হচ্ছিল। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত ধারায় বঙ্গদেশ অনেকটা এগিয়ে ছিল একারণেই যে এসময় ধ্রুপদ খেয়ালের পাশাপাশি গান বা গীতের প্রচলন সাধারণ মানুষদের মধ্যে অতিমাত্রায় লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। বাংলাগান চর্যাপদ হতে চলে আসলেও এই পদাবলীগুলো মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক উত্থানপতনের কারণে এই অঞ্চলে শিল্প ও সংস্কৃতির বিরাট বিবর্তন সাধিত হয়। এরমধ্যে ইংরেজ শাসনামল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইংরেজরা দীর্ঘ ২০০ বছর ভারতকে শাসন করেছিল এবং ইংরেজ যুগেই রাগসংগীত ও বাংলাগানের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন নতুন গীতিরীতির উদ্ভব হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে হিন্দুস্থানী রাগগুলি ক্রমেই আধুনিকতার স্পর্শে লোক প্রিয় হয়ে ওঠে এবং ভারতের দক্ষিণ-উত্তর অঞ্চলে ধ্রুপদ-খেয়ালের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়। বাংলায় এই রূপ ধরা পড়ে পদাবলীগুলোতে। ভৈঁরো, ভৈরবী, খাম্বাজ, বেহাগ, কাফী, টোড়ী, সিন্ধু, বাগেশ্রী, কেদারা, কানাড়া, পরজ, সোহিনী, ললিত, গৌরী, মল্লার, বিভাস, যোগীয়া, ঝিঁঝিট, সূরট মল্লার, খটযোগিয়া, বিভাসযোগীয়া, ললিতযোগিয়া, মুলতান, কালাংড়া ইত্যাদি রাগে একতালা, কাওয়ালী, পোস্তা, ঠুংরী, ঢিমাতেতালা, জলদতেতালা, তিওট প্রভৃতি তালে নিবদ্ধ পদাবলীগুলো বাংলা গানে আধুনিকতারই ইঙ্গিত দেয়।

ইংরেজ শাসনকাল থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আধুনিক যুগ ধরা হয়। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার আগ মুহূর্তে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ছিল। মুঘল শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার পর উপহাদেশের সংগীতের ইতিহাসের মধ্যযুগের অবসান ঘটে এবং এর পর থেকে বৃটিশ শাসনের আগ পর্যন্ত সময়কাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় বাংলায় ধ্রুপদের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলায় বিষ্ণুপুর নামক অঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল হতেই সংগীত চর্চার ইতিহাস রয়েছে। কথিত আছে যে, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর দরবারের সংগীতগুণী বাহাদুর খাঁ বাংলায়

রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথের দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। তানসেনের বংশধর বাহাদুর খাঁ ই বাংলায় ধ্রুপদ প্রবর্তন করেছিলেন বলে জানা যায়।[১]

গবেষকদের ধারণায় পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, ছোটনাগপুর এর অংশ বিশেষ মিলে বিষ্ণুপুর নামের রাজ্য ছিল। প্রাচীনকালে একে রাঢ় অঞ্চল বলা হত। সমগ্র ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী ধরে নানা রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলেও বিষ্ণুপুর বহুকাল তার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখেছিল। অতি প্রাচীনকাল হতে বিষ্ণুপুর মল্লভূম নামে পরিচিত ছিল। আদি মল্লভূম রঘুনাথ সপ্তম শতকে মল্লরাজ প্রতিষ্ঠা করেন যার সীমারেখা রাঢ় ও উড়িশ্যার মধ্যে বিস্তৃত। এসব মিলিয়েই প্রাচীন বিষ্ণুপুর রাজ্য বাংলা সংগীতের এক অনবদ্য অধ্যায়ের নাম। মল্ল রাজত্বের প্রথম যুগ থেকেই নয়, তার বহুপূর্ব থেকে আঞ্চলিক রাজা ও জমিদারদের সময় রাগসংগীত চর্চার দ্বারা অব্যাহত ছিল বলে জানা যায়। বাংলাদেশে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞদের প্রতুলতা স্বদেশী সংগীত পিপাসুদের ধ্রুপদ শিক্ষা ও চর্চায় আরো আগ্রহী করে তোলে। রামচন্দশীল, গোপালচন্দ্র পাঠক, পরাণ মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণপাল, রামকানাই মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিষ্য হিসেবে তালিম গ্রহণ শুরু করেন। এছাড়াও গদাধর চক্রবর্তীর বংশে শ্যামচাঁদ কানাই, মাধব চক্রবর্তী প্রমুখ গুণী সংগীতজ্ঞের জন্ম হয় যারা বঙ্গে ধ্রপদকে অন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ওস্তাদ রসুল বক্স এর যোগ্য শিষ্য রামদাস গোস্বামী, যিনি শ্রীরামপুরের নিমাইচন্দ্র ঘোষাল, বারানসীর হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের মত প্রতিভাধর ধ্রুপদীয়াকে ধ্রুপদ শিক্ষা দান করেন। অষ্টাদশ শতকে বঙ্গদেশে ধ্রুপদের পাশাপাশি খেয়াল গানের প্রচলন হয়। এই খেয়াল গান কিছুটা ভিন্ন রকম। টপ্পা ও খেয়াল গানের মিশ্রণে এক শ্রেণির খেয়াল প্রবর্তন হয়, এর নাম ছিল টপ খেয়াল। এ সময় বাংলায় বিভিন্ন ধরনের গানের বৈঠকী আসর বসত। কবিয়াল হরু ঠাকুর, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, দেওয়ান রামদুলাল, কবিয়াল রামবসু প্রমুখ সংগীতজ্ঞের রচনায় নতুন ঢং এ উচ্চাঙ্গ সংগীত, টপ্পা, টপখেয়াল ইত্যাদির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন শাস্ত্রীয় রাগ যেমন: বসন্ত, বাগেশ্রী, মুলতান, খাম্বাজ, গৌড়, সাহানা, লুম, ভীমপলশ্রী, পূর্বী ইত্যাদি প্রয়োগে বাংলা গানে নতুনত্বের দেখা মেলে। পাশপাশি ৮ মাত্রার যৎ, ১২ মাত্রার একতাল, ১৬ মাত্রার আড়াতাল, ৩২ মাত্রার মধ্যমান ইত্যাদি তালের ব্যবহার বাংলাগানকে স্বতন্ত্ররূপে বিকশিত করে তোলে। মূলত হিন্দুস্থানী পদ্ধতির খোলস ভেঙ্গে বাংলা গান নিজস্বরূপে আবির্ভূত হয়। নাট্যগীত, পাঁচালী, কবিগান, যাত্রা এসব নতুন নতুন গীতিরীতির আবির্ভাব ঘটে।[২] ভারতীয় বহু খেয়াল গায়ক এর বংশধর ও শিষ্যগণ এ সময়

[১]শর্মিষ্ঠা, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের বিষ্ণুপুর ঘরানা, https://www.sahapedia.org/bhaarataiya-saasataraiya-samgaitaera-baisanaupaura-gharaanaa accessed in 25 December, 2020.

[২]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা* (কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) ১৬৯-১৭২

বাংলাদেশে খেয়াল প্রবর্তন করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক মত অনুযায়ী বাংলাদেশে খেয়ালগানের প্রবর্তন করেন গোপাল মুখোপাধ্যায় (নুলো গোপাল), পণ্ডিত গুরুপ্রসাদ মিশ্র, শিব নারায়ণ মিশ্র, অঘোরনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ সংগীতজ্ঞগণ। তবে নুলো গোপাল এবং অঘোর নাথ চক্রবর্তী ধ্রুপদী ছিলেন। তারা ধীরগতিসম্পন্ন গমক ও তানযুক্ত বিলম্বিত খেয়াল গানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খেয়াল প্রবর্তনের পর বাংলাদেশে নান্নে খাঁ খেয়ালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি তিন লয়-বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত খেয়াল গাইতেন। এরপরে কাল্লে খাঁ ও মৈজদুদ্দিন খাঁ খেয়ালে জনপ্রিয়তা পান। বাংলাদেশে এই তিন গুণী শিল্পীই খেয়ালে প্রথম দ্রুত হলক তান করতেন। বাংলায় খেয়াল গান প্রসারে আগ্রার ফৈয়াজ খাঁ, গয়ার হনুমান দাসজী, নাসিরুদ্দিন খাঁ, গোয়ালিয়রের খলিফা বাদল খাঁ, রানাঘাটের নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গভূমে ধ্রুপদ খেয়াল চর্চাকে আরো প্রসারিত করতে বাংলায় রচনার তাগিদ অনুভূত হয়, কেননা এই অঞ্চলে সবাই বাংলা ভাষাভাষী। এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন বিষ্ণুপুরের রামশংকর ভট্টাচার্য। তিনি অবশ্য বাংলা ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন। অত:পর তার উত্তরসূরী রঘুনাথ রায় এবং কার্তিকেয় চন্দ্র রায় বাংলায় খেয়াল রচনার পথ প্রদর্শন করেন। হিন্দুস্থানী গীতিরীতি অবয়বে এই সময় প্রচুর বাংলাগান রচনা হয়েছিল। এই সময়ের খ্যাতিমান সংগীতজ্ঞদের মধ্যে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, বিষ্ণুচক্রবর্তী, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, হরেন্দ্রশীল, রামশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, লালচাঁদ বড়াল, গিরিজা শংকর চক্রবর্তী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকে বাংলা সাহিত্যপ্রেমীর মধ্যে ভারতীয় রাগ-রাগিনীর প্রতি প্রবল অনুরাগ দেখা দেয়। ফলে বাংলার সংগীত ও সাহিত্যপ্রেমীগণ হিন্দুস্থানী রাগে, হিন্দুস্থানী স্টাইলে বাংলাগান রচনা শুরু করেন। শুধু তাই নয় বাংলা ধ্রুপদ, বাংলা খেয়াল ও বাংলায় টপ্পা রচনা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলায় রাগের প্রচলন আগেই ছিল, এ সময় শুধু হিন্দুস্থানী স্টাইল এবং রাগ গাইবার ধরন অনুসরণ করা হল, যা কি না পরবর্তীযুগে রাগপ্রধান বাংলাগান উদ্ভবের সহায়ক ছিল।[৩] অষ্টাদশ শতকের বাংলাগানে রাগ-রাগিনীর ব্যবহার আলোচনা করতে গেলে রামনিধি গুপ্তের বাংলা টপ্পা গানের কথা বলতে হয়, যেগুলো শোরী মিয়ার টপ্পাকে অনুসরণ করে রচিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত শোরী মিয়ার টপ্পারীতি বাংলাগানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বিখ্যাত গায়ক রসুল বক্স বলেছেন-"ভাষার দিকে নজর না দিলে নিধুবাবুর টপ্পা আর শোরী মিয়ার টপ্পায় কোন পার্থক্যই নাই।"[৪] নিধুবাবুর বাংলা টপ্পাই টপ্পা গানকে বিখ্যাত করেছিল। বাংলা টপ্পাগানের সাথে শোরী মিয়ার টপ্পার অনেক পার্থক্য রয়েছে। নিধুবাবুর বাংলা ভাষা ও বাংলা

---

[৩]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা* (কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) ১৭২-১৭৮

[৪]তদেব। পৃ ২১৫

গানের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল বলেই তিনি বাংলা টপ্পাগুলোকে আলাদাভাবে নিজস্ব ষ্টাইলে প্রণয়ন করেন। এ বিষয়ে নিধুবাবু মন্তব্য করেছেন- "এই গীত সকলে আলাপচারির দ্বারা যে সকল তান বসিয়াছে তাহা কোন হিন্দুস্থানী খ্যাল ও টপ্পার সুরে গীত রচনা করিয়ে দেওয়া এমত নহে, অথচ গানকরণ মাত্র রাগরাগিনীর রূপ অবিকল বুঝাইতেছে।"[৫] অর্থাৎ শোরীর টপ্পা ও নিধুবাবুর টপ্পার পার্থক্য শুধু ভাষায়। কিন্তু গবেষণা বলছে, শোরীর টপ্পা ছিল ক্ষীপ্র গতি সম্পন্ন যা নিধুবাবু অনেকটাই লাগাম দিয়েছিলেন বাংলা গানের কথা যতই হিন্দির অনুবাদ হোক না কেন বাংলা ভাবের সাথে হিন্দি ভাব কখনই মিলবে না। বাংলা কাব্য সংগীতের সাথে চঞ্চলগতি বেমানান লাগে তাই বাংলাসংগীত সম্পর্কে জ্ঞাত নিধুবাবু তাঁর রচিত টপ্পা গানে দিলেন নতুন ছন্দ, নতুন এক রূপ। এছাড়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের রচিত পদেও রাগের ব্যবহার লক্ষ্য করা গিয়েছে। "নিধুবাবুর টপ্পার ভাষা ছিল বাংলা। তাই হিন্দী গানের রাগ-রাগিনীর নিয়ম ও তার গায়কী এই গানে প্রাধান্য পায়নি। বাণী ও রাগিনীকে সমান ভাবে মিশিয়ে নিতে চেয়েছিলেন বলে মূল টপ্পার গায়কীর অনেকখানি তিনি বর্জন করেছিলেন। তাই হিন্দীর তুলনায় বাংলা টপ্পা কিছুটা সহজ হয়েছিল।"[৬] নিধুবাবুর টপ্পা বিষয়ে শান্তিদেব ঘোষ আরও বলেছেন- "নিধুবাবুর টপ্পা গানের প্রতি তখনকার দিনের ধনী ও শিক্ষিত সমাজের খুবই আকর্ষণ ছিল। এর একটি বড় কারণ হল গানের বিষয়বস্তু। নিধুবাবু রচনা করেছিলেন প্রেমের গান।"[৭]

বাংলাগানে আদিযুগ হতেই রাধা কৃষ্ণের প্রেমের বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। নিধুবাবু সেই প্রথায় নতুনত্ব আনলেন, রচিত হল মানব প্রেমের গান। উনিশ শতকের সংগীতগুণীদের মধ্যে একটি বিষয়ে অন্ত্যমিল ছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই নামধারী ওস্তাদদের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতে তালিম প্রাপ্ত ছিলেন। একারণেই বাংলাগানের এই শতকের ধারায় রাগ-রাগিনীর ব্যবহার ছিল বেশী। শাস্ত্রীয় ঢং এ রচিত গানগুলো তো বটেই নাটকের গান, পাঁচালী, যাত্রাগান, কবিগান, কথকতা, কীর্তন, বাংলা টপ্পা ইত্যাদি দেশী রীতির গানেও রাগের সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ যে রাগ সংগীত শাস্ত্রীয় নিয়মে সকলকে বাঁধতে পারেনি তা লোক মুখে ছড়িয়ে যেতে লাগলো বাংলা গানের ধারায়।

---

[৫]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ২১৮

[৬]শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা*(কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭২) পৃ ৭১

[৭]তদেব । পৃ ৭০

২.১ বিভিন্ন ধারার গানে রাগের ব্যবহার

বর্তমানকালে রাগের ভাবকে বিস্তৃতভাবে প্রকাশের জন্য বাংলা ভাষায় প্রচলিত যে সমস্ত গীতিরীতি রয়েছে তার অধিকাংশই উত্তর ভারতীয় গীতিরীতির অনুকরণ। রাগ প্রযুক্ত বাংলা গানকে মূলত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) বাংলা ধ্রুপদ (খ) বাংলা খেয়াল গান (গ) বাংলা ঠুংরী গান (ঘ) বাংলা টপ্পা গান এবং (ঙ) বাংলা রাগ প্রধান গান। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের সাংগীতিক রাজধানী বিষ্ণুপুরে অন্যান্য প্রকার বাংলা রাগ সংগীতের চর্চা থাকলেও বাংলা রাগ প্রধান নামে কোন গীত প্রকারের চর্চার কথা জানা যায় না।[৮]

ষোড়শ শতকের শেষের ভাগে নরোত্তম দাস ঠাকুর(১৫৫০-১৫৮৭) খেতুরী উৎসবে ধ্রুপদী ঢং এর গরানহাটি ধারার এক প্রকার কীর্তন প্রবর্তন করেছিলেন। "কথিত আছে নরোত্তম দাস বৃন্দাবনের ধ্রুপদ গান শিক্ষা লাভ করে বাংলায় নিজস্বরীতি কীর্তনে তা প্রয়োগ করেন। সম্ভবত এই কীর্তন গানই প্রথম বাংলাগান যাতে রাগের রূপ বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করার সুযোগ ছিল।"[৯] এই ধারার সাথে আঞ্চলিক সুর মিশ্রিত হয়ে আরেক প্রকার কীর্তন প্রচলিত হয়। অষ্টাদশ শতকে সেই কীর্তন গান নতুন রূপে 'ঢপকীর্তন' নামে আবির্ভূত হয়। এই নবরূপ প্রদান করেন বাংলাদেশের যশোর জেলার মধুসুদন কিন্নর বা মুধুকান (১৮১৩-১৮৬৮)। তিনি রাগসংগীত ও লোকসংগীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর ঢপকীর্তনে এই দুই ধারায় মিশ্রণের ছাপ রয়েছে। মধুকান(১৮১৩-১৮৬৮) এর ঢপকীর্তনগুলি পরজ, জয়জয়ন্তী, দেবগিরি, বিভাস, সুরট, সুরমল্লার, বেহাগ, ভৈরবী, খাম্বাজ, কালাংড়া, সিন্ধুবাহার, সোহিনী ইত্যাদি রাগে নিবদ্ধ।[১০] খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে বাংলাগান সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন সত্ত্বায় বিকশিত হয়। এ সময় ইংরেজী সাহিত্য সংস্কৃতি বাংলায় প্রবেশ করে এবং কতিপয় ধর্নাঢ্য ব্যক্তি সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তখন ভারতবর্ষে একই সাথে তিন ধরণের সংগীত পাশাপাশি চলছিল- ভারতীয়, বাঙালী ও পাশ্চাত্য। কখনও কখনও এই তিন শ্রেণির মিশণও লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুস্থানী সংগীত যেমন দিল্লী কেন্দ্রীক ছিল, ঠিক তেমনি বাংলাগানের শুরুটা ছিল কলকাতা কেন্দ্রীক। কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে বাংলাগানের বিকাশ শুরু হয়। অষ্টাদশ শতকে রামনিধি গুপ্ত(১৭৪১-১৮৩৯) কলকাতায় এসে টপ্পা আঙ্গিকে বাংলাগান রচনা করেন এবং বাংলা গানের একশ্রেণির শ্রোতা সমাজ তৈরী করে ফেলেন। যদিও বঙ্গে তখন হিন্দুস্থানী সংগীতের দাপট; পাশাপাশি পাশ্চাত্য সংগীতের সাথে বাঙালিদের খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টা চলছিল। এর মধ্য দিয়ে বাংলাগানের যাত্রা শুরু হল আর এমনি পুরো বঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল তার সুরধারা। আঠারশ শতককে তাই বাংলাগানের রূপ পরিবর্তনের যুগ ধরা হয়, ঠিক যেমন শীতের

---

[৮]ড. অসিত রায়, *সংগীত অন্বেষা*(ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি,২০১৯) পৃ ১২৩

[৯]তদেব। পৃ ৩১-৩২

[১০]স্বপন নস্কর, *ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা*(কলকাতা: শিল্পী প্রকাশিকা, ২০০৯) পৃ ৯৭

সব জড়তা কাটিয়ে প্রকৃতিতে ফুল পল্লবের সমাহার নিয়ে ঋতুরাজ বসন্ত আসে। ঊনবিংশ শতকের বাংলাগানে মিশ্ররাগের ব্যবহার অধিক পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ের আধুনিক বাংলাগান রচয়িতাদের মধ্যে নিধুবাবুর(১৭৪১-১৮৩৯) টপ্পা, দাশরথি রায়ের (১৮০৬-১৮৫৭) পাঁচালী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৮৭) কবি গান, হরু ঠাকুরের(১৭৪৯-১৮২৪) বাংলাগান, কালী মীর্জা(১৭৫০-১৮২০), শ্রীধর কথক (১৮৫৭) প্রমুখ ব্যক্তিদের বাংলাগানে মিশ্র রাগ-রাগিনীর উপস্থিতি ছিল সরব। কৃষ্ণযাত্রায় অনেকটা পদাবলী কীর্তনাঙ্গের মত বিভিন্ন রকম রাগের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হল - বাগেশ্রী, বেহাগ, ভৈরবী, ললিত, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, জয়জয়ন্তী, মূলতান, গৌড়সারং, দেবগিরি, গারা, সিন্ধু, ভৈরব, সিন্ধু মল্লার, মালকোষ, ভাটিয়ার, সুরটমল্লার, ভেঁরো, কালাংড়া, বিভাস, যোগিয়া, গৌরী, রামকেলী, বসন্ত, মল্লার, বাহার, সুরট ইত্যাদি। পাশাপাশি যাত্রাগানে একতাল, যৎ, চৌতাল, আদ্ধা, ঝাঁপতাল, লোফা, দশকোশী, রূপক মধ্যমান, সুরফাঁক, আড়া, তেত্তট, পোস্তা, সওয়ারী ইত্যাদি তাল প্রয়োগ করা হত, যা পরবর্তীকালে রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টির নেপথ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। অনেকের মতে কালীমীর্জার(১৭৫০-১৮২০) বাংলা টপ্পাগান নিধুবাবুর পূর্বেই প্রচলিত ছিল, তবে তা অভিজাত শ্রেণির মাঝে। কালী মীর্জার মত এমন সুসংবদ্ধ বাংলা রচনা সচরাচর দেখা যায়না। তাঁর রচনায় নিধুবাবুর টপ্পার চেয়েও স্বতন্ত্র্য ছিল। তিনি প্রকৃত হিন্দুস্থানী রীতি অনুযায়ী সুর করতেন। কালী মীর্জার টপ্পার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল শুদ্ধ ও অমিশ্রিত রাগের ব্যবহার, অশ্লীলতা বর্জিত সুরুচিকর প্রাঞ্জল ভাষা, হৃদয়গ্রাহী কবিভাব, মোট কথা মার্জিত বাংলা গান। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রচিত *'সংগীতরাগকল্পদ্রুম'* এবং *'গীত লহরী'* গ্রন্থে কালী মীর্জার গান সংকলিত হয়েছে। ভৈরবী রাগ ও মধ্যমান তালে একটি জনপ্রিয় টপ্পা গান- যদি ভব নদী পার হতে থাকে বাসনা।

দক্ষিণে কালীতে কৃষ্ণে ভেদ করোনা।।

এছাড়াও পরোজ গান ও একতালে নিবদ্ধ তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ভক্তি রসাশ্রিত গান-

"শবসনার কী বাসনা আমারে এ প্রবঞ্চনা ।

কালী কালী যত ডাকি, তত কর বিড়ম্বনা।[১১]

কালী মীর্জার রচিত গানে বহু রাগ-রাগিনীর ব্যবহার রয়েছে। যেমনঃ ইমন, বেহাগ, বাগেশ্রী, মুলতান, কাফী, খাম্বাজ, আলাহিয়া, সোহিনী, গৌরী, পরজ, সাহানা, ভৈরবী, ললিত, মালসী, পাহাড়ী, গৌড়, ঝিঝিট, কালিংড়া, ভেঁরো ইত্যাদি। পদাবলী সাহিত্যের কমলাকান্ত ও রাজা রামমোহন রায় এর উপর কালী মীর্জার বেশ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের টপ্পা গানের ব্যাপক প্রচার করেন শ্রীধর কথক(১৮৫৭)। কালী ও কৃষ্ণ বিষয়ক অগণিত গীত রচনা করেছেন তিনি। যে প্রেমে বিরহ নেই, বিচ্ছেদ নেই, কলঙ্ক ভয় নেই, সেই আদর্শ, প্রেমের কথা তিনি

[১১]স্বপন নস্কর, *ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা*(কলকাতা: শিল্পী প্রকাশিকা, ২০০৯) পৃ ৭১

তাঁর বহু রচনায় উল্লেখ করেছেন। এরকম একটি গানে (সিন্ধু ভৈরবী রাগে) বলেছেন-

পরসনে প্রেম করা ঘাটে কেমনে?

ছিলনা রবেনা প্রেম, পরে বিচ্ছেদ কারনে...[১২]

টপ্পাগান রচনা শ্রীধর ছিলেন নিধুবাবুর অনুসারী। অনেকেই শ্রীধরের রচিত টপ্পাগানগুলিকে নিধুবাবুর টপ্পা মনে করতেন। শ্রীধর কথকের গানে বহু হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন- খাম্বাজ, ভৈরবী, মুলতান, ঝিঁঝিট, বেহাগ, সিন্ধু, কাফী, বাহার, পিলু, দেশ, রামকেলী, গৌড়ী, দেশমাল্লার, কালিংড়া, যোগিয়া, ভৈঁরো, ইমন, পরজ, টোড়ী, ইত্যাদি। শ্রীধর কথক বহু ভাষাবিদ ছিলেন। বাংলা, ফার্সী, হিন্দি, আরবী ইত্যাদি ভাষায় তাঁর রচিত টপ্পা গান রয়েছে। বাংলাদেশের পাঁচালী গানের কিংবদন্তী রচয়িতা ও গায়ক দাশরথি রায়(১৮০৬-১৮৫৭) এর রচনায় অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে।

হৃদি বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি।

ওহে ভক্তপ্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধাসতী।।[১৩]

গানটিতে ললিত-বিভাস রাগের স্পর্শ দিয়ে তিনি তাঁর অন্তরের পবিত্রতার কথা ব্যক্ত করেছেন এবং উচ্চশ্রেণীর আধ্যাত্ম চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এছাড়াও আরেকটি শ্যামা সংগীতে বাগেশ্রী রাগ প্রয়োগ করেছেন।

দোষ কারো নয় গো মা !

আম স্বখ্যাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা![১৪]

দাশরথী রায়ের পাঁচালী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন-"যিনি বাংলাভাষায় সম্যকরূপে বুৎপন্ন হইতে বাসনা করেন, তিনি যত্নপূর্বক আদ্যোপান্ত দাশুরাথের পাঁচালী পাঠ করেন।"[১৫] বাংলা যাত্রাগানের আরেক পথিকৃৎ গোবিন্দ অধিকারী(১৭৯৯-১৮৭১) যাত্রাগানে রাগের ব্যবহারে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। খাম্বাজ রাগে ও মধ্যমান তালে তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গান- রাধে! আর মালা গাঁথ কী কা রন

তুমি যার তরে গাঁথ মালা সে গেছে মথুরা ভবন।

এছাড়া ভৈরবী রাগ ও পোস্তা তালে রচিত গান হল- তোরা যাসনে যাসনে দূতী

গেলে কথা কবেনা সে, নব ভূপতি॥[১৬]

---

[১২]স্বপন নস্কর, *ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা*(কলকাতা: শিল্পী প্রকাশিকা, ২০০৯) পৃ ৭৫

[১৩]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ২১১

[১৪]স্বপন নস্কর, প্রাগুক্ত। পৃ ৭৯

[১৫]তদেব। পৃ ৮১

[১৬]তদেব। পৃ ৮৭

১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২২ শে আগষ্ট প্রতিষ্টিত ব্রাহ্মসমাজে মূলত তৎকালীন সামাজিক বৈষম্য, কুসংস্কার, ব্যাভিচার , রাজতন্ত্র, যৌতুক, নির্যাতনের বিপক্ষে প্রতিবাদ করতেই গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় উপাসনা স্বরূপ 'শ্বশ্বতম ভয় শ্লোকং', 'বিগত বিশেষং', 'ও ভাব সেই একে' তিনটি সংগীত গীত হয়েছিল। রামমোহন রায় বিশেষ গীতিকে বহ্মসংগীত নামকরণ করেন। অনেকের মতে, ব্রহ্ম সংগীতের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকে ধ্রুপদের পুনরুত্থান ঘটেছিল। এর পূর্বে বাংলায় টপ্পা ও কীর্তনের প্রভাব ছিল, খেয়াল ও ধ্রুপদের আঙ্গিকে রচিত বাংলাগানের সংখ্যাও অল্প ছিল। এসময় রামমোহন রাগসংগীতের এক নতুন দিগন্ত নির্দেশ করলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় মার্গ সংগীতকে পূর্ব গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার সংগীতকে একটি বিশেষ অঙ্গরূপে পরিণত করে। উপাসনার সঙ্গে তাঁর রচিত ব্রহ্ম সংগীতগুলি বিশুদ্ধ মার্গসংগীতের অনুরূপভাবে গীত হত। তৎকালীন প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদকগণ এই সভায় অংশগ্রহণ করতেন। বিষ্ণপুর ঘরানার সত্য কিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯) খেয়াল গানে বিশেষ অবদান রেখেছেন। বাংলা ভাষায় খেয়াল চর্চায় তিনি ছিলেন অগ্রগামী। তাঁর রচিত বহু বাংলা ও হিন্দি খেয়াল পরবর্তীকালে খেয়ালধর্মী বাংলাগান, রাগাশ্রয়ী গান ও রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টির নেপথ্যে কাজ করেছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থ *বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চাঙ্গ খেয়াল* বাংলা খেয়ালের ইতিহাসে এক অনন্য গ্রন্থ। বিষ্ণুপুর ঘরানার খ্যাতিমান ধ্রুপদী হওয়া স্বত্বেও তিনি বাংলা খেয়াল গানের পৃষ্টপোষক ছিলেন। যা পরবর্তীতে রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

২.২ রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টির নেপথ্যে সংগীতগুণীদের অবদান

বাংলাগানের ইতিহাসে আধুনিকযুগ ধরা হয় ইংরেজ শাসনামল থেকে। সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা হতে কিছুটা সময় লেগেছিল। তবে শাসন প্রতিষ্ঠার সময়কালে ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক বিবর্তন ছিল লক্ষ্যণীয়। অষ্টাদশ শতকে হঠাৎ করেই যেমন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হলো। বাঙালির আদিম সংস্কৃতি শেকড়ের গভীরে রয়ে গেল, ডালপালা গজিয়ে তাতে আধুনিকতা ছেয়ে গেল। এই আধুনিকতা একেক জনের কাছে একেক রকম। কারো কাছে ভালো, কারো কাছে মন্দ। তবে সংস্কৃতির মিলন মিশ্রণ অতীতেও হয়েছে। এত উত্থান পতনের পরও ভারতবর্ষে নিজস্ব একটা ধারা বহমান। সেই ধারায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের পর ইতিহাস আধুনিক যুগের দেখা পেল অষ্টাদশ শতকে। অনেকের মতে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাথমিক স্তরেই রয়ে যেত যদি এতে পাশ্চাত্য প্রভাব না পড়ত। আধুনিক যুগ শুরু হওয়া অর্থ এই নয় যে পাশ্চাত্য প্রভাবে নিজস্ব সংস্কৃতির কথা ভুলে যাওয়া। ব্রিটিশরা শুধু সংস্কৃতির আদান প্রদানই করেননি সংগীতচর্চারও প্রসার ঘটিয়েছেন, উপমহাদেশে প্রযুক্তির প্রবেশ ঘটিয়েছেন। বাংলা সংস্কৃতির মধ্যযুগ চর্চার যুগ হলে আধুনিককে অনায়াসে প্রসারের যুগ বলা হয়। এসময় ইউরোপের সংগীতরীতির সাথে বাংলা সংগীতরীতির একটা তুলনামূলক সমীক্ষার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ তুলনা বোধগম্য হওয়ার পরে বাংলার কবি সাহিত্যিক সংগীত রচয়িতা ও শিল্পী সমাজে পাশ্চাত্যরীতিকে গ্রহণ করার প্রবণতাই আধুনিকতা হিসেবে চিহ্নিত। এতে দেশীয় সংস্কৃতির কোনো ক্ষতির আশংকা যেমন ছিলনা তেমনি বাংলা গানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন ছিল আঙ্গিকগত, শুধু বাইরের অবয়বটুকুতেই সামান্য আধুনিকতা ছিল বাকি সব কিছুই ছিল দেশীয়। ভারতীয় সংগীতে রচয়িতা ও গায়কের আসন পাশাপাশি, কারণ গায়নরীতি একটি নিত্য বিকাশমান সৃজনশীল সংগীতকলা। সংগীত যিনি রচনা করেন তার কাজ এখানেই শেষ। বাকি অসম্পূর্ণ অংশটি শেষ করে থাকেন একজন গায়ক। আধুনিক যুগের অনন্য অবদান সংগীতে সৃজনশীলতা।

এ সম্পর্কে প্রভাতকুমার গোস্বামী বলেছেন, "আধুনিক শব্দটি আপেক্ষিক। কবি কালিদাসের যুগে যা আধুনিক ছিল আজ তা আধুনিক নয়, আবার আজ যাকে আমরা আধুনিক বলছি, এক শতাব্দি পর তা আধুনিক থাকবে না।"[১৭] প্রতি যুগের সমসাময়িক ভাবাপন্ন রচনাকে সে যুগের আধুনিক বলা হয়। কলকাতা শহর আধুনিক যুগের সংগীতের তীর্থস্থান। অষ্টাদশ শতক হতে ঊনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এই শহরে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, কীর্তন, বাংলা গান এ সবকিছুর চর্চা হয়েছে পাশাপাশি। কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র,

---

[১৭]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ২৪১

বিশ্বনাথ ধামারী, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, দানীবাবু প্রমুখ সংগীতপ্রেমীগণ ধ্রুপদ চর্চা করেছেন। গিরিজশঙ্কর চক্রবর্তী ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী তিন ধরনের সংগীত চর্চা করেছেন। এই সময়ে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কণ্ঠ সংগীতের পাশাপাশি যন্ত্র সংগীতের প্রসার ঘটিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে রীতিমত হৈচৈ ফেলে দেন। বাংলায় গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অমরনাথ ভট্টাচার্য, যোগীনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ধ্রুপদ চর্চা করেছেন বিশেষভাবে। মৈজুদ্দিন, শ্যামলাল ঠুমরী গানকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেন। খেয়াল গানে তারাপদ চক্রবর্তী, সুখেন্দু গোস্বামী, নাটকের গানে গিরিচন্দ্র ঘোষ অনন্যতার স্বাক্ষর রাখেন। এই সময় ভারতবর্ষের যে কোন অঞ্চলের চেয়ে কলকাতার খ্যাতি সংগীতকেন্দ্র হিসেবে শীর্ষে স্থানান্তরিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হতে সংগীতগুণী ও সাধকগণ কলকাতায় সমবেত হতে থাকেন।

> আধুনিক শব্দের প্রচলিত প্রয়োগ হয়, হালফ্যাশন বা সমসাময়িক জীবন যাপনের উপকরণগত বৈশিষ্ট্যের রকম সকম বোঝাতে। এছাড়া, চলমান সময়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ আকার-প্রকারকে 'আধুনিক' হিসেবে চিহ্নিত করাটাও বেশির ভাগ, ক্ষেত্রে প্রচলিত। কিন্তু এই 'আধুনিক' শব্দটি কিছু ক্ষেত্রে এমন ভাবে আসে, যখন শব্দটি শুরুতে প্রয়োগের সময় 'বিশেষণ' হিসেবে এলেও, ক্রমশ সেটি যেন 'বিশেষ্য' হয়ে যায়। যেমন-'আধুনিক সভ্যতা', 'আধুনিক যুগ' এবং অবশ্যই 'আধুনিক বাংলাগান'। এখানে 'আধুনিক' কথাটা মিলে যেন সমগ্র নামে পরিণত হয়ে গেছে। কারণ, এই বিষয়গুলিকে বহু যুগ বছর ধরে 'আধুনিক' চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে আমাদের বোধ হয় তাকে চারিত্রিকভাবে বিভাজিত করতে সুবিধে হয়।[১৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গানের জগতে একটা নতুনত্ব সৃষ্টি করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবি। এঁরা হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। বাংলা রেঁনেসাসের অন্যতম এই পাঁচ কবি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিয়েছেন অন্যতম উচ্চতায়। রাগপ্রধান গান সৃষ্টির নেপথ্যে এই পাঁচ ব্যক্তিত্বকে সবার প্রথমে রাখতে হবে। কেননা, ঊনবিংশ শতকের আধুনিক গান, রাগপ্রধান গান, উচ্চমার্গীয় সংগীত, দেশী/লোক সংগীত, স্বদেশী সংগীত তাদের রচনায় সবই পাওয়া যায় এবং এই রচনাগুলো একত্রিত করলে সুবিশাল এক সংগীত ভান্ডার পাওয়া যায়। এই পাঁচজনের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথের গানে রাগের ব্যবহার একটু ভিন্ন ধাঁচের। পারিবারিক সাংগীতিক পরিবেশের কারণে তিনি বাড়িতে বসেই উত্তর ভারতীয় রাগের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সংগীতে এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন অন্যভাবে। মার্গ সংগীতের আদলে রবীন্দ্রনাথের রচিত গানের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা হলো-

---

[১৮]অভীক চট্টোপাধ্যায়, 'আধুনিক বাংলা গান' এর বিবর্তন, সম্পাদক: অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ প্রাক্ শারদীয় সংখ্যা: বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৪ (কলকাতা: ২০১৪) পৃ ৩৯০

১। ধ্রুপদ অঙ্গের গান:

- প্রথম আদি তব শক্তি; রাগ: দীপকপঞ্চম - সুরফাঁকতাল।

- তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা; রাগ: আলাইয়া - ঝাঁপতাল।

- কর মিলন চাও বিরহী; রাগ: শ্রী - তেওড়া তাল।

- কে যায় অমৃত ধামযাত্রী; রাগ: বেহাগ -চৌতাল।

- মধুর রূপে বিরাজ; রাগ: তিলককামোদ - ঝাঁপতাল।

২। খেয়াল অঙ্গের গান:

- মোরে বারে বারে ফিরালে; রাগ: নটমল্লার - একতাল।

- এবার নীরব করে দাও হে; রাগ: কানাড়া - ত্রিতাল।

- আনন্দধারা বহিছে ভুবনে ; রাগ: মালকোষ - ত্রিতাল।

- কে গো অন্তর তর সে; রাগ: ইমন - একতাল।

৩। টপ্পা অঙ্গের গান:

- এ পরবাসে রবে কে হায় ; রাগ: সিন্ধু - মধ্যমান তাল।

- আইলো আজি প্রাণসখা; রাগ: কেদারা - আড়াটেকা।

- আহা তোমার সঙ্গে প্রানের খেলা; রাগ: পিলু - দাদরা তাল।

- ও চাঁদ চোখের জলের; রাগ: পিলু - কাহারবা তাল।

- তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়; রাগ: ভৈরবী-রামকেলী - কাহারবা তাল।

৪। ঠুমরী অঙ্গের গান

- খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোল; রাগ: কেবড়িয়া।

- তুমি কিছু দিয়ে যাও; রাগ: খাম্বাজ - কার্ফাতাল।

- এরা পরকে আপন করে; রাগ: পিলু বাঁরোয়া - খেমটাতাল।

- কি সুর বাজে আমার প্রানে; রাগ পিলু - যৎ তাল।

৫। তারানা ভাঙ্গা গান

- সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে; রাগ: নটমল্লার - ত্রিতাল।

- আহ! আস্পর্দ্ধা একি; রাগ: বেহাগ - ত্রিতাল।

৬। সেতার গৎ ভাঙ্গা গান

- মোর ভাবনারে কি হাওয়া মাতালো; রাগ: গৌড় মল্লার-ত্রিতাল।

- এস শ্যামল সুন্দর; রাগ: দেশ - ত্রিতাল।

- কোথায় ছিল সজনী লো; রাগ : ভৈরবী - ত্রিতাল।

কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পাশ্চাত্য সংগীতরীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বিলেতে পড়াশুনা চলাকালীন তিনি পাশ্চাত্যরীতির সংগীত শিখেছেন। দেশে ফেরার পর কলকাতায় হিন্দুস্থানী সংগীত ও বাংলাগানের জয়জয়কার দেখে তিনিও দেশীরীতির প্রতি আগ্রহী হলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এর প্রথম সংগীত রচনার শুরুটা হয়েছিল হাসির গান দিয়ে। এতে অবশ্য পাশ্চাত্য সুর ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর তিনি স্বদেশী গান ও নাটক রচনার দিকে মনোযোগী হন। দ্বিজেন্দ্রলাল শিশু বয়স থেকেই হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনীতে অসম্ভব পারদর্শী ছিলেন, কারণ তাঁর পিতা কার্তিকেয় চন্দ্র রায় ছিলেন প্রসিদ্ধ কলোয়াত। ভারতীয় রাগসংগীতের ছাঁচে পাশ্চাত্য ছোঁয়ায় বাংলাগান রচনায় শুরুটা হয়েছিল দ্বিজেন্দলালের হাতেই। নিঃসন্দেহে এটি অনেক অভিনব পদক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে কিছুটা গবেষণা করলেও একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের গানেই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিশেল সার্থক ভাবে হয়েছে। যেমন: 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গানটি ভারতীয় কেদার রাগে সুরারোপিত। সম্পূর্ণ শুদ্ধ রাগ মিশ্রিত কাঠামোয় দেশাত্মবোধের শিহরণ জাগিয়ে তোলে গানের অপূর্ব বাণীবিন্যাস। এছাড়া সে যে আমার জন্মভূমি কথাটি তিনটি সুরে পরপর গাওয়ার প্রচলন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য রীতিকেই অনুসরণ করে। উল্লেখযোগ্য গান গুলির মধ্যে রয়েছে-

১। আমরা এমনি এসে ভেসে যাই - রাগ: ঝিঁঝিট, তাল: যৎ।

২। আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি - রাগ: ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, তাল: যৎ।

৩। আয়রে বসন্তে ও তোর কিরণ মাখা পাখা তুলে - রাগ: মিশ্র খাম্বাজ, তাল: দাদরা।

৪। এ জগতে আমি বড়ই একা, আমি বড়ই দীনা - রাগ: ভীমপলশ্রী, তাল: কাহারবা।

রজনীকান্তের গান বিংশ শতকে বাংলা গানের এক উল্লেখযোগ্য দিক। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম ভারিক্কি চালের বাংলা গানের পরিবর্তে হালকা বাংলা গান রচনা করেন। এইসব গানে রাগের ব্যবহার করে বাংলা রাগ প্রধান গানের ইতিহাস কে কিছুটা নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছেন। এতকাল রাগ সংগীতের ছাঁচে বাংলা গান রচনা করা হলেও রজনীকান্ত রচনা করলেন বাংলা গানের ছাঁচে আরেক রাগপ্রধান বাংলাগান।

রজনীকান্তের উল্লেখ যোগ্য গানগুলো হল-

১। তুমি অপরূপ, স্বরূপ - রাগ : বেহাগ, একতাল।

২। আমি তো তোমারে চাইনি জীবনে - রাগ : মিশ্রকানাড়া, একতাল।

৩। কোলের ছেলে ধুলো ঝেরে তুলে নে কোলে - রাগ : ভৈরবী, ঝাঁপতাল।

৪। কেন বঞ্চিত হব চরণে - রাগ : মিশ্র খাম্বাজ; জলদ একতাল।

৫। সে যে পরম-প্রেম-সুন্দর - রাগ : সুরট মল্লার; সুরফাক্তা।

৬। আমি অকৃতি অধম - রাগ : বেহাগ; একতাল।

৭। মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায় - রাগ : বেহাগ; ঝাঁপতাল।

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলায় রাগসংগীত রচনায় উপরোক্ত পন্থায় নতুনত্ব দান করেন এবং তা ছিল ধ্রুপদীয় কায়দাকে পরিহার করে উত্তর-ভারতীয় মুসলমানী ধারার আদলে রূপায়ন। নজরুলের রচনায় সুরের সাথে যুক্ত হল কাব্যরস। নজরুলের ধ্রুপদাঙ্গীয় গানের তালিকা:

১. খেলে নন্দের আঙিনায় আনন্দ-দুলাল - রাগ: দেবগান্ধার, তাল: ঝাঁপতাল।

২. সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ - রাগ: তিলককামোদ, তাল: ঝাঁপতাল।

৩. ধূলি পিঙ্গল জুটাজুট মেলে - রাগ : শুদ্ধ সারং, তাল: ত্রিতাল।

৪. যোগী শিব-শঙ্কর ভোলা দিগম্বর - রাগ: আড়ানা, তাল: ঝাঁপতাল।

নজরুলের হিন্দী ভাঙা খেয়াল গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

৫. রুমঝুম ঝুমঝুম নূপুর বোলে (রাগ-নটবেহাগ)

৬. একি তন্দ্র বিজরিত আঁখিপাত (রাগ-মালকোষ)

৭. রিনিকি ঝিনিকি রিনি (রাগ-ছায়ানট)

কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি 'খেয়াল অঙ্গের রাগপ্রধান গান' উল্লেখ্য করা হল :

৮. গগনে সঘন চমকিছে দামিনী (রাগ : মেঘ, তাল : ত্রিতাল)।

৯. রুম ঝুম ঝুম ঝুম নূপুর বোলে (রাগ : নটবেহাগ; তাল : ত্রিতাল)।

১০. একি এ মধুর শ্যাম বিরহে (রাগ : বৃন্দাবনী সারং, তাল : ত্রিতাল)।

নজরুল সৃষ্ট ঠুমরি অংগের কয়েকটি রাগপ্রধান গানের তালিকা উল্লেখ্য করা হল।

১১. সুরে ও বানীর মালা দিয়ে তুমি রাগ : পিলু মিশ্র। তাল : দাদরা।

১২. কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া রাগ : খাম্বাজ মিশ্র। তাল : ত্রিতাল।

১৩. আমি সূর্যমুখী ফুলের মতরাগ : কামোদ -মালবশ্রী, তাল : কাহারবা।

দক্ষিণী রাগে নজরুলের কয়েকটি গানের উল্লেখ্য করা হল :

১৪. মেঘ বিহীন খর বৈশাখে রাগ : সামন্ত সারং, তাল : ত্রিতাল।

১৫. দক্ষিণ সমীরণ সাথে রাগ : মধু মাধবী সারং। তাল : ত্রিতাল।

১৬. নিশি রাতে রিম ঝিম বাদল নূপুর রাগ : প্রতাপবরালী। তাল : আদ্ধা।

১৭. নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায় কে যায় রাগ : নীলাম্বরী। তাল ত্রিতাল।

১৭. সন্ধ্যা গোধূলী লগনে রাগ : সামন্ত কল্যাণ। তাল : ত্রিতাল।

অপ্রচলিত রাগে নজরুলের গান: কাজী নজরুলই একমাত্র অপ্রচলিত ও অবলুপ্ত রাগে বাংলা রাগপ্রধান গান রচনা করে উল্লেখিত রাগগুলিকে সবার কাছে পরিচিত করে তুলেছেন।

১৮. হর্ষ কানাড়া - ছেড়ে দাও মোরে আর হাত ধরে রাখিও না।

১৯. জেংগুলা - ঘুমে জাগরণে বিজরিত প্রাতে।

২০. নভরোচিকা - বুলবুলি নীরব নার্গিসে বনে।

২১. বিরাট ভৈরব - জাগো বিরাট ভৈরব জাগো সমাধি মগ্ন।

নজরুল সৃষ্ট রাগের গানগুলিতে রাগনাম উল্লেখ্য করা নজরুলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তবে নজরুল তাঁর অন্যান্য গান সৃষ্টির মাধ্যমে 'নজরুলগীতি' নামে এক বিশাল শিল্প বাংলা গানের জগতকে দিয়েছেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে এ এক অনন্য অবদান।

আধুনিক বাংলাগান ও রাগপ্রধান বাংলাগান দুটি ভিন্ন শাখা। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর দরবারী রাগ সংগীত বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলা ভাষী অঞ্চলে এসে দরবারী রাগসংগীত খুব একটা সুবিধা করতে পারে নি, কারণ বাংলা কাব্য সংগীতের দাপটে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীত বাঙ্গালী শ্রোতাদের মন জয় করতে পারে নি। ইংরেজ শাসনামলে যখন সামাজিক রাজনৈতিক বিপ্লব শুরু হল তখন সংগীতের পালেও বদলের হাওয়া লাগালো। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাগানের আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে। আধুনিক যুগে একদিকে বাংলা কাব্য সংগীত ও রাগ সংগীতের মিশ্রণে রাগপ্রধান বাংলাগানের উদ্ভব হয়, অন্যদিকে উদ্ভব হয় আধুনিক বাংলাগানের।

২.৩ রাগপ্রধান গানের নেপথ্যে বিভিন্ন গীতশৈলী

রাগপ্রধান বাংলাগানকে আধুনিক যুগের এক বিস্ময়কর সৃষ্টিই বলা চলে। কেননা, হিন্দুস্থানী সংগীতকে অনুসৃত করে হলেও রাগপ্রধান বাংলাগানের স্বতন্ত্রতা রয়েছে। এর পেছনে অবদান রয়েছে অষ্টাদশ শতকের সেই সব সংগীত গুণীদের যাঁরা হিন্দুস্থানী রাগসংগীতে পারদর্শী ছিলেন অথচ বাংলাগানে রাগের প্রয়োগ করে শুধুমাত্র অনুকরণ করতে চাননি। রাগপ্রধান বাংলাগানের সাহিত্যিক মূল্য ও রাগ-রাগিনীর শুদ্ধতা এ দু'য়ের সামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন। ফলে রাগপ্রধান ও রাগসংগীতের স্ব স্ব অবস্থান ঠিক ছিল, শ্রোতা সমাজে কদর ছিল। রাগপ্রধান বাংলাগানই যে কেবল রাগ মিশ্রণের ফল তা নয়। প্রাচীনকাল হতেই বিভিন্ন ধরনের সংগীতে রাগের প্রয়োগ ও রাগ মিশ্রণ প্রথা চলে আসছে। ওস্তাদ আমীর খসরু ভারতীয় ও পারসিয় রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন নতুন সৃষ্টি করেছিলেন। বাংলার লোক গান, হিন্দুস্থানী লোকগানেও রাগ-রাগিনীর মিশ্রণ ঘটেছে যুগ যুগ ধরে। কাজেই বলা চলে, রাগ-রাগিনী বহুকাল আগে থেকেই বিভিন্ন ধরনের গানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তাতে ভারতীয় সংগীতের নানান আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। তারই ধারাহিকতায় ঊনবিংশ শতকে আমরা রাগপ্রধান বাংলাগান পেয়েছি। অধিকাংশ সংগীতজ্ঞ মনে করেন যে, রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টির নেপথ্যে মূল ভূমিকা পালন করেছে যে গীতশৈলী তা হল খেয়াল। খেয়ালের আঙ্গিকেই শুরুতে রাগপ্রধান বাংলাগান গাওয়ার চল ছিল। কতিপয় সংগীতজ্ঞ একে বাংলা খেয়ালও বলতেন। কিন্তু কয়েকজন আধুনিক গানের সুরকার-গীতিকার ও সংগীত পরিচালকদের হাত ধরে এই নতুন গীতধারাটি সঠিক পথের সন্ধান পায়। রাগপ্রধান বাংলাগানে শুধুমাত্র খেয়ালের অবদানই যে রয়েছে তা নয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু বাংলাগানে ধ্রুপদের অবয়ব ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর গুরু ও পূর্বসুরীগণও বহু ধ্রুপদাঙ্গের বাংলাগান রচনা করেছেন যা পরবর্তীতে রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টির পেছনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তবে রাগপ্রধান বাংলাগানে টপ্পা, ঠুমরী ও দাদরার প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে 'বোল বানানা' রীতিটি সরাসরি ঠুমরী দাদরা গান হতেই রাগপ্রধান বাংলাগানে প্রবেশ করেছে বলে অনেকের মত।

> গীতিকবিতার রূপ ও সৃষ্টি কৌশল হল গীতিকবিতার বিষয়বস্তু নানাভাবে অলংকৃত করে বিভিন্ন ব্যঞ্জনার দ্বারা কথা তৈরী করে তাতে পরিসীমিত সুর প্রদান যার কারণে মূলবর্ণিত বিষয় অব্যাহত রেখে কথা ও সুরে মালা গেথে যথার্থ মনোরম ও হৃদয়স্পর্শী সুচারু সংগীতের সৃষ্টি করে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত কণ্ঠের সাহায্যে তার যথার্থ পরিবেশনা। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে নানা পর্যায়ে, নানা দেশী-বিদেশী সুরের, নানা ভক্তি ভাবাত্মক, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি নানা আঙ্গিকের রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দনাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন এবং কাজী নজরুল ইসলামের হাত ধরে বাংলাগানের পরবর্তী পর্বে বহু গীতিকার ও সুরকার এবং বাংলাগানের নানা শিল্পীকে ভারতীয়-সংগীত জগত পেয়েছে নানা উপলক্ষে। নানা আঙ্গিকের গান রচিত হয়েছে এই তৎকালীন নতুন সুরকার-গীতিকারের সৃষ্টিশীলতায়।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কে. এল. সাইগল, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, লালচাঁদ বড়াল, পাহাড়ী সান্যাল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, মৃণালকান্তি ঘোষ, সন্তোষ সেনগুপ্ত, অসিত বরণ, রবীণ মজুমদার, কানন দেবী, জৈনদেবী, আঙ্গুর বালা, ইন্দুবালা, কমল ঝরিয়া এই গুণী শিল্পীগণের সময়ে বাংলাগানের আর একটি নতুন ধারার গানের সংযোজন হয়েছিল, যার নাম 'রাগপ্রধান গান' বা রাগাশ্রয়ী বাংলাগান।[১৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে রাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় রাগপ্রধান বাংলাগান কথাটির প্রচলন হয়নি। কিন্তু হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের ছাঁচে বাংলা গান রচনার রীতি ছিল খুব বেশি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে শুদ্ধ রাগের প্রয়োগ সরাসরিভাবে খুব কমই করেছেন। রাগের রূপকাঠামো ঠিক রাখলেও ছোট ছোট স্পর্শস্বর, রস পরিবর্তন, সময় পরিবর্তন, গায়নরীতি ইত্যাদিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলা থেকেই পারিবারিকভাবে এক সুবিশাল সাংগীতিক পরিমন্ডলে বেড়ে উঠেছিলেন। নিজের রাগ ভাবনা সম্পর্কে সংগীত ও ভাব প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

> আমাদের দেশে সংগীত এমন শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়াছে, স্বাভাবিক হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুরসমষ্টির কর্দম ও রাগরাগিনীর ছাঁচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে হৃত নাই, প্রাণ নাই। এইরূপ একই ছাঁচে ঢালা, অপরিবর্তনশীল সংগীতের জড় প্রতিমা আমাদের দেবদেবীর মূর্তির ন্যায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।[২০]

ভারতীয় সংগীতের মহত্বকে রবীন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকার করেছেন। পাশাপাশি ভারতের অন্যস্থানে গানের যে ধারা, তার সংগে বাংলাগানের ধারার স্বাতন্ত্র্যকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। হিন্দুস্থানী সংগীতের সাথে বাংলাগানের বড় একটি পার্থক্য হল- কথা। সেই কীর্তনের যুগ থেকেই বাংলাগান কথা নির্ভর। রবীন্দ্রনাথ তাই কথার সৌন্দর্য্যকে গুরুত্ব দিয়েই গান রচনা করেছেন। সংগীতের মুক্তি শীর্ষক প্রবন্ধটিতে ভারতীয় রাগ-রাগিনী সম্পর্কে কবিগুরু বলেছেন,

> আমাদের মতে রাগ-রাগিনীর বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেই জন্য আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, তাহা যেন সমস্ত জগতের। ভৈঁরো যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধাকাওে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্তৃতি, ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চির বিরহবেদনা, মুলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি নিশ্বাস; পূরবী যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।[২১]

---

[১৯]অজন্তা জানা, বাংলা গানে পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, accessed at 18January, 2021. https://lokogandhar.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%9e%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%aa/#comment-12391

[২০]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীত চিন্তা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৩৯৯) পৃ ৮

[২১]তদেব। পৃ ৯

রবীন্দ্রনাথের এই প্রকার রাগ ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাঁর রচিত গানে। বেহাগ রাগে আশ্রিত 'আজ জোস্না রাতে সবাই গেছে বনে' গানটির কথা। বেহাগ রাত্রিকালীন রাগ। কিন্তু গানটির একটি অংশ লক্ষ্য করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, আমার এ ঘর বহু যতন করে, ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে- এই অংশটিতে 'হবে মোরে' শব্দের যে স্বরগুলি রয়েছে তা বিশুদ্ধ গৌড়সারঙের। পরবর্তী 'যদি আমায়' এই অংশটুকুও একই রকম স্বরের সমন্বয়ে সুরারোপিত। বেহাগ ও গৌড়সারঙের রাগরূপের স্বরে মিল থাকলেও চলন সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক গানে বেহাগ রাগ ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে 'তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে', 'অন্তরে জাগিছ অন্তর্যামী', 'কী ভয় অভয়ধামে' ইত্যাদি গানগুলি বন্দিশ ভেঙে বানিয়েছেন। এছাড়াও বেহাগ রাগের যে বিষন্ন অনুভূতি তা রবীন্দ্রনাথকে ভীষণ উদ্বুদ্ধ করেছিল বিরহ এবং বিষাদের দিকে। বেহাগে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনাগুলির মধ্যে 'দ্বীপ নিভে গেছে মম', 'বিরহ মধুর হল আজি', 'হায় গো ব্যাথায় কথা যায় ডুবে', 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে', 'তোমার অসীমে প্রাণ মনে লয়ে' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে কবিগুরুর রাগ ভাবনা যে কত বিচিত্র প্রকৃতির ছিল তা বোঝা যায় এই একই রাগে আনন্দের গান রচনার মাধ্যমে। যেমন: মধুর মিলন হাসিতে মিলেছে হাসি, নয়নে নয়ন। আগের গানগুলি এবং এই গানটি একই রাগ বেহাগে রচিত হলেও ভাবের দিক দিয়ে সম্পুর্ণ বিপরীত। ছন্দের ভিন্নতার কারণে রাগভাব ও রসের পার্থক্য ফুটে উঠেছে দারুণভাবে। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোমল নিষাদ যুক্ত বেহাগের কথা উল্লেখ করেছেন খুব সুন্দর ভাবে। ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুকরণ করতেন। তাঁর অনুকরণেই বেহাগ রাগে কোমল নিষাদ ব্যবহার করেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র রাগ ভাবনার আরেকটি উদাহরণ 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানটি। রাগপ্রধান গানের অবয়বে গানটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটি রবীন্দ্রনাথের খেয়াল অংগের গান। মালকোষ রাগে রচিত গানটি তিনতালে নিবদ্ধ। শাস্ত্রগতভাবে মালকোষ করুণ রসের রাগ। কিন্তু গানের কাব্যের দিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সেখানে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে,

চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি
ক্ষুদ্র দু:খ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহ শুণ্য জীবনে।

এই উদ্দিপনাময় বাক্যে সুরারোপ করার পর করুণ রস কোথায় বলা যায়না। তবে রসের অপ্রতুলতা বাদে রাগের সম্পূর্ণ অবকাঠামো রক্ষিত হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক ব্যবহৃত রাগিনীর মধ্যে ভৈরবী অন্যতম। ছিন্নপত্রাবলীতে এ সম্পর্কে কবিগুরু মন্তব্য করেছেন,

> কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগ শোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দু:খটি, ভৈরবী রাগিনীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে একটি নিত্যশোক, নিত্যভয়, নিত্যমিনতির ভাব আছে, আমাদের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে ভৈরবী সেই কান্নাটিকে মুক্ত করে দেয়-আমাদের বেদনার সংগে জগৎব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। সত্যিই তো আমাদের কিছুই স্থায়ী নয়, কিন্তু প্রকৃতি কী এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে সেই কথাটিই আমাদের সর্বদা ভুলিয়ে রেখেছে। সেই জন্যেই আমরা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করিতে পারি। ভৈরবীতে সেই চিরসত্য সেই মৃত্যুবেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ে; আমাদের এই কথা বলে দেয় যে, আমরা যা কিছু জানি তার কিছুই থাকবে না এবং যা চিরকালে থাকবে তার আমরা কিছুই জানি নে।[২২]

রবীন্দ্রনাথের রাগভাবনায় কেবলি হৃদয়াবেগ প্রস্ফুটিত হয়েছে। কেননা, ভৈরবী প্রাত:কালের রাগ হওয়া স্বত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গায়ন সময়কে উপেক্ষা করে গুরুত্ব দিয়েছেন ভাবের প্রতি। তবে ভৈরবীতে বাধা অনেক গানেই সকাল / ভোরের আবহ রয়েছে। যেমন -

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাত খানি

এই গান এ ভৈরবীর করুণ রসাত্মক ভাব এবং সময় কাল দুটি ধারাই অক্ষুন্ন রেখেছেন কবি। আবার প্রভাতের প্রারম্ভে বিরহে মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ ভৈরবী মেজাজে রচনা করেছেন-

সকাল বেলার আলোয় বাজে
বিদায় ব্যাথার ভৈরবী

এখানে ব্যবহৃত রাগের নাম উল্লেখিত হয়েছে সুনিপুণ ভাবে। অথচ সকালবেলার এই রাগ ব্যবহার করে রাত্রিকালের গানও রচনা করেছেন তিনি। 'নিশার স্বপন ছুটল রে অথবা 'আজি বর্ষার রাতের শেষে - এই গানগুলিতেও ভৈরবীর সুস্পষ্ট চলন লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথ যখনই বিরহসূচক গান রচনা করেছেন তখনই ভৈরবী চলে এসেছে। কবিগুরুর এহেন ভৈরবী প্রেম যথাযথই তাঁর অন্তরের আবেগকে প্রকাশ করেছে সুরের বুননে। অথবা বলা যেতে পারে, তাঁর হৃদয়ের বাণী কেবল ভৈরবী রাগিনীতেই প্রাণ পেত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনায় মনের মাধুরী মিশিয়ে রাগ ব্যবহার করেছেন। গানের ভাব অনুযায়ী সুরারোপের ক্ষেত্রে দু একটি অতিরিক্ত স্বর প্রয়োগ করেছেন যা রাগের নিয়মের বাইরে হলেও গানের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে বৃদ্ধি করেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ এও জানতেন যে, পরবর্তী সময় এ বিষয়ে সমালোচনা হতেই পারে। তাই একটি চিঠিতে ধূর্জটি প্রসাদকে লিখেছেন,

> বাংলাদেশে আমার নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত। তারই অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানি নে, বুঝি নে। আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুব পদ্ধতির রাগরাগিনীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী

[২২]অভ্র বসু, রাগ রাগিনীর ভাব ও রবীন্দ্রনাথের গান, সম্পাদক: অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ প্রাক্ শারদীয় সংখ্যা: বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৪ (কলকাতা: ২০১৪) পৃ ৯৮

> শতাব্দির প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারণ বাকবিতন্ডার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখান করতে পারিনে; সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি এ কথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানেন।[২৩]

রাগ ভাবনায় কত খানি দক্ষ হলে কখনও সম্পূর্ণ ব্যকরণ না মেনে, কখনও গায়ন সময় সীমা লঙ্ঘন করে, গানের ভাবকে রাগের অবয়বে প্রকাশ করা সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথের কাছেই শেখা প্রয়োজন। তিনি রাগ-রাগিনী কে কখনও অস্বীকার করেননি, রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টি করতে রাগের পরিধির বাইরেও যাননি অর্থাৎ রাগের ভাবগত সীমাকে কখনোই লঙ্ঘন করেননি। ব্যাকরণগত পরিধি যে ভাবের স্বার্থে লঙ্ঘনেরই যোগ্য তা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের এই দৌরাত্ম্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো তাঁর নান্দনিকতা। রাগের চলনে স্বেচ্ছাচারিতার প্রয়োগ থাকা স্বত্বেও পরিণতিতে আমাদের দিয়েছেন রাশি রাশি নান্দনিক সুরের স্বাদ। রবীন্দ্রনাথ রাগ মুলতান প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রাবলীর একটি চিঠি (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫) লিখেছেন-

> আমাদের মুলতান রাগিনীটা এই চারটে-পাঁচটে বেলাকার রাগিনী, তার ঠিক ভাবখানা হচ্ছে- "আজকের দিনটা কিচ্ছুই করা হয় নি।"..... আজ আমি এই অপরাহ্নের ঝিকিমিকি আলোতে জলে স্থলে শূন্যে সব জায়গাতেই সেই মুলতান রাগিনীটাকে তার করুণ চড়া অন্তরা সুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি- না সুখ, না দু:খ কেবল আলস্যের অবসান এবং তার ভিতরকার মর্মগত বেদনা।[২৪]

রবীন্দ্রনাথ মুলতান রাগিনী মেজাজকে তাঁর ব্যকরণের চেয়েও বড় করে দেখেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রকৃতি পর্যায়ের বর্ষা ঋতুর একটি গানের কথা উল্লেখ করা যায়। গানটি মুলতানের মেজাজে হলেও কিছুটা পিলু রাগের আমেজ চলে আসে। গানটিতে ব্যাকরণগত দিক দিয়ে না হলেও ভাবগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মুলতানকেই ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

আজ কিছুতেই যায়না মনের ভার,
দিনের আকাশ মেষে অন্ধকার- হায় রে ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে রাগ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রাগপ্রধান গান রচনা করেননি। তাঁর রচিত গানগুলি দেশাত্মবোধক, প্রেমগীতি, হাসির গান, নাটকের গান হিসেবেই পরিচিত। তবে তাঁর রচনায় পাশ্চাত্য ঢং এ ভারতীয় রাগ-রাগিনীর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য গানগুলির মধ্যে 'আজি নূতন রতনে ভূষণে যতনে'- গানটি রয়েছে। এই গানে খুব চমৎকার

[২৩]অভ্র বসু, রাগ রাগিনীর ভাব ও রবীন্দ্রনাথের গান, সম্পাদক: অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ প্রাক্ শারদীয় সংখ্যা: বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৪ (কলকাতা: ২০১৪) পৃ ১০৫

[২৪]তদেব। পৃ ৯৯

ভাবে ভৈরবী রাগরূপ দেখানো হয়েছে পশ্চিমা রীতিতে। ভারতীয় সংগীতে ভৈরবীর রাগরূপ হল-

ঠাট : ভৈরবী

আরোহণ : স ঋ জ্ঞ ম প দ ণ র্স

অবরোহণ : র্স ণ দ প ম জ্ঞ ঋ স

পকড় : ম জ্ঞ, স ঋ স, দ্ ণ্ স

এই রাগে 'র গ ধ ন' এই স্বর গুলো কোমল এবং বাকি সব স্বর শুদ্ধ। গানের স্বরবিন্যাস অনুযায়ী ভৈরবী রাগের রূপ এবং বিশেষ স্বরসংগতি জ্ঞঋ মজ্ঞঋ, ণদ পম, জ্ঞমদ ইত্যাদি দেখানো হয়েছে কিন্তু গানটি গাওয়ার সময় পাশ্চাত্য কারুকাজ টের পাওয়া যায়। যেমন- 'অন্তরায় শ্যামলে কোমলে কনকে হীরকে', 'ভুবন ভূষিত করিয়ে দাও' অংশে রাগের অবরোহণ কাঠামো দেখিয়ে এবং পাশ্চাত্য ঢং এ স্পর্শ স্বর লাগিয়ে অপূর্ব সুর সৃষ্টি করা হয়েছে। আবার আভোগে 'নূতন হাসিতে বাসনা রাশিতে' এই চরণে প্রথম দুটি শব্দ 'নূতন হাসিতে'- এই অংশে পূর্বের ন্যায় পাশ্চাত্য রীতিতে কিছুটা সুর দিয়ে পরের 'বাসনা রাশিতে' অংশে ভারতীয় সপাট তানের মত স্বরবিন্যাস বসিয়ে অভিনব ভাবে সুরের নতুনত্ব আনা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অধিকাংশ রচনাই এই সকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ- পাশ্চাত্য ঢং এ ভারতীয় রাগে সুর করা।

রজনীকান্ত সেনের গানে রাগ

বাংলার পঞ্চগীতি কবির মধ্যে খুব অল্পসময় বেঁচে ছিলেন রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)। এই কম পরিধি সম্পন্ন জীবনেই তিনি বাংলা গানকে অনেক সমৃদ্ধশালী করে গেছেন। তাঁর রচিত গানে গুরু গম্ভীরতা, ভারী অলংকার, শাস্ত্র সম্পর্কিত নিয়ম কানুনের কড়াকড়ি কিছুই ছিল না। বরং তাঁর গানে স্নিগ্ধতা, সারল্যতা, শান্ত রস এবং পবিত্র বাণীবদ্ধ ভাব প্রচলিত ছিল। এসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা সংগীতের ক্ষেত্রে অনেকটা সহজ পথ তৈরী করেছে। কারণ উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে সে যুগে ভাবগাম্ভীর্য্যময়, জটিল কাঠামোগত গান বেশি সমাদৃত হত। কিন্তু রজনীকান্ত খুব সহজ সুরের এবং সাবলীল কাঠামোর গান রচনা করতেন। তাঁর স্বদেশী গানগুলির দিকে লক্ষ্য করলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়। বাংলার প্রাকৃতিক রূপ বর্ণনায় রজনীকান্ত সৃষ্টি করেছেন অত্যন্ত সুন্দর জননী স্তোত্রগান।

নমো নমো নমো জননি বঙ্গ !

উত্তরে ঐ অভ্রভেদ্য, অতুল বিপুলে গিরি অলঙ্ঘ।

গানটি সুরট মল্লার রাগে সুরারোপিত। তাঁর রচিত শাক্তগীতগুলো রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের ছায়া অনুসৃত। এতে রাগ-রাগিনীর বাহুল্য নেই, নেই সরগম, তানের প্রকোপ। তবে রাগ নাম রয়েছে, যার খোলসে একটি সহজ ভাষার বাংলাগান পাওয়া যায়।

উমা আসছেন, এই সারা মেনকাপুরী আনন্দে মেতে উঠেছে-

কে দেখবি ছুটে আয়

রাগমিশ্রণের সাহায্যে শান্তরসাশ্রিত ভক্তিমূলক গানের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে রজনীকান্ত অনন্য। তাঁর কাব্য ছন্দ প্রধান এবং কাব্যের সুর ছন্দের অনুবর্তী। তিনি তাঁর ব্যবহৃত রাগ-রাগিনীতে বিচিত্র ছন্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন- 'তুমি নির্মল কর' গানটিতে সহজসুরে অপূর্ব ছন্দের কারুকাজ করেছেন। গানটির নাম 'নির্ভর'; ভৈরবী রাগে এবং জলদ একতালে রচিত।

তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে

মলিন মর্ম মুছায়ে;

তব, পূর্ণ কিরণ দিয়ে যাক, মোর

মোহ কালিমা ঘুচায়ে।

এছাড়া রাগপ্রধান প্রার্থনা সংগীত রচনা করেছেন বারোয়াঁ রাগে। ঠুমরী অঙ্গের গানটিতে আশ্চর্য্য ভক্তি রসাত্মক সুরবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

(ওরা) চাহিতে জানে না, দয়াময়

চাহে ধন, জন, আয়ু :, আরোগ্য, বিজয়।

এছাড়াও বাউল সুরে রচিত 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই' গানটি মুলতান রাগে এবং গড় খেমটা তালে নিবদ্ধ। এই গানটি স্বদেশী সংগীত হিসেবে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় পুরো ভারতবর্ষে বিখ্যাত হয়েছিল।

অতুলপ্রসাদের গানে রাগ

অতুলপ্রসাদের(১৮৭১-১৯৩৪) অজস্র স্বদেশী গানের মাঝেও বেশ কিছু রাগাশ্রয়ী ও আধুনিক গান রয়েছে। অতুলপ্রসাদের গানে রাগ-রাগিনীর মিশ্রণের প্রভাবই অধিক পরিলক্ষিত হয়। তাঁর অনেক গানে হিন্দি গানের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ 'আমার বাগানে এত ফুল' ও 'সে ডাকে আমারে' এই গান দুটি উল্লেখযোগ্য। "তাঁর ডাকে কোয়েলা বারেবারে গানটি গৌড় মল্লার রাগে বাঁধা। মুরলী কাঁদে রাধে রাধে গানটি আশাবরীকে কেন্দ্র করে ভৈরবী - ভৈঁরো প্রভৃতি রাগের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সংগীতের কাব্যভাব বজায় রেখেও অতুলপ্রসাদ অনেক গানে রাগ মিশ্রণ করেছেন।"[২৫] অতুলপ্রসাদ অনেক গানেই টপ্পার ঢং ব্যবহার করেছেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজের সংগে তিনি মিলন ঘটিয়েছেন টপ্পার শ্রুতিমধুর করুণ তানের। 'ওগো আমার নবীন সাথী' , 'কে আবার বাজায় বাঁশি' গান দুটিতে

[২৫]প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*(কলকাতা: প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, ২০০৫) পৃ ২৫৬

পিলু রাগের শুদ্ধ ও বিকৃত ১২টি স্বরের প্রয়োগ করেছেন। অতুলপ্রসাদের গানে ধ্রুপদের প্রভাব খুব কমই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 'ক্ষমিও হে শিব' গানটি সম্পূর্ণ ধ্রুপদাঙ্গীয় শ্রেণির। অতুলপ্রসাদের গানে বিশেষ বৈচিত্র্যময়তা লক্ষ্য করা যায় কীর্তনাঙ্গীয় গানে। এই শ্রেণির গানে তিনি কীর্তনের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখে রাগ-রাগিনীর ব্যবহার করেছেন। বাংলাদেশে প্রচলিত কীর্তন গানগুলো রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক হয়ে থাকে। অতুল প্রসাদ শুধুমাত্র কীর্তনের ঢং এ বাংলা গান রচনা করে তাতে রাগের ব্যবহার করেছেন।

এইরূপ কয়েকটি গান হল-

১। ওগো সাথী মম

২। যদি তোর হৃদ যমুনা

৩। আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়

শুধু কীর্তন গানই নয়, অতুল প্রসাদের রচনায় রয়েছে বাউল, ভাটিয়ালী ও রামপ্রসাদী সুর। 'বাউল-কীর্তন' হল অতুলপ্রসাদের এক বিশেষ সৃষ্টি। যদিও এই রীতির পথ নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাজী নজরুলের গানে রাগ

নজরুলের খেয়াল অঙ্গের গানগুলিতে খেয়ালের যে রূপ প্রতিফলিত হয়েছে তাতে প্রচলিত, অপ্রচলিত উভয় রাগের সুরই প্রবিষ্ট হয়েছে। কাব্যগুণ সম্পন্ন খেয়াল অঙ্গের গানে তান. সরগম, বিস্তার, বিভিন্ন অলংকারিক প্রয়োগ রয়েছে। নজরুলের খেয়াল অঙ্গের গান দুইভাগে বিভক্ত। একটি হিন্দী ভাঙা খেয়াল, যার মূল সুর হিন্দী খেয়াল থেকে নেওয়াহয়েছে কিন্তু বাণী বাংলায়। অপরটি মূল হিন্দী খেয়ালের আদলে রচিত বাংলা খেয়াল। নজরুলের খেয়াল অঙ্গের গানে যে সব রাগ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে মেঘ, মালকোষ, খাম্বাবতী, যোগিয়া, পিলু-বাঁরোয়া, নটবেহাগ, জয়জয়ন্তী, জৌনপুরী, দূর্গা, ভূপালী ইত্যাদি প্রধান। বাংলাগানে নজরুল যে নতুনত্ব ও মাধুর্য এনেছিল তার অবকাঠামো ছিল রাগ বা সুরের সাথে গানের কাব্যিক মূল্যের একে অপরের পরিপূরক সংযোজন। ফলে নজরুলের রাগভিত্তিক সংগীতে তৈরী হয়েছিল স্বর ব্যঞ্জনা ও স্বর সঙ্গতির সাথে কাব্যের কাব্যরস আপ্লুত আবেগ। রাগপ্রধান বাংলা গান রচনার এক অপূর্ব পটভূমি ছিল নজরুলের গান। তাঁর রচিত গানগুলি যদি আলাদাভাবে 'নজরুলগীতি' হিসেবে নামাঙ্কিত না হত তবে রাগপ্রধান বাংলাগানের ঐশ্বর্য্য আরো বেড়ে যেত। কেননা নজরুলের গান 'নজরুলগীতি' হবার আগে অনেক বেশি স্বাধীন বিহারী ছিল।[২৬]

তবে রাগপ্রধান বাংলা গান তাঁর কাছে চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবে। কবি নজরুল রাগপ্রধান বাংলাগানকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, গজল, দাদরা, ঠুংরীর চটুল লীলারূপকে তিনি অপরূপ ছন্দে বাংলাগানের মাধ্যমে পরিবেশন করতেন। একটি রাগ বা রাগিনীই নয় সূক্ষ্মভাবে কৌশলের সাথে রাগমিশ্রণের মধ্যেই এবং

একাধিক রাগ অবলম্বনে সুর রচনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে রাগপ্রধান গানের সৌন্দর্য্য। তাই রাগপ্রধান বাংলাগানের উৎস সন্ধানে আমরা নজরুলকে অনেক বড় উচ্চতায় স্থাপন করতে পারি নির্দ্বিধায়। রাগসংগীত ও রাগপ্রধান এক বিষয় নয়। বাংলাগানের ধারায় রাগসংগীত মিশ্রিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে রাগপ্রধান বাংলাগান। তিরিশের দশকে রাগপ্রধান বাংলাগান রচনায় কবি নজরুল এক অসাধারণ সৃজনশীল কর্মকান্ডের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। ঐ সময়ে কলকাতা বেতারে 'হারামনি' 'সারঙ্গ-রঙ্গ', 'যাম-যোজনায় কড়ি মধ্যম', 'নবরাগ মালিকা' ইত্যাদি অনুষ্ঠানে নজরুলের রাগপ্রধান গান প্রচার হত। নজরুলের এই সৃজনশীল সৃষ্টিই সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'রাগপ্রধান' নামকরণকে প্রভাবিত করেছিল।[২৭]

রাগপ্রধান গানে নজরুলের অবদান সম্পর্কে চিন্ময় লাহিড়ী বলেছেন,

আমার যতদূর জানা আছে, এ বিষয়ে সৃষ্টিকর্তা হলেন শ্রদ্ধেয় কাজী নজরুল ইসলাম। সম্প্রতি এর চলন একটু বেড়েছে বটে কিন্তু ৩০/৩৫ বছর আগেও রাগপ্রধান বলে কোন গান কাউকে গাইতে আমি তো শুনিনি। যখন কাজী দা রাগাশ্রিত গান তৈরী করে বাজারে ছাড়লেন কিন্তু এই গানে তান, সরগম কেন, এমনকি বোলবিস্তার বা বোলতান পর্যন্ত ব্যবহার করেননি; শুধু রাগের কাঠামোর উপরই গান শিখিয়েছেন। এখন পরিবর্তনের যুগ, সব জিনিসেই একটু না একটু পরিবর্তন হচ্ছে, সেই দৃষ্টি রেখে অলংকার হিসাবে (খেয়ালের মত নয়) ছোট ছোট হরকত, ছোট ছোট তান ও ছোট ছোট সরগম ব্যবহার করা যায় তাহলে আমার মনে হয়, এর গাম্ভীর্য আরো বাড়বে ও শ্রুতিমধুর হবে, তবে নিজের মতামতের উপর। মোট কথা রাগপ্রধান যে একটি আলাদা সাবজেক্ট এটাই যেন পরিষ্কার বোঝা যায়। না খেয়াল, না ঠুংরি, এটা যেন মনে না হয়।[২৮]

নজরুলের রাগপ্রধান গানের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও অবয়বের ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া হলঃ

১. রাগপ্রধান গানের প্রধান ও মুখ্য লক্ষণ রাগসংগীতের প্রকাশ ভঙ্গির সাথে গানের বাণী বা কাব্যমূল্য সুরস্নাত হয়ে সামগ্রিক ভাব ব্যাঞ্জনা উপস্থাপন করা।

২. খেয়াল-গায়ন শৈলী আশ্রয় করে কিন্তু তার দূরূহতা বর্জন করে রাগের সহজ সরল রূপায়নকে অবলম্বন পূর্বক বাংলা গানের বাঙালিয়ানাকে অব্যাহত ও অক্ষুন্ন রাখাই রাগপ্রধান গানের লক্ষ্য।

৩. রাগপ্রধান গান শুদ্ধ রাগ বা শালংক রাগ আশ্রিত হোক কিন্তু গায়ন ক্রিয়ার মধ্যে কি কি অলংকার, তানের দৈর্ঘ্য

---

[২৬]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ১৬-১৭

[২৭]ইদরিস আলী, *নজরুল সংগীতের সুর*(ঢাকা: নজরুল ইনষ্টিটিউট, ১৯৯৭) পৃ ১৫৭-১৫৮

[২৮]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ৪৯

কতটা বা অন্যান্য গীতরীতি যেমন-বাণী বিস্তার, কখনও বা আলাপ, তালবাদন ক্রিয়া কোন মাত্রায় বা ছন্দে হবে-এসব দিক নির্দেশনা থাকবে।

৪. প্রাচীন ধারণা বাদ দিয়ে আধুনিক গায়কী পদ্ধতি অবলম্বন করে কিন্তু কণ্ঠ উপস্থাপনায় থাকবে স্বতন্ত্রতা।

৫. রাগপ্রধান গান পরিবেশনে কণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব দাবী করে। গায়কী মুক্তির সাথে শিল্পীর শিল্পবোধ গানকে সুর, ছন্দ ও কাব্যরসে ভরপুর করে একটি সীমিত পরিসরে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই জন্য রাগপ্রধান গান সম্পূর্ণ রাগ সংগীতও নয়, আবার আধুনিকও নয়।[২৯]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শাস্ত্রীয় সংগীতের ধ্রুপদ ধারা ব্যবহার করে প্রচুর গান রচনা করেছেন। সে তুলনায় নজরুলের ধ্রুপদাঙ্গের গানের সংখ্যা খুব কম। কারণ, কাব্যের ভাবব্যঞ্জনার চেয়ে সুরের রূপ ব্যঞ্জনার প্রতি নজরুলের ঝোঁক ছিল বেশী। নজরুলের ধ্রুপদাঙ্গীয় রাগপ্রধান বাংলাগানগুলো প্রচলিত শাস্ত্রীয় ধ্রপদের ন্যায় নোম, তোম, দেরে ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে 'আ' কার দিয়ে গাওয়া হয়। গানের বাণীতে দেব-দেবীর স্তুতি বর্ণনা হয়েছে বেশী। কাব্যে ভক্তি ভাব, গুণকীর্তন, স্তুতিপাঠ ও প্রকৃতির বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। চার তুক বিশিষ্ট গানগুলিতে ঝাঁপতাল ও সুরফাক্তা তাল বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ধ্রুপদের ন্যায় দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ লয়কারীর পরিবর্তে গীতাংশে বোল বিস্তার, স্বর বিস্তার ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। ধ্রুপদাঙ্গে রাগপ্রধান গানের মধ্যে নজরুল সৃষ্ট রাগের গানও রয়েছে। যা আদি ও প্রাচীন গায়নরীতি থেকে ভিন্ন। তবুও গানগুলিতে রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। নজরুলের ধ্রুপদাঙ্গের গানগুলি ধ্রুপদের খান্ডার ও ডাগর বাণীর অর্ন্তগত। গানগুলিতে ভক্তি ও বীর রসের প্রভাব রয়েছে। নজরুল সৃষ্ট রাগে রচিত একটি ধ্রুপদাঙ্গীয় গান বিশ্লেষণ করা যাক।

রাগ : অরুণ-ভৈরব।

ঠাট : ভৈরব।

আরোহণ: ধ্ ণ্ স ঋ স গ ম, দ প, ণ ধ র্স

অবরোহণ : র্স ণ ধ ণ পম দপ মগ ঋস

বাদী : মধ্যম।

সমবাদী : ষড়জ। অঙ্গ : পূর্বাঙ্গ।

---

[২৯]ইদরিস আলী, *নজরুল সংগীতের সুর*(ঢাকা: নজরুল ইনষ্টিটিউট, ১৯৯৭) পৃ ১৫৮

গায়ন সময় : দিবা প্রথম ভাগ।

প্রকৃতি : গম্ভীর।রস : বীর।

স্বর পরিচয়: রেখাব, ধৈবত ও নিষাদ কোমল, বাকী স্বর শুদ্ধ। উভয় ধৈবত ও গান্ধার ব্যবহৃত হয়। আরোহনে রেখা বর্জিত, অবরোহনে ধৈবত ও গান্ধার বর্জিত। আরোহনে পঞ্চম ও কোমল নিষাদ এবং অবরোহনে শুদ্ধ ধৈবত বক্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

জাতি : ষাড়ব-ঔড়ব।

ন্যাসস্বর : ষড়জ।

গান :

জাগো অরুণ-ভৈরব, জাগো হে শিব-ধ্যানী

শোনাও তিমির-ভীত-বিশ্বে নব দিনের বাণী॥

তোমার তপ: তেজে, শিব, দগ্ধ বুঝি হয় ত্রিদিব,

শরণাগত চরণে তব-হের নিখিল প্রাণী॥

ধ্যান হোক ভঙ্গ তব শক্তিলয়ে সঙ্গে,

সৃষ্টির আনন্দে হর লীলা কর রঙ্গে।

ললাটের বহ্নি ঢাকো শশী লেখার তিলক আঁকো

ফণি হোক মণিহার হে পিণাক-পানি॥

গানটি ঝাঁপতালে নিবদ্ধ, 'সাদরা' প্রকৃতির গান। 'সাদরা' ঝাঁপতালে নিবদ্ধ ধ্রুপদের এক প্রকার গায়নরীতি, যা লঘু প্রকৃতির হয়ে থাকে। গানের স্থায়ী অংশে বীর রসাত্মক কাব্য ভাব প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং শিবের স্তুতি ব্যঞ্জনা করা

হয়েছে। এবার গানটির স্বরলিপি বিশ্লেষণ করা যাক। অরুণ-ভৈরব রাগটির পূর্বাঙ্গের আরোহণে খাম্বাজ এবং অবরোহণে 'নির্ঝরিণী' রাগ (নজরুল সৃষ্ট রাগ) এবং কিছুটা আহীর-ভৈরব রাগের রূপ লক্ষ্য করা যায়।

'শোনাও তিমির ভীত' এই অংশে আহীর ভৈরবের ছোঁয়া রয়েছে। যেমন:

I	সা	-া	।	ণধ	ণ্	গ	।	ঋ	ঋ	।	ঋ	-া	ঋ	I
	শো	০		না	ও	তি		মি	র		ভী	০	ত	

তবে স্থায়ীতে অরুণ-ভৈরবের শুদ্ধ রাগরূপ স্পষ্ট। যেমন:

II	দ	প	।	ম	ম	ম	।	ঋঋ	-া	।	ঋ	স	-া	I
	জা	গো		অ	রু	ণ		ভৈ	০		র	ব	০	
I	স	স	।	ধ্	ণ্	গ	।	গ	-া	।	ম	-া	-া	I
	জা	গো		হে	শি	ব		ধ্যা	০		নী	০	০	
I	স	-া	।	ণধ্	ণ্	গ	।	ঋ	ঋ	।	ঋ	-া	ঋ	I
	শো	০		ইা	ও	তি		মি	র		ভী	০	ত	
I	গঋ	গঋ	।	স	-া	-া	।	স	গ	।	ম	প	প	I
	বি	০		শ্বে	০	০		ন	ব		দি	নে	র	
I	প	-া	।	ঁমগ	-া	-া	।	-গম	-পদ	।	মগ	মঋ	স	II
	বা	০		ণী০	০	০		০০	০০		০০	০০	০	

স্থায়ীর শেষে 'মগ মঋ স' স্বর -সংগতি আহীর ভৈরব ও নির্ঝরিণী রাগের প্রত্যক্ষ স্পর্শ প্রকাশ করে। অন্তরায় এসে পুনরায় অরুণ ভৈরব রাগের অবয়ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

I I	ম	গ	।	-ম	প	প	।	ণ	ধ	।	র্স	র্স	-া	I
	তো	মা		র	ত	প:		তে	০		জে	শি	ব	

I	র্ঋ	-া	।	র্ঋ	র্ঋ	র্ঋ	।	ঋর্ম	ঋর্ম	।	র্ঋ	র্ঋ	-র্স	I
	দ	গ্		অ	বু	ঝি		হ	য়		ত্রি	দি	ব্	
I	র্ঋ	ণ	।	ণর্স	র্ধ	ধ	।	ণ	ণ	।	প	ম	ম	I
	শ	র		ণা	গ	ত		চ	র		ণে	ত	ব	
I	দ	দ	।	প	ম	ম	।	ম	ঋ	।	স	-া	-া	I I
	হে	র		নি	খি	ল		প্রা	০		ণী	০	০[৩০]	

প্রাণের সঞ্চারী ও আভোগে এসে রাগ অরুণ-ভৈরব পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ধ্রুপদাঙ্গের গান হওয়ার কারণে এই গান পাখোয়াজে সংগত করলে প্রকৃত রস আস্বাদিত হবে।

কবি নজরুলের একটি 'খেয়াল অঙ্গের রাগপ্রধান গান' বিশ্লেষণ করা হল :

ভবনে আসিল অতিথি সুদূর
সহসা উঠিল বাজি রুমু রুমুঝুমু
নীরব অঙ্গণে চঞ্চল নূপুর।

গানটি গৌড় সারং রাগে, বর্ষা ঋতু ভিত্তিক গান। এটি কবির নিজে সুর করা। শিল্পী : ভবানী দাশ। রেকর্ড নং : Mega phone J. N. G – ৫৪৯৭। প্রথমেই, গৌড় সারং রাগের পরিচয় জানা যাক। এই রাগ কল্যাণ ঠাটের রাগ। এই রাগে দুটি মধ্যম ব্যবহৃত হয়, বাকী সব স্বর শুদ্ধ। কল্যাণ ঠাটের হামীর, কেদার ইত্যাদি রাগের ন্যায় এই রাগে গান্ধার ও নিষাদ বক্রভাবে ব্যবহৃত হয়। এই রাগে কখনও কখনও কোমল নিষাদ রাগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য বিবাদী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাগের জাতি : সম্পূর্ণ -সম্পূর্ণ। বাদী : গান্ধার, সমবাদী : ধৈবত। গায়ন সময় : দিবা দ্বিতীয় প্রহর।আরোহন : স, গ র ম গ, প ক্ষ ধ প, ন ধ র্স

অবরোহন : র্স ধ ন প, ধক্ষ পগ, মর, পরস

পকড় : স, গর মগ, পরস

গৌড়মল্লার রাগে বিশেষ স্বর সংগতি হল 'রগরমগ' ও 'গরমগ'। সারং এর রাগজ্ঞাপক স্বর সমষ্টি হল 'মর পর'। গৌড়

[৩০]নবরাগ, স্বরলিপিকার: জগৎ ঘটক ও কাজী অনিরুদ্ধ(ঢাকা: নজরুল ইনষ্টিটিউট,২০০৫) পৃ ২৪-২৫

সারং রাগের অবরোহতে এই স্বর সমষ্টি পাওয়া যায়। এই রাগে তীব্র মধ্যম অপেক্ষা শুদ্ধ মধ্যম এর প্রয়োগ বেশী। তীব্র মধ্যম শুধু আরোহে সামান্য প্রযোজ্য। যেমন : ' ক্ষধপ' বা ' ক্ষপ' । গৌড় সারং এ 'প র' স্বরসংগতিই মুখ্য। আলোচ্য গানটির স্থায়ী অংশে

	০					১					+					৩				
“II	{ম	গমগ	র	স	।	ন্	র	গ	-া	।	[স]গঃ	রঃ	[র]ম	গ	।	প	ক্ষ	ধপক্ষ	প	I
	ভ	ব০০	নে	আ		০	সি	ল	০		অ	০	তি	থি		সু	০	দূ০০	র্	
I	ধ	ন	র্সন	র্রর্স	।	র্সন	নধ	ধপ	প	।	[ম]গঃ	মঃ	র	গমপঃ	।	রঃ	র	[র]স	-া	I
	স	হ	সা০	উ০		ঠিঁ০	ল০	বা০	জি		রু	০	মু	রু০০		০	মু	ঝু	ম্”[৩১]	

অতিথি সুদূর এই অংশে 'গর মগ পক্ষ' স্বরসমষ্টি গৌড় সারং রাগরূপ ফুটিয়ে তুলেছে। সঞ্চারীর 'কে দিল বুলায়ে' অংশে গৌড় অংশ পাওয়া যায়।

I	গম	প	র	ও	।	সঃ	-া	ধ্	ন্	।	স	গ	র	ম	।	প	-া	-া	-া	I
	কে০	০	০	দি		ঔ	০	০	বু		লা	০	০	০		য়ে	০	০	০	

“এই অংশে নজরুল গৌড় এবং সারং রাগের পরিপূর্ণ রাগরূপ বজায় রেখেছেন, অন্য রাগের প্রভাব ফেলেননি।”[৩২]গানটিতে কবি গৌড় সারং রাগের মাধ্যমে বর্ষার চিরায়ত রূপকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বলাবাহুল্য কবি সার্থকভাবেই বর্ষাকে নৃত্যে পারঙ্গম অতিথি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কামোদ ও মালবশ্রী রাগের মিশ্রণে সৃষ্ট 'আমি সূর্যমুখী ফুলের মত' গানটি বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমে, রাগ দুটির পৃথক পৃথক পরিচয় জানা যাক। রাগ কামোদ কল্যাণ ঠাটের রাগ। জাতি : বক্রসম্পূর্ণ। এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল। গায়ন সময় : রাত্রির **১**ম প্রহর। বাদী : পঞ্চম, সমবাদী : রেখাব।

আরোহণ : সরপ -ক্ষপ ধপ- ধর্স।

---

[৩১]লীনা তাপসী খান, *নজরুল সংগীতে রাগের ব্যবহার*(ঢাকা: নজরুল ইনষ্টিটিউট, ২০১১) পৃ ২৭-২৮

[৩২]তদেব পৃ ২৮

অবরোহণ : র্স ন ধ প, গমপ- গমরস।

মালবশ্রীও কল্যাণ ঠাটের রাগ। জাতি :- ঔড়ব ঔড়ব। বাদী : পঞ্চম, সমবাদী : ষড়জ। গায়ন সময় : দিবা তৃতীয় প্রহর।

আরোহণ : স গ ক্ষ প ণ র্স।

অবরোহণ: র্স ন প ক্ষ গ স।

আমি সূর্যমুখী ফুলের মত

দেখি তোমায় দূর থেকে

দলগুলি মোর রেঙ্গে ওঠে

তোমার হাসির কিরণ মেখে

ঠুমরি গানে রাগ মিশ্রণের সুযোগ বেশী থাকায় কবি নজরুল অধিক পরিমাণে ঠুমরি অঙ্গেই গান রচনা করেছেন। আলোচ্য গানে দুটি রাগের অপরূপ মিশ্রণ, ঠুমরির বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ সুরবৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। যেমন : 'আমি সূর্যমুখী 'এই অংশে (স, সর, সন্‌ধ্‌ন্‌ সগ : র : ম গর গ) কামোদ এর রূপ ফুটে উঠেছে।

"রস	ণ	ণধ	পধ	পধ	ক্ষাপ:	ক্ষাপ:	স
দূ০	০	র০	থে০	কে০	০০	০০	০"[৩৩]

নজরুলের নিজের সুর করা বহুল প্রচলিত ঠুমরি-

বধুঁ তোমার আমার এই যে বিরহ, এক জনমের নহে

তাই যত কাছে পাই তত এ হিয়ায়, কি যেন অভাব রহে।

---

[৩৩]লীনা তাপসী খান, *নজরুল সংগীতে রাগের ব্যবহার*(ঢাকা: নজরুল ইনষ্টিটিউট,২০১১)পৃ৫৩

গানটি খাম্বাজ রাগের সুর করা হলেও ভৈরবী ও কাফির প্রভাব রয়েছে। স্থায়ীর শুরুতে খাম্বাজের পরিপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও পরের চরণে 'এক জনমের নহে' অংশটিতে কোমল ধৈবত ও কোমল নিষাদের ব্যবহার দেখা যায়। পুরো গানটিতে এইরূপ খাম্বাজ, ভৈরবী ও কাফীর সংমিশণ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত, তিনটি রাগই চটুল এবং ঠুমরির জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

প্রেম ও ভক্তি রসাত্মক এই টপ্পা গানগুলি রাগপ্রধান গান সৃষ্টির অন্যতম সহায়ক। মূলত টপ্পা শ্রেণির গান থেকেই বাংলাগান বিশেষত রাগপ্রধান গানের প্রচলন শুরু হয়েছিল। নজরুলের নিজের সুর করা একটি টপ্পা অঙ্গের গান বিশ্লেষণ করা যাক।

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে গানটি জয়জয়ন্তী রাগে রচিত, যৎ তালে নিবদ্ধ। খাম্বাজ ঠাটের রাগ জয়জয়ন্তী। জাতি সম্পূর্ণ - সম্পূর্ণ, পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। গায়ন সময় : রাত্রির ২য় প্রহর। বাদী - রেখাব, সমবাদী-পঞ্চম।

আরোহণ : স র গ ম প ন স

অবরোহণ : সণ ধপ, মগ রজ্ঞ রস।

পকড় : র জ্ঞ র স, ধ্ ণ্ র।

জয়জয়ন্তী রাগের উদ্ভব গৌড়, বিলাবল ও সুরট এই তিন শ্রেণির রাগের মিশ্রণে হয়েছে । এই রাগে দুটি গান্ধার ও দুটি নিষাদ ব্যবহৃত হয়। এই রাগে রজ্ঞ মজ্ঞ, মগ রজ্ঞ ইত্যাদি স্বর সংগতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই রাগকে পরমেল প্রবেশক রাগও বলা হয়। 'আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে' গানটির রেকর্ড নং- HMVN শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী। স্বরলিপি : নজরুল সংগীত স্বরলিপি- ২৫। স্বরলিপিকার : সালাউদ্দিন আহমেদ।গানের স্থায়ীতে স্পষ্ট জয়জয়ন্তী রাগরূপ লক্ষ্যণীয়।

"ধ্	ণ্	রজ্ঞ	রর	-া	-া	জ্ঞ	গ	রজ্ঞ	ম	জ্ঞমজ্ঞ	রজ্ঞ	রসস
আ	মার	শ্যামা	মায়ে	০	০	র	কো	লে০	০	০০০	০০	চ০ড়ে"[৩৪]

[৩৪]লীনা তাপসী খান, *নজরুল সংগীতে রাগের ব্যবহার*(ঢাকা: নজরুল ইনষ্টিটিউট,২০১১) পৃ ৭৮

গানের শুরুতে 'মা' সংযোগে যে আলাপ দেখা যায় তাতে 'জ্ঞর জ্ঞম জ্ঞমজ্ঞর' স্বর সমন্বয় দেখা যায়। এতে জয়জয়ন্তী রাগের চলন বিচ্যুতি হলেও 'আমার শ্যামা মায়ের কোলে' অংশে জয়জয়ন্তী ফিরে এসেছে। স্থায়ীর 'শ্যামের নাম' অংশে টপ্পার বিশেষ দানাদার কাজের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অন্তরার শেষাংশে দানাদার টপ্পার কাজ থাকলেও তা জয়জয়ন্তী থেকে বিচ্যুত হয়ে কাফী রাগে সুর সংযোগ করা হয়েছে।

নস স ন ধ প ম জ্ঞর সর জ্ঞ মপধনস

মা০ আ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০০০০০

টপ্পা বিশেষ আঙ্গিকের গান হলেও নজরুল তাঁর নিজস্ব ভাবনাকে রাগরূপে রূপায়িত করে যে টপ্পাগুলি রচনা করেছেন তাতে রাগপ্রধান বাংলাগানের ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। টপ্পা অঙ্গের একটি বিখ্যাত রাগপ্রধান গান হল-

গানগুলি মোর আহত পাখির সম।

লুটাইয়া পড়ে তবে পায়ে প্রিয়তম ।

দাদরা তালে নিবদ্ধ গানটি রাগ ভৈরবীতে সুরারোপিত। কাব্যরসে প্রেম বিষয়ক ভাব নিঃসৃত হয়ে বাণীর আবেদন সুরের পরশে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। গানটিতে টপ্পার ঢং সুস্পষ্ট, কখনও কখনও 'জমজমা'র ব্যবহার করা হয়েছে। দুটি স্থানে সামান্য ভায়ঁরো ও টোড়ী রাগের স্পর্শ রয়েছে যা গানের সৌন্দর্য্যকে বৃদ্ধি করেছে বহুগুণে।

নজরুল সৃষ্ট রাগে রাগপ্রধান গান

আধুনিক কাব্য গীতিতে যাঁরা প্রধান তাঁরা হলেন রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি.এল রায়, অতুল প্রসাদ এবং অবলুপ্ত রাগ উদ্ধারে সচেষ্ট ছিলেন। ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রে উল্লেখিত অসংখ্য রাগ হতে নজরুল সৃষ্টি করেছেন নতুন নতুন রাগ। মূলত ১৯৩৯-৪০ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে তিনি যে দুটি অনুষ্ঠান করেছিলেন যথা-উদাসী ভৈরব ও নবরাগ মালিকা। এই দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই তাঁর রচিত রাগগুলি প্রচারিত হয়। 'উদাসী ভৈরব' নাটকটি জগৎ ঘটকের রচনা কিন্তু এই নাটকের গানগুলি নজরুলের সৃষ্টি। ভৈরব ঠাটের নতুন ৬টি রাগ যথা-অরুণ ভৈরব, আশা ভৈরবী, শিবানী ভৈরাবী, রুদ্র ভৈরবী, যোগিনী এবং উদাসী ভৈরব।

রাগপ্রধান বাংলাগানের ক্ষেত্রেও যুগ প্রবর্তকের ভূমিকা পালন করেন নজরুল। তবে এ কথা বলা যায় যে, রাগ সংগীত বরাবরই বাংলাগানকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করেছে। সংগীতের ক্ষেত্রে নজরুলের অবতীর্ণ হওয়ার কিছু আগে বাংলাগানে, বিশেষ করে রবীন্দ্র সংগীতে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কেননা রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি অঙ্গে গান রচনা

করলেও বাণীর ক্ষেত্রে রাগ সংগীতের সুরের কাঠামোটি গ্রহণ করলেও, সুরবিস্তারের বিষয়টি তিনি এড়িয়ে গেছেন। ফলে রাগ সংগীতের প্রকৃত রূপায়ণ রবীন্দ্র সংগীতে ঘটেনি। কিন্তু রাগ প্রধান বাংলাগানে রাগ সংগীতের সুরভান্ডারকে নজরুল উজার করে এনে গ্রথিত করতে সমর্থ হন। ফলে বাংলা গানের ঐতিহ্যের বহুমুখীকরণ ঘটে। রাগ সংগীত যেমন আলাপ, বিস্তার, তান, সরগম রয়েছে, বাংলাগানেও সেসবের সমন্বয় ঘটিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ও সুনিপুণভাবে তিনি রচনা করেন 'মেঘ মেদুর বরষায় (রাগ : জয়জয়ন্তী, তাল; ত্রিতাল) গগনে সঘন চমকিছে দামিনী (রাগ : মেঘ, তালত্রিতাল)।[৩৫]

গ্রামোফোন কোম্পানীর চাকরি, কলকাতা বেতারের সংগীত পরিচালনা ইত্যাদি নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নজরুল পরিণত চিন্তাশক্তি সম্পন্ন হতে পেরেছিলেন যা পরবর্তীকালে সংগীত জগতে বিপুল পরিমাণ শিল্প যোগ করতে সহায়ক করেছিল। আজকের স্ব মহিমান্বিত 'নজরুল গীতি' এই নামে পরিচিত হওয়ার পূর্বে ছিল রাগপ্রধান গানেরই আরেক রূপ। বেতারের আর্কাইভ থেকে নজরুলের মহামূল্যবান সেইসব সৃষ্টির অক্ষত ইতিহাস আজও পাওয়া যায়। যেখানে রয়েছে ভারতীয় রাগসংগীতের জগতে আরো কিছু নতুন রাগ সংযোজন। নবরাগ মালিকা নামেই যার আসল পরিচয়। নজরুল তার সৃষ্ট রাগ 'বেনুকা'য় সুরারোপ করে রচনা করেছেন এই গানটি।

বেনুকা ও কে বাজায় মহুয়া বনে ।
কেন ঝড় তোলে তার সুর আমার মনে

রাগটি কিছুটা পাহাড়ী ও তিলক কামোদ রাগের মত শোনায়।

আরোহণ : সর ম, পন ধ ম, প ধ র্স

অবরোহণ : র্সন, পধ ম, গ, রগ, স

বাদী : মধ্যম ; সমবাদী : ষড়জ। গানটি ত্রিতালে নিবদ্ধ।

'মিনাক্ষী' রাগিনীকে কবি রচনা করেছিলেন এইভাবে,

আরোহণ : ন্ ধ্ স ন্ র, গমপ, গ ম প ধ র্স

অবরোহণ : র্স ন ধ ম, প দ প, মজ্ঞ র, গ স

---

[৩৫]রাশিদুন্ নবী, সংগীত স্রষ্টা নজরুল, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, আগষ্ট ৩০, ২০১৯ http://edailyjanakantha.com/?d=2019 30&p=4 accessed in 24 January, 2021.

বাদী : রেখাব, সমবাদী : পঞ্চম। রাগিণীটি 'নীলাম্বরী', কাফি, হংসকিঙ্কিনীর মিশ্রণ। এর গতি মীনের মত বক্র ও চঞ্চল বলেই এর নাম দিয়েছিলেন মিনাক্ষী।

এই রাগিনীতে রচিত গান হল :

চপল আঁখির ভাষায় হে মিনাক্ষী কয়ে যাও

না বলা কোন বাণী বলিতে চাও।

এই রাগিনীর জাতি ষাড়ব সম্পূর্ণ। চলন বক্রগতি সম্পন্ন, পূর্বাঙ্গের রাগ। রাগটিকে কাফী ঠাটের জন্য বলা যেতে পারে।

রাগিনী 'বনকুন্তলা'য় কবি রচনা করেছিলেন 'বন শাবরী ঝুরে' এই গানটি।

রাগিনীটির আরোহণ : সর গপ, ধপ, পধর্স

অবরোহণ : র্স ন ধপ গ র, গ স র।

বাদী : রেখাব, সমবাদী : পঞ্চম। গ্রহ ও ন্যাস স্বর : রেখাব।

অবরোহে পঞ্চম ও ধৈবত অবলম্বন থাকায় ভূপালী থেকে আলাদা হয়েছে।

নজরুল সৃষ্ট অপর একটি রাগিনী হল 'দোলন চাঁপা'। গানটি হল,

দোলন চাঁপা বনে দোলে

দোল পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে।

আরোহণ : স গ ক্ষ প, গ ম ন ধ, প ন ধ র্স

অবরোহণ : র্স ন ধন, ধন ধপ ক্ষপ, গম গম রস।

বাদী : ধৈবত, সমবাদী : ষড়জ। কবি নজরুল এই রাগিনীতে হামীর, কামোদ ও নটের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

নবরাগ মালিকার সর্বশেষ রাগিনীটি হল 'সন্ধ্যা মালতী'। এই রাগে রচিত গানটি হল :

শোনো ও সন্ধ্যামালতী বালিকা তপতি

বেলা শেষের বাঁশী বাজে বাজে।

আরোহণ : ন্ স জ্ঞ র, সগ মপ, জ্ঞম প, ন ধ ম, পনর্স অবরোহণ : র্স ন দ প, মজ্ঞ র স। বাদী : পঞ্চম, সমবাদী : গান্ধার। আরোহে মূলতান ও পিলুর মিশ্রণ রয়েছে এবং অবরোহে বাঁরোয়া, ধানী ও মূলতানের মিশ্রণ রয়েছে।[৩৬] রবীন্দ্র সংগীত শাস্ত্রীয় সংগীত দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভঙ্গিই প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রকৃত পক্ষে আধুনিক বাংলাগান বলা হোক আর রাগ প্রধান/ রাগাশ্রয়ী গান হোক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই গানের ভাব ও প্রকৃতি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ভারতীয় রাগসংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণধর্মী উক্তিগুলো বাংলা গানের সাথে রাগসংগীতের সম্পর্ককে আরও মজবুত করেছে। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়কে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "তুমি বলবে আমাদের দেশের গানের বৈশিষ্ট্যই তাই, গায়কের রুচি ও শক্তিকে সে দরাজ জায়গা ছেড়ে দেয়। কিন্তু, সর্বত্র এ কথা খাটে না। খাটে কোথায়? যেখানে গানের চেয়ে রাগিনী প্রধান। রাগিনী জিনিসটা জলের ধারা; বস্তুত সেই রকম আকৃতি-পরিবর্তনের দ্বারাই তার প্রকৃতির পরিচয়।"[৩৭] রাগপ্রধান বাংলাগানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাব বিশ্লেষণধর্মী মতগুলোকে সামনে রেখেই রাগপ্রধান গানের রচয়িতাগণ হেঁটেছেন। এঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অগ্রগণ্য। কাজী নজরুল ইসলামের রাগ-রাগিনীর ব্যবহার ও রাগপ্রধান গান সৃষ্টির বিষয়ে এই অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও কাজী নজরুলের মতাদর্শকেই সর্বাগ্রে আনতে হয়। রাগ-রাগিনী ও বাংলাগান নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় কাজী নজরুলের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। আকাশবাণীতে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত থাকাকালীন তিনি রাগপ্রধান বাংলাগানকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। 'সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি আমারে ছুঁইয়াছিলে' গানটিতে পিলু রাগ রূপ অথবা 'ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান' গানটিতে বেহাগ রাগরূপের প্রকাশ আধুনিক বাংলা গানে রাগের ব্যবহারকে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলেছিল। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর রচনায় রাগরূপকেই বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর রচিত গানগুলো শুনলে ঐ গানের কথার সাথে রাগের বুননগুলোও মনকে আন্দোলিত করে। এত স্পষ্ট ভাবে রাগ রূপের প্রতিফলন অন্যকোন রচনায় পাওয়া যায় নি। গানের ভাবকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রাগ মিশ্রণ করেছেন। অথচ তাঁকে অনুসরণ করেই নজরুল গানে রাগরূপকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন,

---

[৩৬]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ৯৩-৯৫

[৩৭]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীত চিন্তা*(কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৩৯৯) পৃ ৮৮

রাগের অবয়বের ছাঁচে গানের কথা বসিয়েছেন। গতানুগতি রাগ-রাগিনীতে সেটা সম্ভব না হলে তিনি নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন। যেমন 'নির্ঝরিণী' নজরুল সৃষ্ট রাগ। এই রাগে তিনি রচনা করেছেন 'রুমঝুম রুমুঝুম কে বাজায় জল ঝুমঝুমি'। নির্ঝরিণী রাগটির চলন এই রূপ - সপ, গমপ, মগম, ঋস, প্স, এই রাগিনী উত্তরাঙ্গ প্রধান, অবরোহণের তীব্র নিখাদ গুপ্ত থাকে অর্থাৎ বর্জিত নয়, বিবাদী। অবরোহণে ধৈবত আন্দোলনকালে কিছুটা ভৈঁরো ঠাটের জিলফের আভাস আসে। এই রাগের গতি 'শোথ' অর্থাৎ চঞ্চল। ঝর্ণাধারার মত অবরোহণকালে এই রাগের চঞ্চল গতি ফুটে ওঠে। জলধারার মেঘরূপে পবর্তারোহণের মত এর গতি গম্ভীর ও শ্লথ এবং অবরোহণে গতি চঞ্চল বলে এই রাগের নাম নির্ঝরিণী। রুমঝুম রুমুঝুম কে বাজায় - গানটির স্থায়ী অংশে স্পষ্টতই রাগ রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

স া প গ ম পদ মপ র্স ন্দ া প া মগ ম ঋ স

রু ম ঝুম রু ম ঝু০ ০ম কে বা০ জা য় জল ঝুম ঝু মি

গানের কথায় ও রাগের চলনের এই অন্ত্যমিল কাজী নজরুল ইসলামের বিশেষত্ব। এরকম অসংখ্য গান তিনি রচনা করেছেন যেখানে রাগ রূপ স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে গানের প্রতিটি চরণে।

রজনীকান্ত সেনের গানে রাগ

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রজনীকান্ত সেনের গ্রন্থ 'কল্যাণী' প্রকাশিত হয় যেখানে বিভিন্ন রাগ-রাগিনী ও তালের বর্ণনা রয়েছে। আধুনিকযুগের সংগীতে প্রেম অত্যন্ত জনপ্রিয় বিষয়বস্তু হলেও রজনীকান্ত বিশেষত প্রেমের গান রচনা করেন নি। রজনীকান্তের গানের সুর প্রধানত সহজ সরল, জটিলতা বা সুরের মারপ্যাঁচ বিশেষ নাই, অথচ গানগুলি প্রচণ্ড হৃদয়গ্রাহী এবং সহজেই গানের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। রজনীকান্তের রাগাশ্রিত বাংলাগানের মধ্যে রয়েছে -

১. অনন্ত দিগন্ত ব্যাপী অনন্ত মহিমা তবু- রাগঃ বাগেশ্রী
২. তবু বিপুল প্রেমাচল চুড়ে- রাগ ঃ পরজ
৩. তুমি নির্মল কর- রাগঃ ভৈরবী
৪. আমি আকৃতি অধম- রাগঃ বেহাগ
৫. ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়- রাগঃ বাঁরোয়া

কবি রজনীকান্ত সেনের রাগাশ্রয়ী গানগুলো রাগপ্রধান গানের নেপথ্যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তাঁর গানে শাস্ত্রীয় ঢং না থাকলেও রাগের ব্যবহার করা হয়েছে অত্যন্ত সূক্ষভাবে যাতে রাগ ভাব প্রকাশিত হয়। যেমনঃ 'আমি অকৃতি

অধম' গানের দ্বিতীয় চরণে 'কম করে মোরে দাও নি' এই অংশে 'মগ স' স্বর সংগতি বেহাগ রাগের স্বর সংগতির সাথে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। তবে এই গানে উভয় নিষাদের প্রয়োগ রয়েছে যা বেহাগ রাগে দেখা যায় না। বেহাগ রাগের প্রকৃতি শান্ত, গানটিতে শান্ত একটা ভাব আছে। ঈশ্বরের কাছে করুণা প্রার্থনা করে, মনের অব্যক্ত ভাব প্রকাশ করার পংক্তিগুলো বেহাগের রাগ ভাবের মতই ধীরস্থির ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অতুলপ্রসাদের গানে রাগ

অতুলপ্রসাদের গানে রাগ-রাগিনী প্রয়োগ আমাদের রাগ-রাগিনীগুলোর রীতিকে অনুসরণ করেই করেছেন। কাব্যগীতি রচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুসারী ছিলেন। তাঁর রচিত বাংলাগানের সংখ্যা খুব বেশি নয় কিন্তু তিনি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে তাঁর গানে রাগ মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

যেমন-

১। ডাকে কোয়েলা বারে বারে রাগঃ গৌড় মল্লার

২। মুরলী কাঁদে রাধে রাধে রাগঃ মিশ্র আশাবরী

৩। কে আবার বাজায় বাঁশি রাগঃ পিলু

রাগপ্রধান গান উত্তর ভারতীয় রাগ-রাগিনীর অবয়বে গড়ে উঠেছে। যেহেতু রাগ গাইবার জন্য একটা নির্দিষ্ট গায়ন রীতি বা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় সেহেতু রাগপ্রধান বাংলাগানও সেই রীতিকে অনুসরণ করেই সৃষ্টি হয়েছে। ঊনিশ শতকের ত্রিশের দশকে বাংলা খেয়াল গানই মূলত রাগপ্রধান গান সৃষ্টির পেছনে অবদান রেখেছে বেশী। বৈঠকী বাংলাগান ও খেয়াল গানের প্রভাব, সুরারোপ, রাগ প্রয়োগের কৌশল, তান সরগম ইত্যাদির সমন্বয়ে রাগপ্রধান গানগুলি গড়ে উঠেছিল। খেয়ালের বাণী দুই একটি ক্ষেত্র ব্যতীত রাগপ্রধান গানে খুব বেশি প্রয়োগ হয়নি। যেমন, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত খেয়াল অংগের রাগপ্রধান গান 'ভোরের পাপিয়া ডাকে পিউ পিউ বোলে'। গানটির কথা ও সুর দিয়েছেন সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ললিত রাগে এবং ত্রিতালে নিবদ্ধ গানটির শুরু থেকে শেষ অবধি খেয়ালের বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করা হয়েছে। সুর বিস্তার, বোল বিস্তারে খেয়ালের যে রীতি, বাংলাপ্রধান গানে তার সুষ্ঠু প্রয়োগে ধীরে ধীরে রাগপ্রধান বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছে। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর গাওয়া রাগপ্রধান গানগুলি অনেক সময় শ্রোতাদের গোলক ধাঁধাঁয় ফেলে দেয়, এগুলো আসলে বাংলা খেয়াল না কি রাগপ্রধান গান। যেমন- 'এ কি তন্দ্রা বিজরিত আঁখিপাত' গানটি মালকোষ রাগে এবং ত্রিতালে নিবদ্ধ। এই গানে আলাপ, বিস্তার,

তান, বোল তান এবং মালকোষ রাগদারী দেখানোর পর একে বাংলা খেয়াল বললে ভুল হবে না। অন্যদিকে, কাজী নজরুল ইসলামের সুরারোপিত ছায়ানট রাগে 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর' গানটি প্রথমে রাগপ্রধান গান হিসেবেই প্রচারিত হলেও পরে নজরুলগীতি হিসেবে খ্যাত হয়। রাগপ্রধান বাংলাগানকে অন্যদিক থেকে প্রভাবিত করেছে ঠুংরী ও দাদরা। রাগপ্রধান বাংলাগানে বোল বিস্তারের লালিত্য এসেছে ঠুংরী ও দাদরা অঙ্গের অনুসরণেই। আবার এ দুটি ধারার পথ ধরেই বিভিন্ন রাগ মিশ্রণ, কথা সুরের সমন্বয়, হালকা চাল, চটুলতা ইত্যাদি বিষয় বাংলাগানে এসেছে। যেমন- জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের লেখা ও সুর করা বেগম আখতারের কণ্ঠে 'কোয়েলিয়া গান থামা এবার' এবং অনিল ভট্টাচার্যের কথা ও নির্মল ভট্টাচার্যের সুরে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'রাধিকা বিহনে কাঁদে রাধিকা রমন' গান দুটি তে স্পষ্ট দাদরা অংগের ছাপ। তবে ঠুংরী অংগের গান এ পর্যন্ত সবচেয়ে সমৃদ্ধভাবে রাগপ্রধান গানে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। ঠুংরী গানের বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন-মিলনবিরহের ভাব গাম্ভীর্য্য, মান অভিমান, আবেগ, রস আস্বাদন, লয়কারী ও সুরের সম্মিলিত রসায়ন, রাধা-কৃষ্ণ লীলা ইত্যাদির সমন্বয় রাগপ্রধান হিসেবে বাংলাগানকে করেছে আকর্ষণীয়। বেগম আখতারের 'পিয়া ভোল অভিমান', 'জোছনা করেছে আড়ি', 'ফিরায়ে দিওনা মোরে শূন্য হাতে' পিলু রাগে নিবদ্ধ ঠুমরী অঙ্গের গানগুলি রাগপ্রধান বাংলাগানের অমূল্য সম্পদ। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর রাগপ্রধান বাংলা গান প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হতেই কয়েক যুগ লেগে যায়। এ সময়ে অনেক সংগীতগুণী ও শিল্পীগণ রাগপ্রধান বাংলাগানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। শতবর্ষের কাছাকাছি এসে রাগপ্রধান বাংলাগানের অসংখ্য শিল্পী ও শ্রোতা সমাজ তৈরী হয়েছে। রাগপ্রধান গান বর্তমানে বাংলাগানের এক জনপ্রিয় ধারায় পরিণত হয়েছে। রাগপ্রধান বাংলাগান এখন লঘু চালের উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমকক্ষ বলেও অনেকে মনে করেন।[৩৮] "উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পঞ্চগীতি কবির অবদানের মাধ্যমে বাংলাগান যে পরিমাণ সমৃদ্ধ হয়েছিল, সমস্ত বাংলা গানের ইতিহাসে তা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পঞ্চগীতিকবির গানের ধারাবাহিকতায় আধুনিক বাংলাগানের ধারায় বিশ শতকের কালজয়ী কিছু গানের সৃষ্টি হয়েছিল।"[৩৯] উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে রাগপ্রধান বাংলাগানের উদ্ভবের পূর্বে বাংলায় হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের প্রবেশ, ক্রমবিকাশ, বাংলায় রাগসংগীত চর্চার ইতিহাস, বাংলাদেশে বিভিন্ন সংগীতগুণীদের রাগসংগীত চর্চার নিদর্শন এবং বিভিন্ন ধারার বাংলাগানে হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনীর প্রতিফলন সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উনবিংশ শতকে বিভিন্ন সংগীতগুণীর রাগসংগীতে অবদান এবং রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টির নেপথ্যে তাদের অবদানগুলো আলোচনার মাধ্যমে এই অধ্যায়ে রাগপ্রধান বাংলাগানের উদ্ভবের পূর্ববর্তী অবস্থা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো সুক্ষ্মভাবে পর্যালোচনার ফলে রাগপ্রধান গানের প্রাক যুগ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব।

[৩৮]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪)পৃ ১২-১৩[৩৯]ড. অসিত রায়, *সংগীত অন্বেষা*(ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি,২০১৯) পৃ ২২

৩য় অধ্যায় ঃ রাগপ্রধান বাংলাগানের উদ্ভব ও বিকাশ

৩.১ রাগপ্রধান বাংলাগানের সংজ্ঞা

৩.২ রাগপ্রধান বাংলাগানের বৈশিষ্ট্য

৩.৩ রাগপ্রধান বাংলাগানের শিল্পী

৩.৪ কলকাতা ও ঢাকা কেন্দ্রীক রাগপ্রধান বাংলাগান

রাগপ্রধান বাংলাগানের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলাগান হল প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত সাহিত্য রস সম্পন্ন গান যা ভারতীয় রাগ-রাগিনীর সংস্পর্শে এসে এক প্রকার নতুন গীত শৈলীর উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। সম্পূর্ণ অভিনব এই গীত ধারার নাম রাগপ্রধান বাংলাগান। অর্থাৎ যে সকল বাংলাগানে রাগের প্রাধান্য রয়েছে সেগুলো রাগপ্রধান বাংলাগান বলে। এইগীত ধারা শুরুর দিকে শুধু রাগপ্রধান গান নামে পরিচিত ছিল। রাগপ্রধান বাংলাগান ঊনবিংশ শতকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। যা অন্যান্য বাংলাগানের তুলনায় বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল। রাগপ্রধান বাংলাগানের সৃষ্টির পেছনে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ধীরে ধীরে দরবারের প্রসিদ্ধ ধ্রুপদীয়া, খেয়ালিয়াগণ ছোট ছোট রাজ্যের দরবারে আশ্রয় নিতে থাকেন। এভাবে রাগসংগীত বিভিন্ন স্থানে ছড়িতে পড়তে শুরু করে। ইংরেজদের আগমনের পর ধীরে ধীরে এসব রাজ্যও বিলুপ্ত হতে থাকে। এক সময় সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাতে চলে যায়। ইংরেজ শাসনামলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীতজ্ঞগণ বাংলায় আসতে থাকেন। ফলে বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত সংগীত ধারার সাথে রাগ-রাগিনীর সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। বাংলা যে রাগ-রাগিনীর প্রচলন একেবারেই ছিলনা তা নয়। এই অঞ্চলের বিভিন্ন গানে প্রচুর রাগের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। তবে রাগের বৈশিষ্ট্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল। বঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত লোকগান, কীর্তন ও যাত্রাগানে যে সব রাগ-রাগিনীর ব্যবহার ছিল সেগুলোর সাথে ধ্রুপদ খেয়ালে ব্যবহৃত রাগের শাস্ত্রবিধির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রাগপ্রধান গান মূলতঃ আধুনিক বাংলা গানেরই এক বিশেষ রূপ। রাগ-রাগিনীকে প্রাধান্য দিয়েই এই গান রচিত হয়। এক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে। যেমন-

১. রাগপ্রধান গানে বাণীর প্রভাব কতটুকু ?

২. শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে যেমন রাগ গাওয়া হয়? রাগপ্রধান বাংলা গানের ক্ষেত্রেও কি একইভাবে নিয়ম মানা হয় ?

৩. রাগসংগীত ও বাংলাগান এই দুই ধারার মৌলকত্ব অক্ষুন্ন রয়েছে কি ?

এরকম আরো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে রাগপ্রধান বাংলাগানের আঙ্গিকগত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, যা গানের রাগরূপ ও সুরের উপর নির্ভর করছে। রাগপ্রধান গান হল-কোন নির্দিষ্ট একটি রাগকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত কোন গান। আমাদের বাংলাগানগুলি এভাবে একেকটি কাঠামোতে মৌলিক রূপ পেল। "আধুনিকগান অর্থাৎ পুরাতন বাংলাগানের ধারায় যুগরুচির বিবর্তনে নতুন যে শ্রেণির গানের জন্ম হয়েছে এই কালে, সেই গান। এই শ্রেণির গানের সবচেয়ে সার্থক রূপকার হলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত যেন, অতুল প্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম,

দিলীপ কুমার রায় প্রভৃতি।"[১] রাগপ্রধান বাংলাগান এই শিরোনামে উপমহদেশে আর কোথাও কোন রকম গানের প্রকার নেই। সব সময় যে শুদ্ধ ও শাস্ত্রীয় রাগেই রাগপ্রধান বাংলাগান গাইতে হবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। গানের মধ্যে রাগ ভাবটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে কিনা সেটাই মূল বিষয়। আবার রাগপ্রধান বাংলাগান রাগসংগীত থেকে সৃষ্ট হয়েছে বলেই যে রাগসংগীতের ন্যায় তান, সরগম ইত্যাদি গাইতে হবে এমনটিও নয়। এই গান সম্পূর্ণ মৌলিক গীতিরীতির প্রকার যেখানে গায়ক বা শিল্পী তার পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে থাকেন। আলাপ, গাইবার ঢং, অলংকার প্রয়োগের বিষয়ে শিল্পীর নিজস্বতাই মুখ্য। এ বিষয়ে রাজ্যেশ্বর মিত্র রাগপ্রধান গান প্রসঙ্গে বলেছেন,

> বাংলায় রাগপ্রধান পর্যায়ে যে সংগীত গড়ে উঠেছে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে কারণ তা একদিক দিয়ে কাব্য সংগীত, অপরদিকে রাগ সংগীত। কাব্য ও রাগ উভয়ে উভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এমন একটি রূপ পরিগ্রহ করেছে যা একটি বিশিষ্ট শ্রেণির সম্মান দাবী করতে পারে। একদা টপ্পার যুগে এই ধরনের একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু রাগপ্রধান এর গতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ এ যুগের এবং স্বকীয়তার দিকে এক অভিনব শিল্প।[২]

নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন,

> বাংলাগানের বিশিষ্ট একটি শাখা রাগপ্রধান। এই গানের সুরবিস্তারের স্বাধীনতা স্বীকৃত, বস্তুতঃ সুর বিস্তারেই এই গানের ভিত্তি। এই গান আজ থেকে চল্লিশ-পয়ঁতাল্লিশ বছর আগে কাজী নজরুল ইসলাম, তুলসী লাহিড়ী, হিমাংশু দত্ত প্রমুখ সুপরিচিত সুরকার এবং জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেব বর্মন প্রমুখ বিশিষ্ট গায়কদের দৌলতে বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।[৩]

যেকোন রাগাশ্রিত গানই রাগপ্রধান নয়। আধুনিক বাংলাগানে লক্ষ্য করা যায় একাধিক রাগের স্বরমিশ্রণ ঘটেছে। রাগাশ্রিত গান শব্দটির মাঝেই এর অর্থ নিহিত। অর্থাৎ রাগকে আশ্রিত করে যে গান রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক রাগের স্বর ব্যবহার করাও অমূলক নয়। আবার রাগসংগীতের শাস্ত্রীয় নিয়ম কানুনও যথাযথভাবে মানা হয় না। কাজেই রাগাশ্রিত ও রাগপ্রধান দুইটি ভিন্ন অর্থ বহন করে। বলাবাহুল্য বাংলার সংগীত রচয়িতাদের অধিকাংশ রাগাশ্রিত গান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের গানগুলোতে একাধিক রাগের সন্নিবেশ ঘটেছে।

---

[১]নারায়ণ চৌধুরী, শারদীয় কিশোর ভারতী, ১৩৭৫। পৃ ২৩৭ accessed in 20 January, 2021. https://books.google.com.bd/books?id=ToC6DwAAQBAJ&pg=PT255&lpg=PT255&dq

[২]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ২০

[৩]তদেব। পৃ ১৮

৩.১ রাগপ্রধান বাংলাগানের সংজ্ঞা

রাগপ্রধান গান, শুরুর দিকে ধ্রুপদ ভাঙ্গা বা খেয়াল ভাঙ্গা গানগুলোকে বলা হত। অনেকেই এই গানগুলোকে ধ্রুপদাঙ্গীয়-খেয়ালঙ্গীয় বলে থাকেন। কিন্তু মূল বিষয় হল এই সকল গানে রাগ প্রাধান্য পেয়েছে কি না। আবার রাগ প্রাধান্য পেলেও সেখান শাস্ত্রীয় নিয়মকানুনের প্রয়োগ ঘটেছে কি না। রাগপ্রধান বাংলাগানে শুধুমাত্র রাগসংগীতকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও রাগের নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন করা হয় না। যেমন: রাগের বাদী, সমবাদী স্বর, বিবাদী, ন্যাস স্বর, গায়ন সময়, অঙ্গ ইত্যাদি বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট রাগে ধ্রুপদ বা খেয়াল গাওয়ার সময় যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলেও রাগপ্রধান গানে বাদী-সমবাদী স্বরের গুরুত্ব, ন্যাস স্বরে থামা, গায়ন সময়ে গাওয়া, অঙ্গকে প্রাধান্য দিয়ে চলন ইত্যাদি একেবারেই নেই। শুধুমাত্র রাগের মূখ্য অঙ্গগুলোকে প্রকটভাবে প্রদর্শনের ফলে রাগের প্রাধান্য উপস্থাপন করা হয়। পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বলেছেন,

> 'রাগপ্রধান' 'বাংলা খেয়াল' রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, অন্তত রাগপ্রধান নামের উদ্ভাবক সুরেশবাবু বা সে যুগের রাগপ্রধান গায়কদের এই উদ্দেশ্য ছিল না। সুরেশবাবুর বক্তব্য ছিল যে খেয়ালের বন্দিশ আশ্রয় করে অথচ তাঁর দূরহতা বর্জন করে রাগের সরল রূপায়নকে অবলম্বন করে বাংলাগানের বাঙালিয়ানা কে অব্যাহত রেখে রাগতালের সমান অক্ষুন্ন রাখাই রাগপ্রধান গানের লক্ষ্য হোক।[৪]

সংগীত পরিক্রমা গ্রন্থে পাওয়া যায়,

> আধুনিক সংগীতের সকল দিকই অশ্রদ্ধেয় নয়। চতুর্থ দশকের আধুনিক সংগীত আন্দোলন। রাগপ্রধান নামক এক শ্রেণীর বাংলাগানের সূচনা করেছিল, যার সম্ভাবনা বিপুল। রাগপ্রধান বাংলাগান আধুনিক বাংলা গানেরই একটি শাখা, তবে আধুনিক গানের সঙ্গে তার মূল পার্থক্য এখানে যে, আধুনিক বাংলাগানে সুরবিস্তার নেই রাগপ্রধান গানে আছে। বস্তুত: রাগভঙ্গিম সুরবিস্তারই হল রাগপ্রধান বাংলাগানের ভিত্তি, আর সেজন্যই ওই নামকরণ। সুরবিস্তার-যাকে ইংরেজীতে বলা যায় melodic improvisation-রাগসংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সংগীত প্রধানত: সুর নির্ভর হওয়ায় অলংকরণ হিসেবে সুর বিস্তার তার ভিতর একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ধ্রুপদ গানের আলাপ অংগে এবং খেয়াল, ঠুংরী ও টপ্পা গানের খোদ কাঠামোর ভিতর সুর-বিস্তার রূপ অলংকরণটি সবিশেষ লক্ষণীয়। প্রকৃত পক্ষে, সুরবিস্তার ছাড়া খেয়াল ঠুংরীগান ভাবাই যায় না। ভারতীয় ক্লাসিক্যাল গান এক রাগ ভিত্তিকই হোক (খেয়াল) আর মিশ্রণই হোক (ঠুংরী) সুরবিস্তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।[৫]

রাগপ্রধান বাংলাগানকে তাই সাধারণভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, রাগের চলনকে প্রাধান্য দিয়ে যে সকল বাংলাগান

---

[৪]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ১৯

[৫]তদেব। পৃ ২২

রচিত হয়েছে তাকে রাগপ্রধান বাংলাগান বলে। এই ভাবে সংজ্ঞায়িত করলে রাগপ্রধান বাংলাগানে শুধু রাগ ভাবটাই মূল হিসেবে পরিগণিত হয়। কাজেই সংজ্ঞায় রাগের প্রাধান্য ও কাব্যিক দিকের প্রভাব দুটোই আসা প্রয়োজন। তাহলে প্রকৃত সংজ্ঞাটি দাঁড়ায়, যে সকল বাংলাগানে কাব্যের উপরে রাগের চলন তার সুরধারার সাথে মিশে ভাব ও রসের সঞ্চার ঘটিয়েছে তাকে রাগপ্রধান বাংলাগান বলা হয়। অর্থাৎ শুধু রাগকে প্রধান করলেই রাগপ্রধান বাংলাগান হয় না। রাগের চলনকে বাংলা কাব্যগীতিতে খাপে খাপ বসিয়ে সেখানে রাগ ভাব ফুটিয়ে তোলা ও রসাস্বাদিত করার ফলেই রাগপ্রধান বাংলাগান পাওয়া সম্ভব।

ছক ২: রাগপ্রধান বাংলাগান

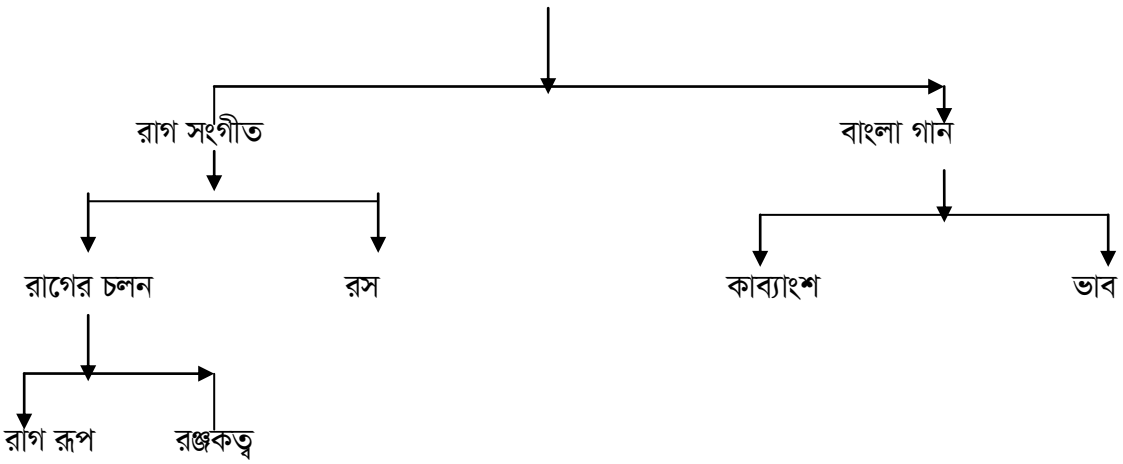

১৯৩৭ সালে Light classical/ Classical form হতে রাগপ্রধান নামকরণ করেছেন সুরেশ চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন তৎকালীন কলকাতা বেতারে ডেপুটি চিফ প্রডিউসার। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত তাঁর অতি উচ্চমানের জ্ঞান ছিল। তাঁর সম্পর্কে পন্ডিত জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ বলেছেন-

> সুরেশ বাবু রেডিওতে রাগ সম্বন্ধে বলতেন, আমরা মন দিয়ে তা শুনতাম। ..... উনি রেডিওতে রাগের সংগঠন, রাগের মধ্যে মিল এবং ভেদ, রাগের সংগঠনের মধ্যে গাওয়ার রীতিনীতি এবং কোনও ধাটের অন্তর্গত সমপ্রকৃতির রাগের বিশ্লেষণ করতেন। তাছাড়া শাস্ত্রবর্ণিত সাংগীতিক সংজ্ঞার ব্যাখ্যা ইত্যাদি, কোনটাতে কি বর্জিত এবং প্রাচীন রাগ যেগুলি জানতেন, আধুনিক বা অর্বাচীন রাগগুলির সংগে তাদের কি সম্বন্ধ-কোথা থেকে কি এসেছে, নানা রকম কথা উনি আলোচনা করতেন। যেগুলি শাস্ত্রীয়, সংযুক্ত পুরানো গ্রন্থ থেকেও উনি উদ্ধৃত করতেন। তাছাড়া এ সম্ভন্ধে ওঁর নিজের বিবেচনার বিষয়েও আলোচনা করতেন। সেগুলি আমরা জানবার জন্য শিখতাম।[৬]

[৬]জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, তহজীব-এ মৌসিকী (কলকাতা: বাউলমন, ২০১৬) পৃ ৯৩-৯৪

৩.২ রাগপ্রধান বাংলাগানের বৈশিষ্ট্য

বাংলাগান মার্গ সংগীতের মত বিপুল সংগীতের আদর্শে রচিত না হলেও এই গান বাঙালি জাতির নিজস্ব সম্পদ। মার্গ সংগীত থেকেই বাংলাগানের উৎপত্তি। তবে রাগপ্রধান বাংলাগান কথাটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। রাগপ্রধান বাংলাগান যে আঙ্গিকেই গাওয়া হোক না কেন বাংলা ভাষায় যখন তা গীত হবে শ্রোতার হৃদয়ে এক প্রকার অনুভূতির সঞ্চার হবে। কেননা শুধুমাত্র রাগপ্রধান বাংলাগান দিয়ে যে অনুভূতির সৃষ্টি করা প্রয়োজন তা অন্যকোন বাংলাগানে সম্ভব নয়। কারণ রাগপ্রধান বাংলাগানে শিল্পীর স্বাধীনতা রয়েছে যা অন্য কোন গানে নেই। রাগ ভাবই হল রাগপ্রধান বাংলাগানের মূল বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখে শিল্পী নিজস্ব গায়কীতে গাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। যার ফলে গায়কের যে গুণাগুণ, গায়ন শৈলী বা ঢং তা রাগপ্রধান গানের সৌন্দর্য্যকে আরো বৃদ্ধি করে। বাংলাগানের ধারায় যত ধরনের বাংলাগান আমরা দেখতে পাই তার সবই কোন না কোন ভাবে রাগসংগীতের সাথে সম্পৃক্ত। একারণেই দেশী বাংলাগানগুলো কখনও সম্পূর্ণ রূপে বা কখনও আংশিক রূপে রাগপ্রধান গানে ঠাঁই করে নিয়েছে। সার্বিক দিক পর্যালোচনার মাধ্যমে রাগপ্রধান বাংলাগানের কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হল-

১। রাগপ্রধান বাংলাগানে রাগের চলনের প্রাধান্যই মূল বিষয়।

২। রাগপ্রধান বাংলাগানে রাগের আরোহ-অবরোহ ক্রমানুসারে মানা হয় না।

৩। এই গানে রাগের পাশাপাশি গানের কথার সামঞ্জস্য হওয়াটা বাঞ্ছনীয়।

৪। এই গানে অলংকারের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৬। ধ্রুপদের অনুকরণের রচিত রাগপ্রধান গানগুলোতে ধ্রুপদের নিয়মকানুন মানা হয় না। এমনকি গুরুগম্ভীর ভাববিচ্যুত হয়।

৭। খেয়াল গানের সাথে রাগপ্রধান বাংলাগানের বিশেষ মিল পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ আলাপ, বিস্তার এবং তান সরগম ইত্যাদি বিষয়গুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৮। রাগপ্রধান বাংলাগানে রাগের নির্দিষ্ট সময় মানা হয় না।

৯। এই গানে শাস্ত্রীয় ৯টি রসের প্রয়োগ খুবভালোভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

১০। এই গানে রাগের মূখ্য অঙ্গগুলো প্রকটভাবে প্রয়োগ করা হয়।

১১। এই গানে রাগের শুদ্ধতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। তবে ক্ষেত্র ভিন্ন স্বর প্রয়োগ করে গানের সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়।

১২। অধিকাংশ রাগপ্রধান বাংলাগানে খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা ও গজল শ্রেণির গানের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

১৩। এই গানে রাগ ভাবই মুখ্য।

১৪। এই গানে সুর বিস্তারের স্বাধীনতা রয়েছে।

১৫। ভাষা ও শব্দ চয়নে পর্যাপ্ত আধুনিকতা লক্ষ্য করা যায়।

১৬। বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র যেমন- হারেমানিয়াম, তবলা, বাঁশি, সেতার, সারেঙ্গী, তানপুরা ইত্যাদির সাথে সংগত করা হয়। বর্তমানে কীবোর্ড, গীটার, প্যাড ইত্যাদি ইলেকট্রনিক পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রও বাজানো হয়।

১৭। দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল, আদ্ধা ইত্যাদি তালে গীত হয়।

বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার গোপাল দাস গুপ্ত রাগপ্রধান গান সম্পর্কে বলেছেন,

> রাগপ্রধান গান গাইতে গেলে যে বিশুদ্ধ রাগেই তা গাইতে হবে তার কোন অর্থ নেই। গানের মধ্যে রাগভাবটাই হবে আসল। হয়তো গান শুনে কোন বিশেষ রাগের চরিত্র তার মধ্যে ধরা না গেলেও গানটিতে যে একটা রাগভাব প্রবল, পরিবেশন ভঙ্গির জন্য যেটাই বেশি মনে হবে। অর্থাৎ রাগভাবটাই হবে রাগপ্রধান গানের বৈশিষ্ট্য।[৭]

কীর্তন, টপ্পা ইত্যাদি আঙ্গিক বাংলা বাণীবদ্ধ গানগুলীতে সম্পূর্ণ রাগ অবয়বে সুরারোপিত করে রচিত হল রাগপ্রধান বাংলাগান। বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুস্থানী রাগ পদ্ধতির রাগ, তাল ও গাইবার ধরন এবং বাংলাদেশে প্রচলিত বৈঠকী গানের অবলম্বনে প্রাচীন গীতিরীতির পরিবর্তে আধুনিক পরিশীলিত গায়ন পদ্ধতিতে রাগপ্রধান গাওয়া হয়। কথার চন্দ্রমল্লিকা দিয়ে ছন্দের সুতোয় সুরের মালা গাঁথা, হিন্দুস্থানী বোল বনানার ভঙ্গীতে গানের কিছু কিছু কথা নিয়ে সুরের রসে রসিয়ে তোলা রাগপ্রধান বাংলাগানের বৈশিষ্ট্য। গান গাইতে গিয়ে কাব্য যেন কোথাও বিঘ্নিত না হয়। কথা নিয়ে বিন্যাস করতে গিয়ে এমনভাবে কথাকে ভাঙা যেন না হয়, যাতে কথার অর্থই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

---

[৭]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ২৩

৩.২ রাগপ্রধান বাংলাগানের শিল্পী

রাগপ্রধান বাংলাগানের সুর রচনাতে বা গাইবার ভঙ্গি লঘু, উচ্চাঙ্গ, লঘু-উচ্চাঙ্গ বা Light classical, classical ইত্যাদি কোন কথারই প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। রাগপ্রধান শুধু রাগপ্রধান হিসেবেই পরিচিত হোক বা পরিচিত হবে- যেমন হয়েছে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা। কোন সমার্থক শব্দ দিয়ে রাগ প্রধান বোঝানো সম্ভব নয় বা উচিত নয় যেমন আগেকার রেকর্ডগুলিতে semi-classical, Light classical ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে লেখা হয়েছে। রাগপ্রধান গান নিয়ে অনেকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা শুনলে বা পড়লে যতখানি ধারণা লাভ করা যায়, তার চেয়েও বেশী জানা যায় রাগপ্রধান বাংলাগানগুলো শুনলে। সে সময়ের প্রত্যেক বিদগ্ধজনের গাওয়া রাগপ্রধান গান প্রত্যেকের চেয়ে আলাদা। রাগপ্রধান বাংলাগানের পথপ্রদর্শক হিসেবে সবার প্রথমে যার নাম আসে তিনি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী(১৯০২-১৯৪৫)। তাঁর কণ্ঠে রাগপ্রধান বাংলাগানগুলোকে বাংলা খেয়ালও বলা যায়, কারণ তাঁর গায়কীতে খেয়াল গানের রূপ প্রকাশিত হয়েছে বেশি। শ্রী অমলেন্দু বিকাশ কর চৌধুরী বলেছেন,

> জ্ঞান গোঁসাইকে মেগাফোন কোম্পানীর JNG 5114 রেকর্ডে পাই Prof. Jnanendra Pro Goswami রূপে। এই রেকর্ড খানাতে তিনি দুটি বাংলা গান গেয়েছেন পুরোপুরি খেয়াল অঙ্গে। গমক, সাপাট, ছুটতান, তান বোল তান সব কিছুই এই গান দুখানাতে প্রয়োগ করেছেন। একটি গান ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দ দুলাল। গানটি তুলসী লাহিড়ীর লেখা। সুরকারের নাম নেই। লেখা আছে Bengali Bhajan- ভজন, নট মল্লার। দ্বিতীয় গান খানাও Bengali Bhajan- ভজন ভৈঁরো বলে লেখা আছে। গানটির কথা চির সুন্দর নওল কিশোর। গীতিকার তুলসী লাহিড়ী। সুরকারের নাম লেখা নেই। বড়মুখের ভারী আওয়াজওয়ালা তবলা ও হারমোনিয়ামের সঙ্গে পুরোপুরি খানদানি বৈঠক মেজাজের আসরের এই গানটিকে আমরা বাংলা খেয়ালও বলতে পারি। কারণ, এখানে রাগের বাঁধা ধরা এবং খেয়ালের কয়েকটি আবশ্যিক শর্ত মেনেই গানটি তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োগ নৈপূন্যে এক অনুপম কুশলতায় প্রকাশ করেছেন।[৮]

জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর অন্যান্য গানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে,

১. ও গো যাহা কিছু মম- টপ্পার ভঙ্গিতে সিন্ধু কাফী রাগে যৎ তালে নিবদ্ধ গান। গানের কথা ও সুর- কাজী নজরুল ইসলাম। গানটি ১৯৩৪ সালে রেকর্ড করা হয়েছিল। ২. মম মধুর মিনতি শোন ঘন শ্যাম বাংলা খেয়ালের ঢং এ, জৌনপুরী রাগে ত্রিতালে নিবদ্ধ গান। রেকর্ড কাল ১৯৩৯। ৩. আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায় রাগপ্রধান গান,

---

[৮]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ২৫

রাগ দরবারী, তাল ত্রিতাল। কথা ও সুর-তুলসী লাহিড়ী। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর অধিকাংশ গানের গীতিকার ও সুরকার কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁরা দু'জনে ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। গানগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি গানের আলাদা নামকরণ করা হলেও গানগুলোতে রাগ ভাব স্পষ্ট এবং গায়কীতে হিন্দুস্থানী নিয়মের গাঢ়তা। একারণে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গানগুলো বাংলা খেয়াল ও টপ্পা আঙ্গিকে মনে হতে পারে। "জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী বাংলা রাগসংগীতের দিক পাল। যত বাংলাগান তিনি গেয়েছেন সবই খানদানি বৈঠকী মেজাজের রাগ ভিত্তিক গান। বাংলাগানের কাব্য মাধুর্য্য ও রাগ সংগীতের সুর মাধুর্য্য ক্ষুন্ন করে কোন ক্ষেত্রেই গানের চেয়ে গায়ক কতখানি জানেন সেই কৌশলগত দিক বেশি করে দেখানোর চেষ্টা করেন নি।"[৯]

> বর্তমানকালের রাগাশ্রিত বা রাগ প্রধান গানের সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর গানের একটি পার্থক্য দেখা যায়। জ্ঞান গোঁসাইয়ের গানে সুর এবং তালের যে শক্ত বাঁধুনী ছিল তা বর্তমান কালের রাগ প্রধান বা রাগাশ্রয়ী বাংলা গানে কিছুটা অনুপস্থিত। সম্ভবত যুগের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যেই এই রূপ পরিবর্তন। বর্তমান কালের গান অনেক বেশি বিস্তার নির্ভর। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর গানের গায়কী ও বাঁধুনী এতটাই দৃঢ়, সমৃদ্ধ এবং আকর্ষণীয় ছিল যে শ্রোতাদের একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে হতো।[১০]

রাগপ্রধান বাংলাগানের জগতে আরও একজন সংগীত শিল্পী আছেন যিনি এই গানের ধারাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। তিনি হলেন তারাপদ চক্রবর্তী (১৯০৫-১৯৭৫)। তিনি ছিলেন কলকাতার আকাশবাণীতে নবীন তবলা বাদক। একবার জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী আকাশবাণীর সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারলে সেই সুযোগ চলে যায় উদীয়মান তবলা বাদক তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে। এভাবেই তিনি হয়ে উঠলেন রাগপ্রধান বাংলাগানের নতুন দিক পাল। বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চলে তারাপদ চক্রবর্তীর বসতভিটা ছিল। নামীদামি কোন ওস্তাদের কাছে তালিমও পান নি শুরুতে। কিন্তু আকাশবাণীতে সেদিন আচমকা গানের সুযোগ পেয়ে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন শতভাগ। "তারাপদ চক্রবর্তী মূলতঃ হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী ছিলেন। তাঁর সংগীত শিক্ষার মধ্যে প্রথাগত ব্যাপারের চেয়েও তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিশীলতাই বেশী কাজ করেছে। তিনি নিজের রচিত অনেকগুলি বাংলা গান আমাদের হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের ঢং এ উপহার দিয়েছেন। তার মধ্যে রাগ প্রধানের চরিত্রের চেয়েও খেয়াল ও ঠুংরীর রীতি পদ্ধতি বেশী প্রকাশিত হয়েছে।"[১১] আকাশবাণীতে প্রচারিত অনুষ্ঠান অনুযায়ী তারাপদ চক্রবর্তীর গায়কী

---

[৯]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ৩২

[১০]অসিত রায়, সংগীত অন্বেষা (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি,২০১৯) পৃ- ১২৯

[১১]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, প্রাগুক্ত। পৃ ৪০-৪১।

অনেকটাই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর অনুকরণে ছিল বলে জানা যায়। তিনি নিজেই গান রচনা ও সুরারোপ করে গাইতেন। তাঁর রচিত গানগুলোর মধ্যে রয়েছে- মিশ্র তিলং রাগে 'খোল খোল মন্দির দ্বার', গুর্জরী টোড়ি রাগে 'ফুলে ফুলে কি কথা', বাহার রাগে 'বনে বনে পাপিয়া বোলে' প্রভৃতি। "উল্লেখ্য, তারাপদ চক্রবর্তী রাগ সংগীত গাইতেন বলে, তাঁর গাওয়া সব গানই বাংলা খেয়ালের মত ছিল। অজস্র বাংলাগান রচনার পাশাপাশি তারাপদ সৃষ্টি করেছেন নতুন রাগ ছায়াহিন্দোল।"[১২] তারাপদ চক্রবর্তীর বাংলা গানের তুলনায় হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল। তবে তাঁর গায়কীতে কখনও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, আবার কখনও আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের ছায়াপত ঘটেছে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর খুব পছন্দের মানুষ ছিলেন তারাপদ চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী, আমীর খাঁ প্রমুখের সমসাময়িক। রাগপ্রধান বাংলাগানের সত্যিকার দিশারী বলতে গেলে এরপরই আসে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের(১৯০৯-১৯৭৭) নাম। ভীষ্মদেবের কণ্ঠে রাগপ্রধান বাংলাগান এক নতুন মাত্রা লাভ করে যা জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বা তারাপদ বাবু দিতে পারেন নি। শিল্পী ভীষ্মদেবের কণ্ঠ স্বর ছিল অত্যন্ত সুমিষ্ট। তিনি খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরী গানে সমপারদর্শী ছিলেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় কলকাতার প্রথম বাঙালি সংগীতজ্ঞ যাকে সকলে 'ওস্তাদ' ডাকতেন। হিন্দুস্থানী রাগসংগীতে ক্ষুরধার প্রতিভা সম্পন্ন ভীষ্মদেব রাগপ্রধান বাংলাগানের জগতে অনন্য এক নাম। হিন্দুস্থানী রাগসংগীতে তিনি ছিলেন রীতিমতো এক বিস্ময়। তাঁর সমৃদ্ধ গায়কি এমনই ছিল যে তিনি কখন কি ধরনের অলংকার প্রয়োগ করবেন বা কি স্বর লাগাবেন তা আগে থেকে আঁচ করা সম্ভব হত না। কিন্তু রাগপ্রধান গানে তিনি হিন্দুস্থানী ভাব গাম্ভীর্যময়তাকে প্রশ্রয় দেন নি। এই এক আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ভীষ্মদেব। যিনি উথাল পাতাল খেয়াল ঠুমরী গাইতেন, তাঁর বাংলাগানে খেয়াল ঠুমরীর ছোঁয়াও পাওয়া যেত না। মূলত ভীষ্মদেবের রাগপ্রধান গায়কীই পরবর্তী প্রজন্মের রাগপ্রধান গানের শিল্পীদের অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিল। রাগপ্রধানের স্বতন্ত্রতা একমাত্র ভীষ্মদেবই তাঁর গায়কী দিয়ে স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়েছিলেন।

ভীষ্মদেবের উল্লেখযোগ্য রাগপ্রধান গানগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১। যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা, আমারে ভুলিও প্রিয়- রাগঃ কাফি-ভৈরবী

২। নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো- রাগঃ ভৈরবী

৩। শেষের গানটি ছিল তোমারি লাগি- গজল

---

[১২]অসময়ে মুটেগিরিও করেছেন,আনন্দ বাজার, ২৭ মে, ২০১৭
https://www.anandabazar.com/supplementary/patrika/some-unknown-stories-about-classical-singer-tarapada-chakraborty-1.618860, accessed at 4 January, 2021.

৪। ফুলেরি দিন হল যে অবসান, রাগঃ জয়জয়ন্তী

৫। সখি লোকেরি কথায় এত কি চাতুরি- রাগপ্রধান।

ভীষ্মদেবের বাংলাগানে হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের প্রভাব কম। হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের রাগরূপের সঙ্গে আমরা যে ভাবে পরিচিত ভীষ্মদেবের গানে তা নেই। 'ফুলেরই দিন হলো যে অবসান' ও 'শেষের দিনটি ছিল তোমারি' লাগি এই গানদুটি রচনা করেছেন অজয় ভট্টাচার্য। 'ফুলেরই দিন হলো যে অবসান' গানে ভীষ্মদেব খেয়ালের অবয়বে পুরোপুরি রাগপ্রধান বাংলাগান গেয়েছেন।

> ভীষ্মদেবের গানের সার্থকতাই এখানে। শাস্ত্রীয় সংগীতে পারদর্শী হয়েও বাংলা গানে তিনি তা প্রয়োগ করেন নি। যা জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী ও তারাপদ চক্রবর্তীর কাছ থেকে মেলে নি। ভীষ্মদেবের রাগপ্রধান বাংলাগান সম্পর্কে কল্পনা প্রসূত চিন্তা ধারাই তার গায়কী বদলে দিয়েছিল। আর উৎকৃষ্ট আরেকটি উদাহরণ হল অজয় ভট্টাচার্যের লেখা আরেকটি গজল অংগের রাগপ্রধান শেষের দিনটি ছিল তোমারি লাগি। পুরো গানে রাগ ভাব বজায় রেখে, অথচ হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের অবশ্য করণীয়গুলি পালন না করে, বাংলা রাগপ্রধান গান হিসেবে এই গানটিকে তার অজ্ঞাতেই আমাদের আজকের রাগপ্রধান গানের উৎস ধারায় টেনে নিয়ে গেছেন।[১৩]

তৎকালীন প্রখ্যাত সুরকার-গীতিকার কাজী নজরুল ইসলামের স্নেহধন্য ছিলেন ভীষ্মদেব। 'ফুলেরই দিন হল যে অবসান' ও 'শেষের গানটি ছিল তোমারি লাগি' গানদুটো রেকর্ডের সময় কাজী নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন এবং সুরকার হিসেবে ভীষ্মদেবের দক্ষতা দেখে প্রশংসা করেছিলেন।

> ভীষ্মদেব সম্পর্কে পন্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বলেছেন, "ভীষ্ম বাবুর গানের evolution এর মধ্যে অনেক স্তর দেখা যায়। বেশি না বলে এইটুকু বলা চলতে পারে যে, প্রথম যুগের স্তরের মধ্যে যেটা বেশি লক্ষ্য করা যায় সেটা হচ্ছে চঞ্চলতা, চমক লাগানোর চেষ্টা ইত্যাদির মধ্যে আত্মপ্রসাদ খোঁজা কিন্তু শেষের দিকে অর্থাৎ ফৈয়াজ খাঁ, নাসিরুদ্দিন খাঁ প্রভৃতি সাধকগুণীদের সংস্পর্শে বা সান্নিধ্যে এসে দেখা গেল ভীষ্মবাবুর গানের মধ্যে একটা উচ্চ স্তরের নান্দনিক সৌন্দর্য যেন প্রকাশ পাচ্ছে।[১৪]

রাগপ্রধান বাংলাগানের জগতে খুব অল্প সময় বিচরণ করেছিলেন সুধীরলাল চক্রবর্তী (১৯২০-১৯৫২)। রাগপ্রধান বাংলাগানে সুধীরলাল চক্রবর্তীর অবদান অসামান্য। বাংলাদেশের ফরিদপুরের কৃতি এই সন্তানের গায়কী ছিল তৎকালীন সময়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়। তিনি হিন্দুস্থানী রাগসংগীতে বিশেষ পারদর্শি ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের প্রকৃতি

---

[১৩]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ৩৭

[১৪]জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, *তহজীব এ মৌসিকী*(কলকাতা: বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯৫) পৃ ১৮৬

ছিল টেনর (Tenor)। সূক্ষ্ম অলংকারগুলো খুব সহজেই প্রকাশ পেত তাঁর কণ্ঠে। ক্ষিপ্রগতির ছুট তানে তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর গানে খেয়াল ঠুমরী কাওয়ালি অঙ্গের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বাংলাগানের কাব্যিক অংশটুকুকে তিনি লোপ পেতে দেন নি। তাঁর রচিত বাংলা আধুনিক গান সম্পর্কে শ্রী আমলেন্দু বিকাশ কর চৌধুরী বলেছেন,

> লঘু কথায় লঘু সুর এবং চটুল সুর প্রয়োগে সুধীরলালের যেমন বৈশিষ্ট্য ছিল, ভক্তির সাশ্রিত কথায় কিংবা কাব্য সম্পদে সমৃদ্ধ গীতি কবিতায় ভাব গম্ভীর সুর প্রয়োগেও তিনি কম নিপুণ ছিলেন না। যারা সুধীর লালের 'মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে' কিংবা 'ছাইল অম্বর ঘন মেঘে' অথবা 'ও তোর জীবন বীণা আপনি বাজে' গানখানির ভাব-ভাষার সংগে সুর-সংযোজনার যেন কোন তুলনা হয় না। আমাদের রাগ সংগীতকে 'গুলে খেলে' তবেই এমন সুর রচনা সম্ভব।[১৫]

রাগপ্রধান বাংলাগানের ধারায় এরপরেই উল্লেখ করা প্রয়োজন চিন্ময় লাহিড়ীর(১৯২০-১৯৮৪) নাম। তিনি হিন্দুস্থানী রাগসংগীত গাইতেন। খেয়াল-ঠুমরীর পাশাপাশি লঘুচালের শাস্ত্রীয় সংগীত, গজল ইত্যাদিও গাইতেন। পন্ডিত চিন্ময় লাহিড়ী সৃষ্টি করেছিলেন এক অনন্য গায়কী, যা অন্যান্য শিল্পীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বলা বাহুল্য, উনি প্রায় সমস্ত রাগেরই বন্দিশ রচনা করে গিয়েছেন(বিলম্বিত/তিনতাল/ঝাঁপতাল/রূপক/দ্রুতএকতাল/ন'মাত্রার তাল ইত্যাদি)আর সেইগুলি উনি নোটেশন আকারে নিজের হাতে লিখে রেখে গিয়েছেন। খেয়ালের বাণীর উপর তিনি বিশেষ প্রাধান্য দিতেন, যাতে সেটা অর্থবহ হয়।[১৬] চিন্ময় লাহিড়ী 'রাগপ্রধান বাংলাগান' শিরোনামেই গান রেকর্ড করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রাগপ্রধান গানের মধ্যে রয়েছে- ১. রজনী ফুরালো যে পথ পানে চাহিয়া ২. রাধা নামে শুধু বাঁশরী বাজে। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে পণ্ডিত চিন্ময় লাহিড়ী অজস্র রাগ-রাগিনী সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হল শ্যামকোষ, যোগমায়া, প্রভাতী, টোড়ি, সন্ত ভৈরো, কুসুমী কল্যাণ, শুভ্রা, মঙ্গলতী, নাগরঞ্জনী, গান্ধারিকা ইত্যাদি। চিন্ময় লাহিড়ীর গানের বৈশিষ্ট্যগুলো হল- আধুনিক গানের অনুকরণ, ছোট ছোট হরকত, তান-সরগমের ব্যবহার এবং গায়কীতে হিন্দুস্থানী রাগের প্রথাবদ্ধ নিয়ম বর্জিত, যা তাকে অন্যান্য রাগপ্রধান গানের শিল্পীদের চেয়ে আলাদা করেছে। রাগপ্রধান গানের সাম্রাজ্যের আরেকটি নক্ষত্র হল অখিলবন্ধু ঘোষ (১৯২০-১৯৮৮) আধুনিক বাংলা গানে যেমন তাঁর দখল ছিল, তেমনি রাগপ্রধান বাংলাগানেও তিনি ছিলেন

---

[১৫]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ৮৯-৯০

[১৬]https://www.anandabazar.com/supplementary/rabibashoriyo/the-legacy-of-acharya-chinmoy-lahiri-1.1187396 accessed in 17 January, 2021.

স্বতন্ত্র্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য রাগপ্রধান বাংলা গান গুলোর মধ্যে রয়েছে- ১. আজি চাঁদিনি রাতি গো- (কেদার) ২. আমার সহেলী ঘুমায় (মারুবেহাগ) ৩. বরষার মেঘ ভেসে যায় (সুরদাসী মল্লার) ৪. জাগো জাগো প্রিয় (ভাটিয়ার)। রাগ রাগিনীর প্রকাশ যে কতখানি ভাবের পথে হতে পারে, অখিলবন্ধুর গাওয়া রাগপ্রধান গান তার অনন্য দৃষ্টান্ত। অখিলবন্ধু ঘোষের শাস্ত্রীয় সংগীতে দক্ষতা থাকলেও তিনি আধুনিক বাংলাগানের প্রতি বেশী আসক্ত ছিলেন। রাগপ্রধান বাংলাগানে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা যখন বিরাজমান তখনকার সংগীতগুণীদের মধ্যে পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ (১৯১৩-১৯৯৭) অন্যতম। তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতে এবং যন্ত্র সংগীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রাগপ্রধান গান সৃষ্টির নেপথ্যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের উল্লেখযোগ্য রাগপ্রধান গানগুলোর মধ্যে রয়েছে- ১. গহন ঘন তমাল বনে- শিল্পী সুনীল বোস ২. রাতের শেষে ভোরের আলো- শিল্পী নিত্য গোপাল বর্মন ৩. কোয়েলিয়া গান থামা এবার- শিল্পী বাণী কোনার ও বেগম আখতার ৪. পিয়া ভোল অভিমান- শিল্পী বেগম আখতার ৫. ফিরিয়ে দিও না মোরে- শিল্পী বেগম আখতার ৬. আজি বসন্তে মঞ্জুল রায়- শিল্পী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রভৃতি। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ একাধারে একজন শিল্পী ও সুরস্রষ্টা। তাঁর সংগীতায়োজনে গান করেছেন অসংখ্য শিল্পী। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের রচনায় অসংখ্য রাগপ্রধান বাংলাগান বিংশ শতককে মহিমান্বিত করেছিল। আধুনিক যুগে রাগপ্রধান বাংলাগানের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলো হচ্ছে ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বেগম আখতার, সন্ধ্যা মুখার্জী, মানবেন্দ্র মুখার্জী, নির্মলা মিশ্র, হৈমন্তী শুক্লা, শিপ্রা বসু, অরুণ ভাদুরী, অজয় চক্রবর্তী, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, আঙ্গুর বালা, কানন বালা প্রমুখ, এটি কানন প্রমুখ।

৪. কলকাতা ও ঢাকা কেন্দ্রীক রাগপ্রধান বাংলা গান

'রাগপ্রধান' শিরোনামে কলকাতা বেতারেই সর্বপ্রথম বাংলাগান প্রচারিত হয়। অনুষ্ঠানটির মধ্যদিয়ে বাংলাগানের এক নতুন ধারার যাত্রা শুরু হয়। এমন নয় যে, এর আগে রাগপ্রধান গান সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু রাগপ্রধান নামে সর্বপ্রথম কোন গান প্রচারের কৃতিত্ব একমাত্র কলকাতা বেতারের। বাংলাগান এবং কলকাতা বেতারের ইতিহাসে ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের সন্ধ্যাটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ, কলকাতা বেতার বাংলা গানের শ্রোতাদের জন্য ঊনবিংশ শতকের সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় গীতধারাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ায় রাগপ্রধান গানের অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতা বেতার জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থান লাভ করে। কলকাতা বেতারের জন্ম ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে।[১৭] তখন ভারতে গ্রামোফোন কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা। পাশাপাশি বৈঠকী সংগীতের জমজমাট আয়োজনেরও কমতি ছিল না। কলকাতার অভিজাত ঘরে রেডিও থাকলেও তা সৌন্দর্য্য বর্ধনের কাজেই বেশী আসত। কারণ মানুষ অতটা প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে ওঠেনি তখনো। তারপরও বৈঠকী আসরে, কিংবা মঞ্চের সামনে দর্শক সারিতে বসে দলবদ্ধভাবে গান শোনা, নাটক দেখার মত আনন্দময় বিষয় রেডিও কিংবা গ্রামোফোন কোনটিই দিতে পারেনি। তাই রাগ প্রধান গান আবির্ভাবের পূর্বে কলকাতা বেতার খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি। 'রাগপ্রধান' এই শিরোনামে গান প্রচারিত হওয়ার পূর্বে বাংলা উচ্চাঙ্গ সংগীত যেমন- ঠুমরী, টপ্পা, খেয়াল, রাগাশ্রয়ী বৈঠকী গান ইত্যাদি প্রচারিত হয়েছে কলকাতা বেতারে।

সে সময়ের কয়েকটি অনুষ্ঠান সূচি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় -

১২ ই নভেম্বর, ১৯২৯ :

উর্দু ঠুংরী, শিল্পী: গিরিজা শংকর চক্রবর্তী

১৭ নভেম্বর, ১৯২৯ :

রাগাশ্রয়ী গান, শিল্পী: তারাপদ চক্রবর্তী

১৬ ই মার্চ, ১৯৩০ : বাংলা গান (ঠুংরী)

রাগ: সিন্ধু, তাল: ত্রিতাল, শিল্পী: রমারাণী দত্ত

বাংলাগান, রাগ: কাফী-টোড়ী, তাল: দাদরা, শিল্পী: সাবিত্রী বসু

---

[১৭]https://www.caluniv.ac.in/globalmdiajournal/ARTICLEDEC2013/Article_14_Manas_Pratim_Das.pdf, accessed in 04 January, 2020.

১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ : বাংলাগান (ঠুংরী)

রাগ: বারোয়া, তাল: দাদরা, শিল্পী: রমারাণী দত্ত

১৬ ই মার্চ, ১৯৩৩ : বাংলাগান (টপ্পা)

রাগ: বাগেশ্রী, তাল: আধধা কাওয়ালী, শিল্পী : বিজয় লাল মুখার্জী[১৮]

> রাগপ্রধান বাংলাগান প্রচারের পূর্বে কলকাতায় বাংলাগানের চাহিদা ছিল অনেক বেশী। তৎকালীন স্টেশন ডিরেক্টর JR. Stepleton এর ডায়েরী হতে জানা যায় যে আধুনিক বাংলা গানের ক্রমবর্ধমান দাবী পূরণের জন্য ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ ই অক্টোবর হতে বাংলাগান পরিবেশনের সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাগানের জনপ্রিয়তা বাড়ায় আধুনিক কর্মী বাংলাগানের চাহিদা মেটানোর জন্য, শ্রোতাদের মনোরঞ্জণের জন্য এবং সংগীত শিক্ষাদানের জন্য নিয়মিত আসর আয়োজিত হত।[১৯]

শ্রী অমলেন্দু বিকাশ কর চৌধুরীর স্মৃতি কথায় জানা যায় যে, আজকের বহুল প্রচারিত রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার তখন ঠিক মত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি তখন আধুনিক বাংলাগান হিসেবে প্রচারিত ছিল। বেতার কর্তৃপক্ষ তখন ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টায় কলকাতা বেতার থেকে রবীন্দ্র সংগীতের আসর নামে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করে। কাজী নজরুল ইসলাম কিভাবে রাগপ্রধান বাংলাগান প্রচারের মাধ্যমে বাংলাগানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। নবরাগ মালিকা নাম দিয়ে তিনি বেশ কিছু বাংলাগান রচনা করে বেতারে প্রচার করেন। যেমন- রুমঝুম রুমঝুম কে বাজায় জল ঝুমঝুমি গানটি নির্ঝরিণী রাগে(নজরুল সৃষ্ট রাগ) সুরারোপিত। ঐতিহাসিক মতে, কাজী নজরুল ইসলামই আজকের রাগপ্রধান বাংলাগানের প্রতিষ্ঠাতা। তবে ঐ সময়ের সাংগীতিক হাওয়া যে রাগপ্রধান গানের পালেই বেশী লেগেছিল তা নিয়ে মতভেদ নেই। কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতা বেতারে চাকুরী করার সুবাদে নিজের ভেতরের সকল প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন।[২০] কলকাতা বেতারে প্রচারিত রাগপ্রধান বাংলাগানের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা হল।

১। শিল্পী : কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়- ভোরের পাপিয়া ডাকে পিউ পিউ বোলে
রাগ: ললিত
অঙ্গ: খেয়াল

২। শিল্পী : তারাপদ চক্রবর্তী- বনে বনে পাপিয়া বোলে
রাগ: বাহার
অঙ্গ: খেয়াল

---

[১৮]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ২১
[১৯]তদেব। পৃ ৬৭
[২০]তদেব

৩। শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী- একি তন্দ্রাবিজরিত আঁখিপাত

রাগ: মালকোষ

অঙ্গ: দাদরা

৪। শিল্পী : বেগম আখতার- কোয়েলিয়া গান থামা এবার

রাগ: পিলু

অঙ্গ: দাদরা

৫। শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ- আমার শ্যামা মা এর কোলে চড়ে

অঙ্গ: টপ্পা

৬। শিল্পী : ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়- ফুলেরি দিন হলো যে অবসান

রাগ: জয়জয়ন্তী

৭। শিল্পী : শচীনদের বর্মন - মম মন্দিরে কে এলে

রাগ: আড়ানা।

চিত্র - কলকাতা বেতারে প্রচারিত রাগপ্রধান বাংলাগানের অনুষ্ঠান সূচি

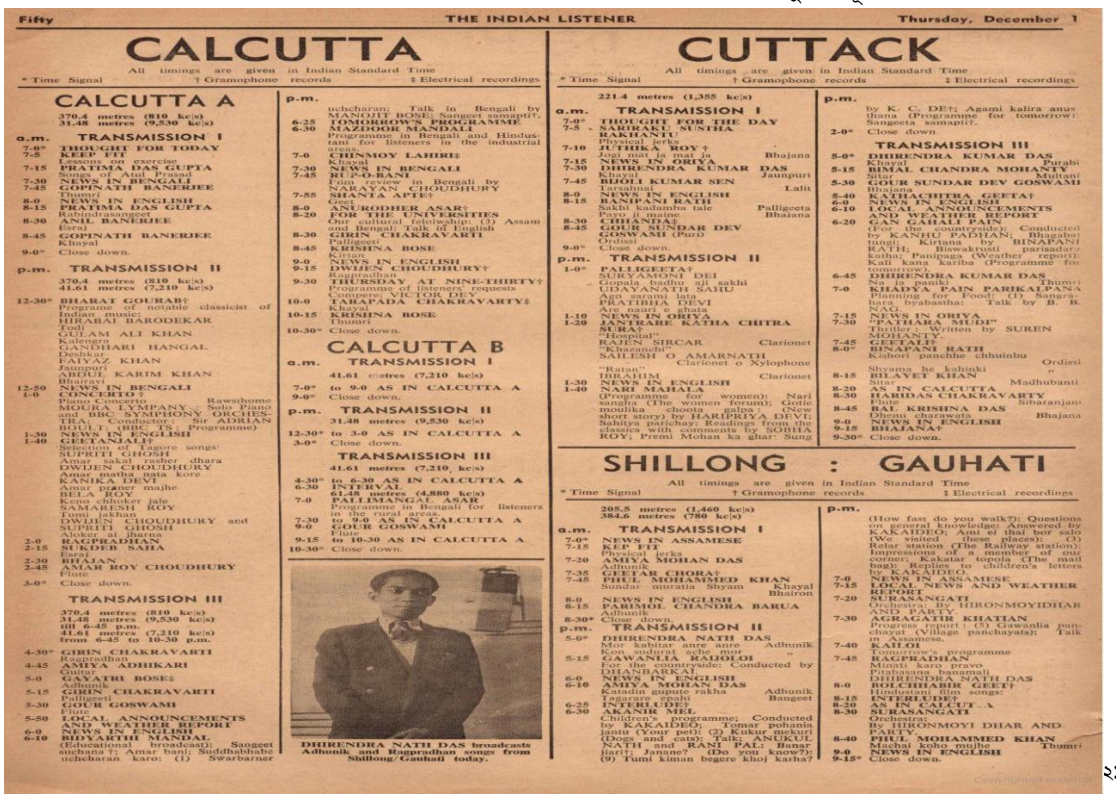

Fifty THE INDIAN LISTENER Thursday, December 1

CALCUTTA

All timings are given in Indian Standard Time
* Time Signal † Gramophone records ‡ Electrical recordings

CALCUTTA A

370.4 metres (810 kc/s)
31.48 metres (9,530 kc/s)

a.m. TRANSMISSION I

7-0* THOUGHT FOR TODAY
7-5 KEEP FIT
Lessons on exercise
7-15 PRATIMA DAS GUPTA
Songs of Atul Prasad
7-30 NEWS IN BENGALI
7-45 GOPINATH BANERJEE
Thumri
8-0 NEWS IN ENGLISH
8-15 PRATIMA DAS GUPTA
Rabindrasangeet
8-30 ANIL BANERJEE
Esraj
8-45 GOPINATH BANERJEE
Khayal
9-0* Close down.

p.m. TRANSMISSION II

370.4 metres (810 kc/s)
41.61 metres (7,210 kc/s)

12-30* BHARAT GOURAB†
Programe of notable classicist of Indian music:
HIRABAI BARODEKAR
Todi
GULAM ALI KHAN
Kalengra
GANDHARI HANGAL
Deshkar
FAIYAZ KHAN
Jaunpuri
ABDUL KARIM KHAN
Bhairavi
12-50 NEWS IN BENGALI
1-0 CONCERTO†
Piano Concerto Rawsthome
MOURA LYMPANY: Solo Piano and BBC SYMPHONY ORCHESTRA: Conductor: Sir ADRIAN BOULT; (BBC TS: Programme)
1-30 NEWS IN ENGLISH
1-40 GEETANJALI†
Selection of Tagore songs:
SUPRITI GHOSH
Amar sakal rasher dhara
DWIJEN CHOUDHURY
Amar matha nata kore
KANIKA DEVI
Amar praner majhe
BELA ROY
Keno chhoker jale
SAMARESH ROY
Tumi jakhan
DWIJEN CHOUDHURY and SUPRITI GHOSH
Aloker ai jharna
2-0 RAGPRADHAN
2-15 SUKDEB SAHA
Esraj
2-30 BHAJAN
2-45 AMAR ROY CHOUDHURY
Flute
3-0* Close down.

TRANSMISSION III

370.4 metres (810 kc/s)
31.48 metres (9,530 kc/s) till 6-45 p.m.
41.61 metres (7,210 kc/s) from 6-45 to 10-30 p.m.

4-30* GIRIN CHAKRAVARTI
Ragpradhan
4-45 AMIYA ADHIKARI
Guitar
5-0 GAYATRI BOSE‡
Adhunik
5-15 GIRIN CHAKRAVARTI
Palligeeti
5-30 GOUR GOSWAMI
Flute
5-50 LOCAL ANNOUNCEMENTS AND WEATHER REPORT
6-0 NEWS IN ENGLISH
6-10 BIDYARTHI MANDAL
(Educational broadcast): Sangeet suchana†; Amar bani; Suddhabhabe uchcharan karo: (1) Swarbarner

p.m.
uchcharan; Talk in Bengali by MANOJIT BOSE; Sangeet samapti†.
6-25 TOMORROW'S PROGRAMME
6-30 MAZDOOR MANDALI
Programme in Bengali and Hindustani for listeners in the industrial areas.
7-0 CHINMOY LAHIRI‡
Khayal
7-30 NEWS IN BENGALI
7-45 RUP-O-BANI
Film review in Bengali by NARAYAN CHOUDHURY
7-55 SHANTA APTE†
Geet
8-0 ANURODHER ASAR†
8-20 FOR THE UNIVERSITIES
Our cultural felolwship: (3) Assam and Bengal: Talk in English
8-30 GIRIN CHAKRAVARTI
Palligeeti
8-45 KRISHNA BOSE
Kirtan
9-0 NEWS IN ENGLISH
9-15 DWIJEN CHOUDHURY†
Ragpradhan
9-30 THURSDAY AT NINE-THIRTY†
Programme of listeners' requests
Compere: VICTOR DEY
10-0 TARAPADA CHAKRAVARTY‡
Khayal
10-15 KRISHNA BOSE
Thumri
10-30* Close down.

CALCUTTA B

a.m. TRANSMISSION I

41.61 metres (7,210 kc/s)

7-0* to 9-0 AS IN CALCUTTA A
9-0* Close down.

p.m. TRANSMISSION II

31.48 metres (9,530 kc/s)

12-30* to 3-0 AS IN CALCUTTA A
3-0* Close down.

TRANSMISSION III

41.61 metres (7,210 kc/s)

4-30* to 6-30 AS IN CALCUTTA A
6-30 INTERVAL
61.48 metres (4,880 kc/s)
7-0 PALLIMANGAL ASAR
Programme in Bengali for listeners in the rural areas.
7-30 to 9-0 AS IN CALCUTTA A
9-0 GOUR GOSWAMI
Flute
9-15 to 10-30 AS IN CALCUTTA A
10-30* Close down.

DHIRENDRA NATH DAS broadcasts Adhunik and Ragpradhan songs from Shillong/Gauhati today.

CUTTACK

All timings are given in Indian Standard Time
* Time Signal † Gramophone records ‡ Electrical recordings

221.4 metres (1,355 kc/s)

a.m. TRANSMISSION I

7-0* THOUGHT FOR THE DAY
7-5 SARIRAKU SUSTHA RAKHANTU
Physical jerks
7-10 JUTHIKA ROY†
Jogi mat ja mat ja Bhajana
7-15 NEWS IN ORIYA
7-30 DHIRENDRA KUMAR DAS
Khayal Jaunpuri
7-45 BIJOLI KUMAR SEN
Tarsahnai Lalit
8-0 NEWS IN ENGLISH
8-15 BANIPANI RATH
Sakhi kadamba tale Palligeeta
Payo ji maine Bhajana
8-30 CHHANDA‡
8-45 GOUR SUNDAR DEV GOSWAMI (Puri)
Ordissi
9-0* Close down.

p.m. TRANSMISSION II

1-0* PALLIGEETA†
SURYAMONI DEI
Gopala badhu aji sakhi
UDAYANATH SAHU
Ago sarami lata
PRATIBHA DEVI
Are nauri e ghata
1-10 NEWS IN ORIYA
1-20 JANTRARE KATHA CHITRA SURA†
"Hospital"
RAJEN SIRCAR Clarionet
"Khazanchi"
SAILESH O AMARNATH Clarionet o Xylophone
"Ratan"
IBRAHIM Clarionet
1-30 NEWS IN ENGLISH
1-40 NARI MAHALA
(Programme for women): Nari sangha (The women forum); Gotie moulika choota galpa: (New short story) by HARIPRIYA DEVI; Sahitya parichay: Readings from the classics with comments by SOBHA ROY; Premi Mohan ka ghar: Sung

p.m.
by K. C. DE†; Agami kalira anusthana (Programme for tomorrow): Sangeeta samapti†.
2-0* Close down.

TRANSMISSION III

5-0* DHIRENDRA KUMAR DAS
Khayal Purabi
5-15 BIMAL CHANDRA MOHANTY
Sitar Multani
5-30 GOUR SUNDAR DEV GOSWAMI
Bhajana
5-40 KATHACHITRA GEETA†
6-0 NEWS IN ENGLISH
6-10 LOCAL ANNOUNCEMENTS AND WEATHER REPORT
6-20 GAN GAHALI PAIN
(For the countryside): Conducted by KANHU PADHAN; Bhagabat tungi; Kirtana by BINAPANI RATH; Biswakrusti parisadara katha; Panipaga (Weather report); Kali kana kariba (Programme for tomorrow).
6-45 DHIRENDRA KUMAR DAS
Na ja paniki Thumri
7-0 KHADYA PAIN PARIKALPANA
Planning for Food: (1) Sangrahara byabastha: Talk by B. B. NAG.
7-15 NEWS IN ORIYA
7-30 "PATHARA MUDI"
Thriller: Written by SUREN MOHANTY.
7-45 GEETALI†
8-0* BINAPANI RATH
Kishori panchhe chhuinbu Ordissi
Shyama he kahinki "
8-15 BILAYET KHAN
Sitar Madhubanti
8-20 AS IN CALCUTTA
8-30 HARIDAS CHAKRAVARTY
Flute Sibaranjani
8-45 BAL KRISHNA DAS
Dhenu charawata Bhajana
9-0 NEWS IN ENGLISH
9-15 BHAJANA†
9-30* Close down.

SHILLONG : GAUHATI

All timings are given in Indian Standard Time
* Time Signal † Gramophone records ‡ Electrical recordings

205.5 metres (1,460 kc/s)
384.6 metres (780 kc/s)

a.m. TRANSMISSION I

7-0* NEWS IN ASSAMESE
7-15 KEP FIT
Physical jerks
7-20 AMIYA MOHAN DAS
Adhunik
7-35 GEETAR CHORA†
7-45 PHUL MOHAMMED KHAN
Sundar muratia Shyam Khayal Bhairon
8-0 NEWS IN ENGLISH
8-15 PARIMOL CHANDRA BARUA
Adhunik
8-30* Close down.

p.m. TRANSMISSION II

5-0* DHIRENDRA NATH DAS
Mor kabitar anre anre Adhunik
Kon sudurat ache mor "
5-15 GAWANLIA RAIJOLOI
For the countryside: Conducted by DHANBARKAI.
6-0 NEWS IN ENGLISH
6-10 AMIYA MOHAN DAS
Katadin gupute rakha Adhunik
Tagarare epahi Bangeet
6-25 INTERLUDE†
6-30 AKANIR MEL
Children's programme; Conducted by KAKAIDEO; Tomar pohania jantu (Your pet): (2) Kukur mekuri (Dogs and cats): Talk: ANUKUL NATH and RANI PAL: Banar jiari†; Janane? (Do you know?): (9) Tumi kiman begere khoj karha?

p.m.
(How fast do you walk?): Questions on general knowledge: Answered by KAKAIDEO; Ami ei thai bor salo (We visited these places): (3) Relar station (The Railway station); Impressions of a member of our corner; Kakatar topola (The mail bag): Replies to children's letters by KAKAIDEO.
7-0 NEWS IN ASSAMESE
7-15 LOCAL NEWS AND WEATHER REPORT
7-20 SURASANGATI
Orchestra: By HIRONMOYIDHAR AND PARTY.
7-30 AGRAGATIR KHATIAN
Progress report: (5) Gawanlia panchayat (Village panchayats): Talk in Assamese.
7-40 KAILOI
Tomorrow's programme
7-45 RAGPRADHAN
Minati karo pravo
Pitabasana banamali
DHIRENDRA NATH DAS
8-0 BOLCHHABIR GEET†
Hindustani film songs:
8-15 INTERLUDE†
8-20 AS IN CALCUT_A
8-30 SURASANGATI
Orchestra:
By HIRONMOYI DHAR AND PARTY.
8-40 PHUL MOHAMMED KHAN
Machal koho mujhe Thumri
9-0 NEWS IN ENGLISH
9-15* Close down.

২১

[২১] https://books.google.com.bd/books?id=SJXmDwAAQBAJ&pg=PA9&lpg=PA9&dq=ragpradhan+bengali+songs+by+narayan+choudhury&source=bl&ots=XlR9ak0FFW&sig=ACfU3U2sGMybGmtaI86KNgqzcY2lshl-Hw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjIhsTxlqPuAhVb4zgGHUSpBn4Q6AEwB3oECAYQAg#v=onepage&q=ragpradhan%20bengali%20songs%20by%20narayan%20choudhury&f=false

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বেতার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বাংলা গানের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান তৈরী হয় পূর্ব বঙ্গে এবং ঢাকা কেন্দ্রীক নাগরিক সংগীত চর্চার ক্ষেত্র স্থাপিত হয়। বাংলা গানের মূল প্রবাহে কাজী নজরুল ইসলামই প্রতিনিধিত্বশীল রচয়িতা, সুরকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন যার প্রভাব কলকাতা ও ঢাকা বেতারে লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ঢাকা বেতারে রবীন্দ্র সংগীতানুষ্ঠানের প্রযোজক ও প্রশিক্ষক ছিলেন গোপাল দাশ গুপ্ত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আবদুল আহাদ কলকাতা থেকে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন। তাঁর আত্মজীবনী 'আসা যাওয়ার পথের ধারে' হতে তৎকালীন ঢাকা কেন্দ্রীক সংগীতচর্চার কথা জানা যায়। তিনি সে সময় ঢাকা বেতারের সংগীত প্রযোজক হিসেবে আব্দুল হালিম চৌধুরী এবং ইউসুফ খানের কথা উল্লেখ করেছেন।[২২] ঢাকা বেতার প্রতিষ্ঠার পর আব্বাস উদ্দিন আহমদও এখানে চলে আসেন। তিনি লোক সংগীত শিল্পী হিসেবে খ্যাত হলেও রাগসংগীতে ভীষণ অনুরাগী ছিলেন। ঢাকা বেতারের উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে লায়লা আর্জুমান্দ বানু'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশে রাগপ্রধান গান, লঘু রাগসংগীত, রাগাশ্রয়ী গান, নজরুল গীতি ও আধুনিক সব শাখায় তাঁর দখল ছিল। ওস্তাদ গুল মোহাম্মদের কাছে তিনি রাগসংগীতে তালিম নিয়েছেন। এছাড়াও তৎকালীন সমসাময়িক ফিরোজা বেগম, ফেরদৌসী রহমান, মালেকা আফসার বানু, সোহরাব হোসেন, হাসিনা মমতাজ, রোকাইয়া ইসলাম, মমতাজ আলী খান, মুন্সী রইস উদ্দিন, ফরিদা ইয়াসমিন, আঞ্জুমান আরা বেগম, মাহবুবা রহমান, হুসনা বানু, আবদুল লতিফ, অঞ্জলি মুখার্জী, আফসারি খানম, বনানী ঘোষ, কলিম শরাফী, জাহানারা আহসান, বিমল চন্দ্র রায়, কুমকুম হক প্রমুখ শিল্পীগণ ঢাকা বেতারে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতেন। ঢাকা বেতারে প্রথম সংগীত পরিচালক ছিলেন নির্মল ভট্টাচার্য। এরপর গোপাল দাশগুপ্ত, চিন্ময় লাহিড়ী, গিরিন চক্রবর্তী প্রমুখ সুরকারগণ ঢাকা বেতারে যোগদান করেন। উল্লেখিত সবাই রাগপ্রধান গানের শিল্পী না হলেও লঘু রাগ সংগীত ও রাগাশ্রয়ী গান পরিবেশন করতেন। ফেরদৌসী রহমান ঢাকা বেতারে সর্বপ্রথম 'মিয়া কি টোড়ি' রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন ১৯৫৫ সালে। কলকাতা বেতারে রাগপ্রধান গানের প্রাধান্য যতখানি, ঢাকা বেতারে ঠিক ততটা ছিল না। তবে রাগপ্রধান গানের পাশাপাশি রাগাশ্রয়ী বাংলাগান এবং লঘু উচ্চাঙ্গ শ্রেণির বাংলাগানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বাংলা খেয়ালের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আজাদ রহমানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেক প্রাচীন অপ্রচলিত হিন্দি খেয়ালের বন্দিশকে তিনি বাংলা ভাষায় রূপদান করেছেন অকৃত্রিম ভাবে, এই বাংলা খেয়ালগুলোতে তাঁর নিজস্ব ভাবনা খেয়ালের বাণীর গুরুত্বকে আরো বৃদ্ধি করেছে। ফলে বাংলাদেশে বাংলা খেয়াল গানের জনপ্রিয়তা বেড়েছে বহুগুণে।

---

[২২]করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বর্তমান ও আরো*(ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ লিমিটেড, ২০১৪) পৃ ৩০, ২৩৩, ২৫৫

৪র্থ অধ্যায়: রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগরূপ

৪.১ শাস্ত্রীয় রাগের সাথে রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগের স্বরূপ বিশ্লেষণ

৪.২ রাগ প্রধান বাংলা গানের নান্দনিকতা এবং সার্থকতা পর্যালোচনা।

রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগরূপ

রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগরূপ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে রাগের কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বাংলাগানে রাগের প্রয়োগ করতে গেলে রাগের শর্ত ও নিয়মাবলী অনুসরণ করা আবশ্যক যা এই অভিসন্দর্ভের ১ম অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু রাগপ্রধান বাংলাগান বিষয়টি রাগের সাথে সম্পর্কিত কাজেই রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগরূপ আলোচনা করতে গেলে রাগের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এরই প্রাসঙ্গিকতায় বাদী স্বর, সন্ধিপ্রকাশ রাগ, ঋতু রাগ, রস, বাণীর গুরুত্ব, ভাবের বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি বিষয়গুলো এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হল।

রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টির সূচনালগ্নে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতীয় শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিনী ভাবনা আধুনিক বাংলাগানের ধারণাকে আরও যুগোপযুগী করে তুলেছিল। তিনি তাঁর সৃষ্টি কর্মে রাগ-রাগিনীকে প্রথাবদ্ধ নিয়ম হতে অবমুক্ত করেছেন। যা পরবর্তীকালে রাগপ্রধান বাংলাগানের প্রসারের বেগকে ত্বরান্বিত করেছে। দিলীপ কুমার রায়কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন-

> সারাজীবন ধরে একটা নির্দিষ্ট মতের অনুবর্তন করে চলাটা মনের স্বধর্মের পরিচায়ক নয়। একটা কথা আমি ভেবে দেখেছি- গানে ক্ষেত্রে শুধু গানের ক্ষেত্রে কেন, সমস্ত চারুশিল্পের ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টির পথ যদি খোলা নাই রইল তবে তা কিছুতেই শিল্পের পাঙক্তেয় হতে পারে না। শিল্পী নিজের পথ করে নেবে, প্রাচীন সংগীতের কণ্ঠে ঝুলে থাকাটা তার সইবে কেন ? পুরাতনকে বর্জন করতে বলিনে, কিন্তু নতুন সৃষ্টির পথে তাতে যদি কাঁটার বেড়া দেখা দেয় তবে তা নৈব নৈব চ। আকবার শার দরবারে তানসেন মস্ত গাইয়ে ছিলেন, কেননা তাঁর শিল্প প্রতিভা নিত্য নতুন সৃষ্টির খাতে রসের বান জাগিয়াছিল-আকবর শা-র যুগে ছিল সে ঘটনা অভিনব। কিন্তু এ কালের মানুস আমরা, আমরা কেন এখনো তানসেনের গানের জাবর কেটে চলব অন্ধ অনুকরনের মোহে ?[১]

অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এর মতে, "সেই সেই বস্তুকে রাগের 'রূপ' বলা যায় যাহা সুমিষ্ট স্বর দ্বারা বিশিষ্ট রূপে উদ্ভাসিত হইয়া আমাদের মনের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়। এই রূপ দুই প্রকারের : 'নাদময়' এবং 'দেবদেহময়' রূপ। নাদময় রূপের অবয়ব স্বর বা শ্রাদ্ধশব্দ এবং দেবময় রূপের অবয়ব ঐ রাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চাক্ষুষ রূপ (তস্‌বীর)।"[২]

---

[১]অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা গানের পথচলা*(কলকাতা: আজকাল পাবলিশার্স, ২০১০) পৃ ১১

[২]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ১৩

ভারতীয় প্রাচীন সংগীত সাধক মুনি-ঋষিগণ তাঁদের সাধনালব্ধ ধ্যান দ্বারা সংগীতের স্বর সমূহের কল্পরূপ প্রকাশ করে গিয়েছেন যেগুলোকে আকৃতি প্রদান করেছেন প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্পীগণ। এই ধ্যান কারা করেছেন বা কারা এইসব চিত্র এঁকেছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত পাওয়া যায় না। তবে খ্রীষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতকের শুরুর দিক থেকে যে রাগ চিত্রগুলো তৈরী করা হয়েছিল তার উল্লেখ আমরা পাই।[৩] সুতরাং 'রাগরূপ' হল রাগের অবয়বের কল্পনা যা অনেকটাই পৌরাণিক কাহিনীগুলোকে অনুসরণ করে রচনা করা হয়েছে। এই কল্পনাপ্রসুত অবয়বের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না থাকলেও তা ভারতীয় রাগ-রাগিনীর স্বরূপ প্রকাশে সার্থক ভূমিকা পালন করেছে। রাগ-রাগিনীর এই প্রাচীন রূপ কালক্রমে ভারতীয় রাগসংগীতকে একটি সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছে যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন গুণী সংগীতজ্ঞদের মাধ্যমে গবেষণালব্ধভাবে বর্তমান 'রাগরূপ' কে প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর প্রণীত 'রাগ ও রূপ' গ্রন্থের ভূমিকাংশে আরও উল্লেখ করেছেন,

> খুব সম্ভবতঃ এই চাক্ষুস রূপকল্পনা- ব্যাপারের প্রথম প্রয়োগ হয় 'রাগ-বিবোধ' -গ্রন্থের (১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে) বহু পূর্বে। এই গ্রন্থে এই ব্যাপারটি প্রথম লিপিবদ্ধ হইয়াছে- এইমাত্র।
>
> গ্রন্থাকার বলিয়াছেন-
>
> উক্তং রূপমনেকং তত্তৎ রাগস্য নাদময়মেবম্ ।
>
> অথ দেবতাময়মিহ ক্রমতঃ কথয়ে তদৈকৈকাম।। - (রাগবিবোধ, পঞ্চম বিবেক ১৬৮)
>
> সুস্বর- বর্ণ -বিশেষম্ রূপং রাগস্য বোধকং-দ্বেধা
>
> নাদাত্মং দেবাময়ং তৎ ক্রমতোহনেকমেকঞ্চ।।[৪]

প্রকৃতপক্ষে রাগের স্বরমালা দিয়েই যে রাগরূপকে প্রকাশ করা যায় তা নয়। রাগরূপ প্রকাশের জন্য গায়ক ও সাধককে এর আঙ্গিক বিশ্লেষণকে প্রকাশ করতে হয়। এটা শুধুই সম্ভব শিল্পী সত্তার মনের কল্পনা প্রসূত ভাবকে ব্যক্ত করার মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রতিটি রাগ-রাগিনীর স্বররূপকে কল্পনার মাধ্যমে বাস্তবে আকৃতি বা অবয়ব প্রদান করা। ভারতীয় সংগীতে রাগ গাওয়ার জন্য অনেক নিয়ম কানুন মানা হয়। বিখ্যাত সংগীত শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন সময়ে এই নিয়মগুলো প্রণয়ন করেছেন। বিশেষত, রাগ সংগীতে ঘরানা শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঘরানা হল Style/

---

[৩]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ১৩

[৪]তদেব । পৃ ১৩

গায়কী, যা বৈশিষ্ট্য, Pattern ইত্যাদি মিলিয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিভিন্ন ঘরানা কেন্দ্রীক বিভিন্ন রকম রাগরূপ দেখা যায়। আবার রাগরূপ এই হলেও ঘরানা ভেদে রাগের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য গুলোর পার্থক্য রয়েছে। তবে রাগ প্রধান গানে এসব বৈশিষ্ট্য মেনে চলা কঠিন। প্রথমত, রাগপ্রধান গান ঘরানা ভেদে আলাদা নয়; এটি সার্বজনীন। রাগসংগীতে সেনী, গোয়ালিয়র, আগ্রা, কিরানা, পাঞ্জাব, পাতিয়ালা, বারানসী, অত্রৌলী ইত্যাদি নানা ধরনের ঘরানা রয়েছে। এইসব ঘরানা পরস্পর পার্থক্যপূর্ণ তাদের গায়ন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে। রাগপ্রধান গানে ঘরানা নেই। কিন্তু ঐ ঘরানার গায়ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাগের ব্যবহার রয়েছে। যেহেতু রাগপ্রধান মানেই রাগকে প্রাধান্য দেওয়া, তাই শুধু রাগরূপকে দেখিয়ে বাংলাভাষার গান হিসেবে রাগপ্রধান গান অনন্য। বিভিন্ন ঘরানার শিল্পীগণ রাগপ্রধান গান গেয়েছেন বাংলা গানের মত করেই। রাগপ্রধান গানে ঘরানার প্রভাব এ কারণেই পড়েনি যে, রাগ সংগীত এই গান সৃষ্টি করেনি অথবা কোন প্রসিদ্ধ ঘরানাদার শিল্পীও এর সৃষ্টি করেনি। এটি বাঙালির নিছক সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। উচ্চাঙ্গরীতির ঢং এ বাংলাগান গাওয়াটাই ছিল রাগপ্রধান গানের সৃষ্টির কথা। তাই এই গানে ঘরানা মানা হয় না। যেমন-বাগেশ্রী রাগটি কিরানা ঘরানায় গাইতে গেলে তার গায়কী, অলংকার এসব ঐ ঘরানার প্রথাগত নিয়ম মেনেই গাইতে হবে যা পাতিয়ালা ঘরানায় এসে ভিন্ন রকম হয়ে যায়। রাগরূপ একই কিন্তু গায়কী, অলংকার, তান, লয়কারী এসবের ভিন্নতা। অথচ রাগপ্রধান গানে এ রকম ভিন্নতা নেই। দ্বিতীয়ত, রাগপ্রধান গানে রাগের গায়ন সময় মানা হয় না। এই গান অন্যান্য সাধারণ বাংলাগানের মতই যেকোন সময় গাওয়া হয়। রাগপ্রধান গান বৈঠকী আসরের গান। তাই রাগের সময় মেনে গাওয়া সবসময় সম্ভব নয়। বর্তমানে রাগসংগীতও সময় মেনে গাওয়া হয় না। সাধারণত শিল্পীগণ রাগ পরিবেশনের পূর্বে রাগের সময় উল্লেখ করে বলে থাকেন যে, এটি ঐ সময়ের রাগ নয় তবুও পরিবেশন করা হচ্ছে। এটি মূলত আধুনিকতার প্রভাবে হয়েছে। শাস্ত্রসম্মতভাবে অনেক কিছুই মানা হয় না। না মানলে ক্ষতি নেই, শুধু সময় অনুযায়ী রাগরূপ সার্থক রস সৃষ্টি করতে পারে না, যেমন-আহীর ভৈরব রাগ যখন তখন গাওয়া গেলেও সার্থক রস সৃষ্টি করতে পারে শুধুমাত্র এর যথাযথ সময়ে, ভোরবেলায়। রাগপ্রধান গানে সময় মানার রীতি নেই। যদি বাণীতে সময় উল্লেখ থাকে (যেমন-সকাল, সন্ধ্যা, ভোর) তাহলে গানটি ঐ সময়ে গাইলে অনেক অর্থপূর্ণ হয়। তাই অনেকেই সংশ্লিষ্ট রাগের সময় মেনে গান গাওয়ার চেষ্টা করেন। তাতে রাগপ্রধান গান আরো হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, রাগপ্রধান গানে বাদী-সমবাদী স্বর বোঝা যায়না। ধ্রুপদ, খেয়াল গাওয়ার সময় রাগের চলনে বাদী - সমবাদীকে অনেক গুরুত্ব সহকারে দেখানে হয়। বিশেষত বাদী স্বর রাগলক্ষণ প্রকাশক স্বর। কিন্তু রাগপ্রধান গানে বাদীস্বর দেখানোর সুযোগ কম থাকে, যদি আলাপ, বিস্তার ও তানের জায়গায় দেখানো না হয়। অন্যদিকে ন্যাস স্বরও রাগপ্রধান গানে দেখানো হয় না। শুধুমাত্র রাগের বিশেষ স্বর সংগতি ও রাগের চলন দেখানো হয়। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী ইত্যাদি অঙ্গে

রচিত রাগপ্রধান গানে স্ব স্ব অঙ্গ মানা হয়। অর্থাৎ ধ্রুপদাঙ্গীয় গানের রাগরূপ ও বৈশিষ্ট্য ধ্রুপদকেই অনুসরণ করে রচিত।

উপরিউক্ত পর্যালোচনা শেষে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাগকে প্রধান করে বাণীর গুরুত্ব যে গানে থাকে সেটাই রাগপ্রধান গান অর্থাৎ এই গানে রাগই মূল উপজীব্য হলেও বাণীরও সমান গুরুত্ব রয়েছে। যা রাগকে নিজস্ব পথে সহজেই পরিচালিত করে।

> রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন ভারতীয় সংগীতের এই বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদীর সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামো, জমিদার, নায়েব, পার্ষদ ও বিবাদীযুক্ত ভারতীয় সংগীতের রাজতন্ত্র, তার থেকে এই সংগীতকে মুক্তি দিতে হবে প্রজাতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, গণতন্ত্রে, তাই তিনি এই প্রথা ভেঙ্গে মুক্তি দিলেন সপ্তকের সাতটি পর্দাকে। যে পর্দাকে যখান প্রয়োজন তখনই তাকে ব্যবহার করলেন ভাবের প্রয়োজন।[৫]

রাগরূপ বর্ণনায় বাদীস্বর

হিন্দুস্থানী সংগীতে রাগরূপ বা স্বরবিস্তার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার মাধ্যমে শিল্পী তার শিল্পচেতনাকে বিশেষ নৈপূণ্যের সাথে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। কারণ রাগরূপ দেখানোর একমাত্র কাজটি শিল্পীই করে থাকেন। সাধারণত গায়ক বা শিল্পী তাঁর কণ্ঠের কারুকার্য ও সুরের কৌশলে বাদী স্বরের উপর প্রাধান্য দিয়ে রাগরূপ দেখিয়ে থাকেন। একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে বাদীস্বরকে কেন্দ্র করে রাগরূপ তোলার জন্য পকড়, রাগের স্বরবিন্যাস, বিস্তার ইত্যাদি দেখানোর মাধ্যমেই প্রকৃত রাগভাব পাওয়া যায়। যেমন- ভূপালী ও দেশকার রাগে বাদীস্বর যথাক্রমে গান্ধার ও ধৈবত। ফলে ভূপালী পূর্বাঙ্গে এবং দেশকার উত্তরাঙ্গে গাওয়া হয় এবং রাগালাপ, বিস্তার ইত্যাদিতে বাদীস্বরের গুণে খুব সহজেই আমাদের কাছে রাগরূপ খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বরগত সাদৃশ্য থাকার সত্ত্বেও বাদী স্বরের কারণে রাগদুটির পার্থক্য বোঝা যায়। রাগের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে রাগ রূপ গুরত্বপূর্ণ হলে রাগপ্রধান গানে বারবার বাদী স্বর দেখানো হয় না। গানের সুরে রাগরূপ ফুটে উঠলে সেখানে বাদী স্বর প্রয়োগের যতটুকু স্থান থাকে, ততটুকুই প্রয়োগ করা হয়। খেয়ালের বন্দিশ অথবা ঠুমরী-টপ্পায় বারবার বিস্তার করে বাদী-সমবাদীকে দেখানোর প্রবণতা রাগপ্রধান গানে নেই। তবে রাগের চলন পরিষ্কার ভাবে দেখানোর আবশ্যিকতায় বাদী-সমবাদী স্বর পাওয়া যায়। যেমন- মালকোষ রাগে 'একি তন্দ্রা বিজরিত আঁখি পাত' গানে মালকোষ রাগের বাদী স্বর হিসেবে 'ম' স্বরটি রাগের চলনে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মালকোষ রাগে স্বর সংখ্যা পাঁচটি, স জ্ঞ ম দ ণ। রাগের চলনঃ স মজ্ঞ, মজ্ঞ স, দ্ ণ্ স

---

[৫]অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা গানের পথচলা*(কলকাতা: আজকাল পাবলিশার্স, ২০১০) পৃ ১৫

মজ্ঞ, ম দ ণ দ ম, ম জ্ঞ ম জ্ঞ স- হিসেবে মধ্যমের ব্যবহার গানের চরণেও অধিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

ম জ্ঞস সম জ্ঞম জ্ঞস স (সা) া দ্ ণ্ স স ম া মজ্ঞ ম

এ কি০ ০ত ০দ্রা ০বি ০ জ ০ রি ত আঁ ০ খি পা ০ত ০

সন্ধি প্রকাশ রাগ রূপ

> সন্ধি শব্দের অর্থ হলো মিলন। দিন ও রাত নিয়ে ২৪ ঘটনা। এর মধ্যে অতি প্রত্যুষে এবং সন্ধ্যায় দিন ও রাত্রি দু'বারে পরস্পরে মেলবার সুযোগ পায়। এই মিলনকালকে বলা চলে সন্ধিকাল। সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের আরম্ভ ও শেষ হতে যেমন সময় লাগে, এই দিবা-রাত্রির মিলনকালটিও সেই প্রকারের। ধীরে ধীরে মিলনের দিকে উভয়ে যেন এগিয়ে আসে। মিলনের পরে আবার তেমনি সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এই রূপ মিলন ও বিচ্ছেদে, সময় লাগে প্রায় তিন ঘন্টা। প্রত্যুষে ৪টা থেকে ৭টা আবার সন্ধ্যায় ও ৪ টা থেকে ৭টা। সকাল ও সন্ধ্যায় এই তিন ঘন্টা সময়ের মধ্যে উচ্চাঙ্গের হিন্দী সংগীতের যে যে রাগ বা রাগিনী ক'টি গাইবার নির্দেশ আছে, সেই রাগ বা রাগিনীগুলিকে বলা হয়েছে সন্ধি প্রকাশ রাগিণী।[৬]

সন্ধি প্রকাশ রাগ বলতে বোঝায় যে রাগ সমূহ সন্ধিক্ষণে গাওয়া হয়। এই সন্ধিক্ষণ সময়কাল দুটি সময়ে আসে। একটি হল দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণ, অপরটি রাত ও দিনের সন্ধিক্ষণ। ২৪ ঘন্টার মধ্যে শুরু এ দুটি সময়ে যে রাগগুলো গাওয়া হয় তাকে সন্ধিপ্রকাশ বলে। তবে এ সময় খুব অল্প স্থায়ীত্ব হওয়ার কারণে পন্ডিতগণ এক প্রহর সময় অর্থাৎ তিনঘন্টা সময়কাল হল সন্ধিপ্রকাশ রাগ পরিবেশন সময়। সন্ধিপ্রকাশ রাগের বৈশিষ্ট্য গুলো হলো, রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির মধ্যে র এবং ধ স্বরটি কোমল, গ স্বরটি শুদ্ধ; ব্যতিক্রম হিসেবে ধ স্বরটি শুদ্ধও হতে পারে। সন্ধিপ্রকাশ রাগ প্রসঙ্গে রাগ মিলিত এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই কারণে যে রাগের অবয়বে ও ভাবে রাত ও দিনের মিলনের তথা সন্ধি স্থানটির সার্থক রূপ পাওয়া যায়। ললিত রাগে তীব্র মধ্যম এর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সন্ধি প্রকাশ রাগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল রাগরূপ দ্বারা রাতের ক্রান্তিকাল এবং সূর্যোদয়ের আভাস সম্মিলিতভাবে ফুটিয়ে তোলা। এজন্য মধ্যম স্বরটিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সংগীত গবেষক ও পণ্ডিতদের মতে প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে স্বরের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। একারণেই সময় অনুয়ায়ী রাগ বিভাজন করা হয়েছে। সন্ধিপ্রকাশ রাগগুলি সাধারণত কোমল রেখাব ও কোমল ধৈবত বিশিষ্ট। তবে স্বর ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাতঃকালীন ও রাত্রিকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন-ভৈরব ঠাটাশ্রিত রাগ ভৈরব বা ভৈঁরো, বিভাস, রামকেলী, কালিংড়া ইত্যাদি প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। অন্যদিকে মারবা ঠাটাশ্রিত মারবা, সোহিনী, পুরিয়া, ললিত ইত্যাদি রাত্রিকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। উল্লেখ্য, এই দুই প্রকাশের মধ্যে প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগে শুদ্ধ

---

[৬]শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা*(কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্স, ১৯৭২) পৃ ৭৪।

মধ্যম এবং রাত্রিকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগে তীব্র মধ্যম এর ব্যবহার রয়েছে। ভারতীয় সংগীতে সময় অনুযায়ী রাগ গায়নকলার আরেকটি বিশেষ বিষয় হল ঋতুভিত্তিক রাগ। হনুমন্ত মতানুযায়ী-গ্রীষ্মকালে- রাগ দীপক, বর্ষাকালে রাগ-মেঘ, শরৎকালে-রাগ ভৈরব, হেমন্তকালে রাগ মালকোষ, শীতকালে-রাগেশ্রী এবং বসন্তকালে-রাগ হিন্দোল গাওয়া হয়। ঋতুরাগ সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিনী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সংগীত শাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুর জন্য কিছু কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব, কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই, বসন্তের জন্য আছে বসন্ত আর বাহার ; আর বর্ষার জন্য মেঘ, মল্লার, দেশ এবং আরো বিস্তর। সংগীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই হয় জিত।"[৭] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথাটির সূত্র ধরে বর্ষা ঋতু রাগ হিসেবে আমরা পাই- মেঘমল্লার, শুদ্ধ মল্লার, নটমল্লার, রামদাসী মল্লার, দেশ মল্লার, মিয়াকি মল্লার, গৌড় মল্লার, রূপমঞ্জরী মল্লার, অরুণ মল্লার, সুরদাসী মল্লার ইত্যাদি মল্লার শ্রেণিভুক্ত রাগ; এছাড়াও দেশ, জয়জয়ন্তী ইত্যাদি জনপ্রিয় বর্ষা ঋতুরাগ। নাম বিভিন্ন হলেও এসবকটি রাগরূপ গাইবার সময় বার্তার আবহ সৃষ্টি হয় মনের কোনে। কথিত আছে, মিয়া তানসেন একদা মেঘ রাগ পরিবেশন করে দিল্লীতে বৃষ্টি এনে দিয়েছিলেন। রাগপ্রধান গান সন্ধি প্রকাশ রাগের সময় অনুযায়ী পরিবেশন করা হয় না। কিন্তু রাগের চলনে সন্ধিপ্রকাশ রাগরূপ ঠিকই প্রকাশিত হয়। এর অর্থ দাঁড়ালো যে, ভৈঁরো রাগে কোন গান রচিত হলে তা ভোরবেলায় পরিবেশন করাটা বাঞ্ছনীয় নয় ভৈঁরো রাগে খেয়াল হলে তা অবশ্যই প্রাতঃকালে গাইতে হবে। রাগপ্রধান গানে শুধু রাগরূপটুকুই গুরুত্ব পায়, গায়ন সময় নয়। কিন্তু ঋতুভিত্তিক রাগগুলো আবার বিশেষ বিশেষ ঋতুতে যেমন গাওয়া হয় ঠিক তেমনি ঋতুভিত্তিক রাগে রচিত রাগপ্রধান গানগুলিও বিভিন্ন ঋতুতে গাওয়া হয়। এ বিষয়টি আধুনিক গানের ক্ষেত্রেও একই। বর্ষাকালে যেমন রাগ মেঘ গাওয়া যায়, মেঘ রাগে নিবদ্ধ রাগপ্রধান গানও গাওয়া যায়। কিন্তু মেঘ রাত্রিকালীন রাগ। এই রাগের বন্দিশ রাতে গাইবার নিয়ম। কিন্তু মেঘ রাগের রাগপ্রধান গান রাতে-দিনে/বর্ষাকালে যে কোন সময় গাওয়া হয়। শুধুমাত্র সময়টুকু না মেনে বাকি সব ঠিক ভাবে গাওয়া হয়। যেমন- কাজী নজরুলের মেঘ রাগে রচিত 'গগনে সঘন চমকিছে দামিনী' গানটি মেঘ রাগে রচিত খেয়ালের বন্দিশ 'গগনে গরজত দমকত দামিনী' এর অনুরূপ, অথবা 'শ্যামা তন্বী আমি মেঘ বরণা' গানেও মেঘ রাগের পূর্ণাঙ্গ রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। সন্ধি প্রকাশ রাগে নিবদ্ধ গানগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভৈঁরো বন্দিশ 'জাগো মোহন প্যারে' এর অনুকরণে 'তুমি আপনি জাগাও মোরে' রচনা করেছেন। এছাড়াও প্রাতঃকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ ভৈরব/ভৈঁরো রাগে কবিগুরুর রচিত গানের মধ্যে রয়েছে 'শুভ্র আসনে বিরাজো' 'আলোয় আলোকময় কর হে' 'তোমারি নামে নয়ন মেলিনু' প্রভৃতি গান। ভৈঁরো রাগে রচিত খেয়ালঙ্গের গান 'মন

---

[৭]কিশোর চক্রবর্তী, রসাস্বাদনের প্রক্ষাপটে রাগ রাগিনীর শ্রেণিবিভাজন একটি ভাবনা, সম্পাদক: অনিল আচর্য, অনুষ্টুপ প্রাক্- শারদীয় সংখ্যা, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৪ (কলকাতা: ২০১৪) পৃ ২৬

জাগ মঙ্গল লোকে আমল অমৃতময় নব আলোকে- গানে রাগরূপ স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন-

ম গ ম া নদ া প া পদ ম পঃ মঃ পদ মপ মগ া (ম-গ)} া া

ম ন জা ০ গো০০ ম ঙ গ০ ল লো ০ ০০ ০০ কে০ ০ ম ন ০ ০

গানের বাণীতে প্রাতঃকালের বর্ণনা এবং সুরে ভৈঁরো রাগ রূপ-গ ম ঋ, দ মপ দ ন র্স র্খ ইত্যাদি স্বর সংগতি লক্ষ্যণীয়।[৮] রবীন্দ্রনাথ কিভাবে সুরকে ব্যবহার করেছেন তা সম্পর্কে *আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে* উল্লেখ করা হয়েছে-

> তাঁর সুর সংযোজনা পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি কখনো অসিদ্ধভাবে বিদেশী সুরকে ব্যবহার করেন নি। দিবা ভাগের সুরকে নৈশ সুরের স্থলে অথবা নৈশকে দিবার স্থলেও ব্যবহৃত হয়নি। তাঁর রচনায় কেউ হয়তো দেখবেন, ভৈরব রাগে টোড়ির ছায়া আনা হয়েছে অথবা আশাবরীতে পড়েছে ভৈরবীর স্পর্শ। কিন্তু তা ভৈরবীর সাথে বাহার অথবা নটের সাথে বিহাগের সংমিশ্রণের মতো অসঙ্গত নয়। আমাদের রাগ সমূহ যে নিজেরাই স্থবির নয়- গতিশীল, এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত সজাগ ছিলেন।[৯]

রাগরূপ এর সাথে রসের সম্পর্ক

ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের প্রাণ হল রাগ, কিন্তু রাগের প্রাণ হল রস। ১২ টি স্বরবিন্যাস রাগরূপ সৃষ্টি করলেও রস বিহীন রাগরূপ জড়বস্তুর মত। রাগ স্বর সমষ্টির সমাবায়ে ও বিভিন্ন মিলনে-মিশ্রণে সৃষ্টি হয়। আবার সৃষ্টি হয় রাগ ও রাগিনীদের বিকাশে বিচিত্র রকমের ভাব, রস ও অভিব্যক্তি। সংগীত জগতে-কি ভারতে ও কি পাশ্চাত্যে এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সংগীতের ভাবের বিকাশকেই সমদার দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য সংগীতের জগতে এসথেটিককে সৌন্দর্য বা সুন্দর বলে এবং ভারতে সেই সৌন্দর্য বা সুন্দরকে বলে রসানুভূতির সঙ্গে রসবিকাশ ও রসলাবণ্য। সঙ্গীতে বিভিন্ন রাগে ও রাগিনীতে 'রস' সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন ভাবের বিকাশের জন্য। রস ও ভাবের মিলনই সংগীতকে প্রাণবান ও সংগীতের প্রত্যক্ষ-উপলব্ধিকে সার্থক করে, সুন্দর করে ও সুষমাযুক্ত করে।[১০]

রাগরাগিনীর স্বরবিন্যাসে এই স্বররূপকে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সাধক শিল্পী রসমাধুর্যের ভাবমূর্তিতে অভিব্যক্ত করতে প্রয়াসী হন। মনচিন্তার তথা কল্পনার আশ্রয়। সাংগীতিক স্বর ও রাগের মধ্যস্থিত মাধুর্যগুণের কারণে সংগীত শাস্ত্রজ্ঞগণ স্বর ও স্বরসমষ্টি বা রাগকে শক্তি বিশিষ্ট বলে মনে করেন। চেতন মনে অনুভূত এই শক্তির নাম রঞ্জনাশক্তি। অর্থাৎ রঞ্জনা শক্তি স্বর ও রাগে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র বিবিধ স্বরবিন্যাসে উৎপন্ন রাগের ধ্বনি

[৮]প্রসাদ সেন, *রবীন্দ্র সংগীতে মিলন মেলা*(কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, ১৯৯০) পৃ ২৮

[৯]ম ন মুস্তাফা, *আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে*(ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮১) পৃ ২১৮

[১০]স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*(কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫১) পৃ ২২১

সমষ্টির সমবায়ে উদ্ভুত স্বরচ্ছবিতে অতৃপ্ত সূক্ষ্মদর্শী সাধকশিল্পী রাগকে একটি অন্তরগ্রাহ্য রসমাধুর্যের ভাবমূর্তিতে ব্যক্ত করতে আকাঙ্খিত হন। রাগরূপ বর্ণনায় রস হল সবচেয়ে কার্যকর। সংগীতে রসের সার্থকতা নির্ভর করে রাগরূপের উপর। কারণ রাগ ও রস একে অপরের পরিপূরক। সংগীতে রস ৮টি। এগুলো হল-শৃংগার, হাস্য, রুদ্র , করুণ, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। "অনেকে শান্তরসকে চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থা মনে করে স্বতন্ত্র স্থান দেন না।"[১১] কিন্তু বৈষ্ণব মতে শান্ত নবম রস এবং এই মতানুযায়ী আরো চারটি রস এর সন্ধান পাওয়া যায় দাস্য, সখ্য, বৎসল্য এবং মধুর। এই রসগুলো সাতটি স্তরে আলাদা ভাবে রয়েছে। যেমন-

ষড়জ- বীররস (ভিন্নমতে বীর, রুদ্র ও অদ্ভুত রস)

ঋষভ - বিস্ময়রস (ভিন্নমতে বীর ও ভয়ানক রস)

গান্ধার -শান্ত রস (ভিন্নমতে করুণ রস)

মধ্যম- হাস্যরস (ভিন্নমতে শৃংগার ও হাস্যরস)

পঞ্চম - মধুর রস (ভিন্নমতে শৃঙ্গার ও হাস্যরস)

ধৈবত- বীভৎস রস (ভিন্নমতে ভয়ানক রস)

নিষাদ- বীভৎস রস (ভিন্নমতে রুদ্র ও অদ্ভুতরস)

সংগীত রস এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ পাওয়া যায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সংগীত অধ্যায়ে। ভরতের মতে শৃংগার, বীর, বীভৎস ও রুদ্র এই চারটি প্রধান রসোৎপাদক এবং শৃংগার শ্রেষ্ঠ রস। বৈষ্ণব কবি সাহিত্যিকদের মতে, শৃংগার সংগীতের আদিরস। এই আদিরস হতেই অন্যান্য রস উৎপন্ন হয়ে রাগ-রাগিনীকে নিজস্ব রূপমন্ডিত করে তুলেছে। ভারতীয় সংগীতে প্রতিটি রাগের যেমন আলাদা আলাদা স্থান রয়েছে। সে স্থানকে আরো বিশেষায়িত করে তোলে রস। এই সব রাগ ছাড়াও আরো অনেক রাগ-রাগিনী বিবর্তনের মাধ্যমে বিচিত্র রূপরস নিয়ে আমাদের হৃদয়কে আপ্লুত করে চলেছে। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি বিলাবলকে শুদ্ধ ঠাট হিসেবে গ্রহণ করার ফলে প্রাচীন রাগরূপের অনেক সংস্কার সাধনের দ্বারা অধিকাংশ রাগের রাগরূপ পরিবর্তিত হয়েছে। সে অনুযায়ী বিভিন্ন রাগ ভিন্ন ভিন্ন রস হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। করুণ রসের রাগ-রাগিনীগুলোর মধ্যেই যত বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়। যেমন- বেহাগ, বাগেশ্রী, কানাড়া, মল্লার, ললিত, টোড়ী ইত্যাদিতে নানারকম বিরহ রসে। নট বেহাগ, ছায়া বেহাগ, মারু বেহাগ, হেম বেহাগ, পট বেহাগ-এ এসে আমরা এক করুণ রসের ৫টি প্রকার পেয়ে যাই। দুঃখের রাগ হিসেবে টোড়ি একই রকম বৈচিত্র্যময়। মিয়া কি টোড়ী, বিলাসখানী টোড়ী, গুর্জরী টোড়ী-যেন তিন ধরনের

[১১]কিশোর চক্রবর্তী, রসাস্বাদনের প্রক্ষাপটে রাগ রাগিনীর শ্রেণিবিভাজন একটি ভাবনা, সম্পাদক: অনিল আচর্য, অনুষ্টুপ প্রাক্- শারদীয় সংখ্যা, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৪ (কলকাতা: ২০১৪) পৃ ২৯

বিয়োগব্যাথার রাগরূপ। বিলাসিত সুখ-দুঃখের ভাব সম্বলিত রাগ-রাগিনীর মধ্যে খাম্বাজ, পিলু, জয়জয়ন্তী, কাফী, ছায়ানট, কামোদ, কেদার, হামীর, তিলককামোদ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রাগপ্রধান গানের বাণীর গুরুত্ব - শাস্ত্রীয় সংগীতে বাণী অপেক্ষা সুরের প্রাধান্য বেশী পরিলক্ষিত হয়। অল্প কথায় বিভিন্ন আঙ্গিকে সুরারোপ করে রাগের চলনকেই অধিক প্রকাশ করা হয়। ধ্রুপদ ও খেয়াল গানে খুব অল্প বাণীর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দুই তুক বা চার তুক, এর বেশী বাণী নেই বললেই চলে। এই অল্প কথাতেই রাগের বিস্তার দেখানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে কথার পরিমাণ আরও কম হয়, সুরের আধিক্যই বেশী পরিলক্ষিত হয়। ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের শুরুতেই নোম-তোম-তানা-দেরে এবং আ-কার সহযোগে আলাপ জোর ঝালা পরিবেশন করা হয়। এই অংশে সুরের প্রাধান্যই বেশী, ভাষাও ভাবের কোনো গুরুত্ব নেই। রাগসংগীতে বন্দিশ অংশেই বাণীর ভাব প্রকাশ পায়। বাকি অংশের সুরের গুরুত্বই তীব্র, কেননা সুরের মাধ্যমেই রাগরূপ প্রকাশ পায়। ঠিক বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায় রাগপ্রধান বাংলাগানে। জাতিগত ভাবেই বাংলাগানে কাব্যিক অংশ আলাদা গুরুত্ব বহণ করে, যতখানি রয়েছে সুরের গুরুত্ব।

> বাংলার সংগীতে 'কথার সাথে সুরের পরিণয় ঘটেছে, বা 'বাণীর সাথে সুরের মিলন' অর্থাৎ কথা এবং সুর দুই সমান তালে চলে এখানে। উত্তর ভারতীয় সংগীতে সে জায়গায় কথা বা গীতের ভাবের চেয়ে সুরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে অনেক বেশি। এখন সুরের বিভিন্ন উত্থান, পতন, কায়দা কানুন, কালোয়াতি ইত্যাদি বিষয়গুলির মধ্যে যতই মাহাত্ম্য থাক না কেন বাঙ্গালির মনে তা দাগ কাটতে পারে নি।[১২]

অর্থাৎ রাগের গাম্ভীর্যময়তা যতই গাঢ় হোক, নিয়মের বেড়াজাল যতই দৃঢ় হোক বাংলা ভাষাভাষী মানুষের হৃদয়ে সুরের অটুট গাঁথুনী ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কম্পন অনুভব করাতে পারেনি যতক্ষণ না তাতে বাংলা কথার বিচরণ ছিল। রাগপ্রধান গানের গুরুত্ব এখানেই অনুধাবিত হয় যে এই গানে সুরকে সঙ্গী করেই কথা এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের অন্যান্য গীতিরীতিতেও কথার উপযোগীতা অধীক। সুর একটি সার্বজনীন শিল্প, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে সুরের কোনও বিভিন্নতা নেই, পার্থক্য শুধু ভাষায়। বাংলা একটি প্রাচীন ভাষা এবং এই ভাষায় কাব্যরস অন্যান্য ভাষা হতে কয়েকগুণ বেশি। কাজেই বাংলাগানে ভাষা বা কথার প্রাবল্য থাকাটাই স্বাভাবিক। রাগপ্রধান বাংলাগানের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই শ্রেণির গানে রাগভাবটাই আসল কিন্তু তার প্রকাশ শুধু সুরেই নয়, কথাতেও। হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনী বাংলা ভাষা ও গদ্যের ছন্দে এক নতুন রূপে রাগপ্রধান বাংলাগান নামে আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালীন শিল্পী সমাজে এই গানের সাংগীতিক মূল্য ছিল উচ্চ। সব ধরনের শিল্পীগণ এই গান গাইতেন না। সবাই এই গান রচনা করতে জানতেন না। সাধারণত শাস্ত্রীয় সংগীতে দক্ষ শিল্পীরাই এই গান পরিবেশন করতেন

---

[১২]মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*(কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩) পৃ ৪২৪

এবং কাব্য ও সাহিত্যপ্রেমী রচয়িতাগণ রাগপ্রধান বাংলাগান রচনা করতেন, তাতে সুর দিতেন। কলকাতা ও বাংলাদেশে রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টির এক মহোৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাঙালি সংগীত রচয়িতাগণ তাদের স্বীয় প্রতিভাগুণে সাহিত্য ও কাব্যে পরিপূর্ণ গীতাংশ লিখে দিতেন যাতে সুরারোপ করতেন বাংলাগানের অভিজ্ঞ সুরস্রষ্টাগণ। একেকটা গান দক্ষ ধ্রুপদীয়া/খেয়ালিয়াদের কণ্ঠের কারুকার্যে হয়ে উঠেছিল অনন্য এক শিল্প হিসেবে। যে শাস্ত্রীয় সংগীত একদা কম বাণীতে সুর সর্বস্ব হিসেবে প্রাচীনকাল হতে প্রবাহিত হয়ে আসছিল সেই শাস্ত্রীয় সংগীতেরই রাগরূপকে কথার ছাঁচে ফেলে তৈরী করা হল এক নতুন গীতধারা। সে সময়ের অধিকাংশ শ্রোতাদের কাছে রাগপ্রধান গান হয়ে উঠেছিল রাগ সংগীতের চেয়েও বেশি জনপ্রিয়। কাব্যগীতির তীর্থস্থান বাংলায় যতই সুরের মায়াজাল বিছানো হোক না কেন শিল্পীমনে সাধক হৃদয়ে ভাবের আবেদন চিরকালই রয়ে যাবে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ রাগ সংগীতের সবকিছু গ্রহণ করলেও ভাষাগত দিক দিয়ে কাব্য পিপাসুই রয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দি ভাষায় মনের ভাব প্রকাশে ব্যর্থ বাঙ্গালির রাগ সংগীতের চর্চার নতুন দুয়ার খোলে রাগপ্রধান বাংলাগান।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সংগীত ও কবিতা শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন -

> আমাদের ভাষা প্রকাশের দুটি উপকরণ আছে-কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমনকি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাব প্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দেই ও সংগীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দেই।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন-

> সংগীত সুরের রাগ রাগিনী নয়, ভাবের রাগ রাগিনী। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন রাগ রাগিনী রচনা করা হইত, যখন আমাদের রাগ রাগিনীর ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল। তখন স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগ রাগিনী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সংগীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা।[১৪]

সংগীত ও ভাব - সংগীত ভাব প্রকাশের এমনই এক অনন্য মাধ্যম যা ভাষাকেও হার মানায়। পৃথিবী ব্যাপী ভাবের আদান প্রদানের জন্য, যোগাযোগের জন্য হাজার হাজার ভাষা প্রচলিত। কিন্তু সংগীত হল সার্বজনীন ভাব প্রকাশের ভাষা। এতে কথা না থাকলেও সুরের মাধ্যমেই শ্রোতা সমাজের চিত্তকে হরণ করতে সক্ষম। এই জন্য সংগীতকে বলা হয় ভাবের ভাষা। ভারতীয় অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সংগীতের প্রচলন। তন্মধ্যে বাংলাদেশের সংগীতে ভাবের

---

[১৩]শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা*(কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্স, ১৯৭২) পৃ ৩৪

[১৪]অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলাগানের পথচলা*(কলকাতা: আজকাল পাবলিশার্স, ২০১৪) পৃ ১০

আদান প্রদান হয় সবচেয়ে বেশি। কেননা বাংলাগানে কথার গুরুত্ব অধিক। তার অর্থ এই নয় যে এখানে সুরের কোনো গুরুত্ব নেই। এখানে কথা ও সুরের মিশ্রণ হয়েছে বিশেষভাবে। রাগপ্রধান বাংলাগানের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মনের যাবতীয় ভাব প্রকাশের জন্য বাংলাগানে রয়েছে অজস্র উপাদান। রাগপ্রধান বাংলাগানে সব উপাদান থাকলেও সেখানে রাগ ভাবই মুখ্য। ভাব প্রকাশের জন্য কথা, সুর দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। ১২৮৮ সালে প্রকাশিত 'সংগীত ও ভাব' এবং 'সংগীত ও কবিতা' নামে দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে-

> ভারতীয় সংগীতে কবিতার মত বিচিত্র ভাবের লীলাময়, ছায়া লোকময় পরিবর্তনশীল রূপ দেখা য়ায় না। কবিতায় বায়ূর ন্যায় সূক্ষ্ম এবং পাথরের ন্যায় স্থুল ভাব সকল প্রকাশ করা যেমন সহজ হয়েছে গানে তা হয়নি। কবিতার মত চলনশীল বা গতিশীল ভাবের গান আমাদের দেশের রাগ রাগিনীর সাহায্যে রচিত হয় না। ভারতীয় সংগীত একটি স্থায়ী ভাবেরই মাত্র ব্যাখ্যা করে।[১৫]

রাগপ্রধান বাংলাগানের ভাষা- রাগপ্রধান বাংলাগান আবির্ভাবের পূর্বে প্রচলিত রাগভিত্তিক বাংলাগানের ভাষাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গানগুলোতে রাধাকৃষ্ণ, যমুনা, প্রেম, বিরহ, দিবস, রজনী, কুঞ্জ, সখী, শ্যাম ইত্যাদি শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে। গানের ভাষায় সাধু ভাষার আধিক্য, গানের ভাবে আধিত্মবাদ, প্রেম, বিরহ ইত্যাদির সমাগম। কিন্তু রাগপ্রধান বাংলাগানে প্রথমদিকে সাধু ভাষার প্রচলন হলেও ধীরে ধীরে চলিত ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট আধুনিকতা লক্ষ্য করা যায়। মূলত তৎকালীন আধুনিক গানের ভাষাগুলোই রাগপ্রধান গানে ব্যবহার শুরু হল। যেমন- জোছনা করেছে আড়ি, কোয়েলিয়া গান থামা এবার। আধুনিক কাব্য লেখনী, প্রমীত শব্দ চয়ন আর রাগের সুললিত বুনন এগুলোর ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রায় আমরা শাস্ত্রীয় নিয়ম ও গৎ বাঁধা শব্দের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পেলাম রাগপ্রধান বাংলাগান। শুধুমাত্র রাগের ব্যবহার ও বাংলা কাব্যগীতকে আশ্রয় করেই যে রাগপ্রধান বাংলাগান শ্রোতার মন জয় করেছে তা নয়। এর জনপ্রিয়তার পেছনে রয়েছে পরিবেশন রীতি। রাগপ্রধান বাংলাগানের পরিবেশন রীতিও বিশেষ। হিন্দুস্থানী রীতিতে বাংলা কাব্যগীতি গাইবার জন্য বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন যা সব শিল্পীর থাকে না। রাগপ্রধান গান গাইবার জন্য শিল্পীকে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিনীর উপর বিশেষ দক্ষ হতে হবে, পাশাপাশি বাংলাগান সম্পর্কেও ধারণা থাকতে হবে। হিন্দুস্থানী রাগ জানেন কিন্তু বাংলাগান জানেন না এমন শিল্পী রাগপ্রধান গানের প্রকৃত রসাস্বাদন করতে পারবেন না। আবার আধুনিক বাংলাগান করেন অথচ রাগ-রাগিনী সম্পর্কে জ্ঞাত নন তিনি এই গানে রাগভাব সঠিক ভাবে প্রকাশ করতে পারবেন না। অর্থাৎ রাগপ্রধান গানের গায়কীও গুরুত্ব বহন করে। একই বিষয় শ্রোতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রাগপ্রধান বাংলাগানের সমঝদার শ্রোতা হতে হলে রাগসংগীত ও বাংলাগান দুই শাখাতেই দক্ষতা থাকতে হবে।

---

[১৫]শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা*(কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্স, ১৯৭২) পৃ ৪৭

৪.১ শাস্ত্রীয় রাগের সাথে রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগের স্বরূপ বিশ্লেষণ

বাংলাগানে রাগরূপ বিশ্লেষণের জন্য শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিনীর সাথে তুলনামূলক ভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কেননা হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনীসমূহ যেভাবে শাস্ত্রীয় সংগীতে নিয়ম মেনে গাওয়া হয় রাগপ্রধান বাংলাগানে তা কতখানি এবং কি রূপে মানা হয় তা উল্লেখ পূর্বক রাগের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য রাগপ্রধান বাংলাগান, প্রাচীন বাংলাগান এবং বাংলার পঞ্চগীতি কবিদের রচিত রাগাশ্রিত গানগুলোর রাগরূপ হিন্দুস্থানী রাগের সাথে পাশাপাশি আলোচনা করা হয়েছে।

বিংশ শতকের রাগপ্রধান বাংলা গানগুলির মধ্যে অন্যতম জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথা ও সুরে বেগম আখতারের বিখ্যাত গান পিয়া ভোল অভিমান গানটি পিলুরাগ ও দাদরা তালে নিবদ্ধ। ঠুমরী অংগের গানটিতে পিলু রাগরূপ খুব সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে।

রাগঃ পিলু।

ঠাটঃ কাফী।

আরোহী : ন্ স, জ্ঞ র জ্ঞ, ম পদ প, ণ ধ প, র্স।

অবরোহী : র্স ণ ধ প, ম জ্ঞ ন্ স।

পকড় : ন্ স জ্ঞ, ন স, প্ দ্ স।

গায়ন সময় : দিনের তৃতীয় প্রহর।

বাদী : কোমল গান্ধার।

সমবদী : শুদ্ধ নিষাদ।

রাগের বৈশিষ্ট্য : এই রাগে ভীমপলশ্রী, ভৈরবী, ও গৌরী এই তিনরাগের মিশ্রণ রয়েছে। এই রাগে খেয়াল গান খুব একটা গাওয়া হয়না, বরং ঠুমরী, দাদরা ও টপ্পা গাওয়া হয়। এই রাগে ১২টি স্বরের ব্যবহার রয়েছে।

ন্যাস স্বর : জ্ঞ ও প।

প্রকৃতি : ক্ষুদ্র।

রস : শৃংগার।

অঙ্গ : পূর্বাঙ্গ।

জাতি : সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।

গান : পিয়া ভোল অভিমান

মধু রাতি বয়ে যায়।

কেন আখিঁ ছল ছল

ওগো কথা কিছু বল

দূরে থাকা কি গো সাজে

মায়া ভরা জোছনায়।

গানটির রেকর্ড নং- 7EPE 3006 এতে লেখা Bengali Classical Song হলেও গানটি বিখ্যাত রাগপ্রধান গানের মাঝে স্থান করে নিয়েছে। বেগম আখতার বিংশ শতকের নামকরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী এবং তার উপাধি ছিল মালিকা-ই গজল। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথা ও সুরে একই রেকর্ডে আরো একটি গান রয়েছে - কোয়েলিয়া গান থামা এবার (রাগঃ পিলু)। এই গান দুটি এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। জ্ঞানবাবুর সুরের বুনিয়াদে বেগম আখতারের দরদভরা কণ্ঠে প্রেয়সীর অভিমান ভাঙ্গানোর আকুতি কি অদ্ভুত মায়াজালের সৃষ্টি করেছে।

জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামীর গাওয়া 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়' অত্যন্ত হৃদয় স্পর্শী রাগপ্রধান গানটির (রেকর্ড নং B-7264)রেকর্ডের লেবেলে সুরকার গীতিকারের নাম পাওয়া না গেলেও পরবর্তীকালে জানা যায় গানটির গীতিকার ও সুরকার কাজী নজরুল ইসলাম। পুত্র শোকে কাতর কবি এ গানের মধ্য দিয়ে কষ্টের কথাটি জানিয়েছেন। অন্যদিকে জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামীও তাঁর মন প্রাণ ঢেলে গানটি গেয়েছেন। গানের রাগ- ছায়ানট, তাল- জলদ একতাল। শাস্ত্রীয় ছায়ানট রাগের রাগরূপ হল-

ঠাট - কল্যাণ

আরোহী - স র গ ম প ন ধ র্স

অবরোহী - র্স ন ধ প, ক্ষ প ধ প, গ ম র স

পকড় - প র, গ ম প, ম গ, ম র স।

বাদী স্বর - পঞ্চম

সমবাদী স্বর - রেখাব

গায়ন সময় - রাত্রির প্রথম প্রহর

অংগ - পূর্বাঙ্গ

জাতি - সম্পূর্ণ- সম্পূর্ণ

প্রকৃতি - শান্ত

ন্যাস স্বর - র,প

রাগের বৈশিষ্ট্য - উভয় মধ্যম (শুদ্ধ ও কড়ি) এবং বাকি সব স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। আরোহে শুদ্ধ মধ্যম এবং কেবল অবরোহে তীব্র/কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়। হামীর, কামোদ প্রভৃতি রাগের ন্যায় অবরোহে অল্প কোমল নিষাদ বিবাদী স্বররূপে ব্যবহৃত হয়। অনেকের মতে, ছায়া ও নট রাগের মিশ্রণে এই রাগের সৃষ্টি হয়েছে।

গান:

শূণ্য এ বুকে পাখি মোর আয়,
ফিরে আয় ফিরে আয়।
তোরে না হেরিয়ে সকালের ফুল অকালে ঝরিয়া যায়।
তুই নাই বলে ওরে উন্মাদ!
পাণ্ডুর হল আকাশের চাঁদ,
গিরি নদী জল করুণ বিষাদ,
তোকে আয় তীরে আয়॥
গগণে মেলিয়ে শতশত কর
খোঁজে তোরে তরু তরে সুন্দর!
তোর তরে বনে উঠিয়াছে ঝড়
লুটায় লতা ধূলায়।
তুই ফিরে এলে, ওরে চঞ্চল!
আবার ফুটিবে বনে ফুলদল,
ধূসর আকাশ হইবে সুনীল
তোর চোখের চাওয়ায় ॥

স্বরলিপি:

I I	{ধ	-া	র্সণ	।	ধপ	প	প	।	প	পক্ষ্ম	ধপ	।	ক্ষ-পর	র	-া	I
	শূ	ন	ন্য		এ	বু	কে		পা	খী	মো০		০র	আ	য়	

I র গ ^{গ}র । -া: -গ: মপ । ^{প}ম -া ^{ম}-গ । ^{মগ}-া ^{গ}-র -স I

ফি রে আ ০ য়্ ফিরে আ ০ ০ ০ ০ য়্

I -া সস ^{স}ম । র ওস স । -া ন্স ^{ণ}ধ্ । ^{স}-ণ্: ^{ণ}ধ্প্: -া I

০ তোরে না হে রি০ য়া ০ সকা লে র্ ফু০ ল্

I প্ প্র র । র ও র । গর ^{র}গগ ^{গ}-মম । ^{ম}-পপ ^{প}-ধধ -ধণ I

অ কা০ লে ঝ ডর য়া যা০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০য়্

I ধ -া ^{র্স}ণ । ^{ধ}প ঈ প । া া প । ক্ষ ধপ ^{প}-ম I

শূ ন ন্য এ ড়ু কে ০ ০ পা খী মো০ ০

I ^{ম}-গ -রগ -মধ । -প ^{প}-ম গ । -রগ -মগ ^{গ}-র । -স -া -া II

০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ র ০ ০

II {প -া পন: । -ধ ^{ধ}ন ন । -া নর্স নর্স । -ন ^{র্স}র্স -া I

তু ই না০ ই ব’ লে ০ ওরে উ ন্ মা দ্

I নর্স -ধ: ন: । র্স র্স নর্সর্রর্স । র্স ন র্সনধ । া ণণধ -প} I

পা০ ন্ ডু ও ঘ ল০০০ আ কা শে০০ র্ চাঁ০০ দ্

I I -া মগ ম । ম্প প -া । ধ ধ র্সণ । ধ প -া I

০ কেঁদে ন দী জ ল্ ক রু ণ০ বি ষা দ্

I র রণ ণ্ধ । -প প প । গর র্-গগ গ্-মম । ম্-পপ প-ধধ -ধণ I

ডা কে০ আ য়্ ফি রে আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০য়্

[পস]

I {স ন্স স । সম: গ ম । ম প প । প প -া I

গ গ নে মে০ লি য়া শ ত শ ত ক র

I ধ ধ র্সণ । ধ: ধ্প: প । -া মপ ধপ । -ক্ষপম ম্গ -া I

খো জে তো০ রে ত রু ০ ওরে সু০ ০০ন্ দ র্

I রগ র র । গ মধ প । ম গা ঁম । র গ -া I

তো০ র্ ত রে ব০ নে উ ঠি য়া০ ছে ঝ ড়

I স সগ -র । -া গম প । ক্ষপ -া -মগ । -গ -ম -গমপ I

লু টা০ য়্ ০ লতা ধূ লা০ ০ ০০ ০ ০ ০০য়্

[র্সপ]

I {প -া পন । ধ ন ন । -া নর্স র্স । -া নর্স -া} I

তু ই ফি০ রে এ লে ০ ওরে চন্ ০ চ০ ল্

I -া র্সননঃ -ধঃ । ন র্স নর্র । র্স ন র্সর্সন । নধ ধণঃ -ধপঃ I

০ আবা র ফু টি বে০ ব নে ফু০০ ল০ দ০ ০ল্

I মম -গ -প । প ঈ -া । পধ -া র্সণ । ধ ধক্ষপ -র I

ধূস ০ র্ আ কা শ্ হই ০ বে সু নী০ ল্

I র -ণ ধ । ধপ -া প । গর রগগ পমম । মপপ পধধ -ধণ IIII

তো র চো০ খে র্ চাও য়া০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০য়[১৬]

ছায়ানট শান্ত প্রকৃতির রাগ। রাগের চলন গানের বাণী সাথে লতার মত বেয়ে উঠেছে। বিশেষ করে, স্থায়ীর দ্বিতীয় চরণে 'ফিরে আয়' কথাটির সুরে অসম্ভব সুন্দরভাবে ছায়ানট রাগরূপ: ম-া-গমগ-| -রগর-স-া প্রকাশ পেয়েছে। এই রাগে আরোহে নি এবং অবরোহে গ বক্রভাবে প্রয়োগ করা হয়। গানের স্বরলিপিতে দেখা যায়, 'তুই নাই বলে ওরে উন্মাদ' অংশে নিষাদ বক্রভাবে লেগেছে। রাগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শুদ্ধ মধ্যম অপেক্ষা তীব্র মধ্যমে প্রভাব প্রবল। পুরো গানটিতে ছায়ানট রাগের সম্পূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায়।

জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামীর আরেকটি গান 'একি তন্দ্রা বিজরিত আঁখিপাত' এ মালকোষ রাগ ব্যবহার করা হয়েছে। ত্রিতালে নিবদ্ধ গানটির সুরকার ও গীতিকার কাজী নজরুল ইসলামের নাম শোনা যায়। গানটি খেয়াল অঙ্গের রাগ প্রধান গান এবং মালকোষ রাগের সম্পূর্ণ রূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে। এ রকম আরো বেশকিছু গানের উল্লেখ করা হল যেখানে শুদ্ধ রাগ রূপ-প্রয়োগ করে বাংলা কথার আবেদনে গড়ে উঠেছে অভিজাত রাগপ্রধান গান।

---

[১৬]আসাদুল হক, *নজরুল-সংগীত স্বরলিপি*(ঢাকা: নজরুল ইনষ্টিটিউট, ২০১১) ১১৬-১১৮

১। ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দ দুলাল- ভজন গীত। রাগ: নটমল্লার।

গীতিকার: তুলসী লাহিড়ী।

২। চিরসুন্দর নওল কিশোর- ভজন গীত। রাগ: ভৈঁরো।

গীতিকার: তুলসী লাহিড়ী।

৩। যাহা কিছু মম- টপ্পা অঙ্গ। রাগ: সিন্ধু কাফী

সুরকার: কাজী নজরুল ইসলাম।

৪। শ্মশানে জাগিছে শ্যামা- বাংলা শ্যামা সংগীত। রাগ: কৌশিক

গীতিকার ও সুরকার: কাজী নজরুল ইসলাম।

ভীষ্মদেবের গাওয়া গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- "যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা, আমারে ভুলিও প্রিয়।" গানটি কাফী ভৈরবী রাগে রচিত ত্রিতালে নিবদ্ধ বিখ্যাত রাগ প্রধান গান। খেয়াল অঙ্গধর্মী গানটিতে হিন্দুস্থানী খেয়ালের ঢং কম, বাংলাগানের ভাবই বেশী ফুটে উঠেছে। গানটির গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য। গানটি রেকর্ডে Bengali Classical হিসেবে লেখা হলেও এতে তান, সরগমের অপ্রয়োজনীয় প্রয়োগ নেই। ভীষ্মদেবের উল্লেখযোগ্য রাগ প্রধান গান গুলি হল-

১। ফুলেরি দিন হল যে অবসান- রাগ: জয়জয়ন্তী

২। জাগো অলোক লগনে- রাগ : রামকেলী

৩। নবারুন রাগে তুমি সাথী গো - রাগ : ভৈরবী

৪। তব লাগি ব্যাথা ওঠে গো কুসুমি - রাগ : দেশী টোড়ী।

'শেষের গানটি ছিল তোমারি লাগি' গজল অঙ্গের গানটি বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাংলাগান গুলোর একটি। গানটির গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য। 'রাগপ্রধান বাংলা গান'এই নামে খ্যাত হয়ে ওঠার অনেক আগে থেকেই কলকাতা ও ঢাকায় হিন্দুস্থানী রাগে বাংলাগানের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল। জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী ও ভীষ্মদেবের পর এই ধারায় আসেন তারাপদ চক্রবর্তী। বাহার রাগে তারাপদ চক্রবর্তীর বিখ্যাত রাগপ্রধান গান 'বনে বনে পাপিয়া বোলে' গানটিকে বাংলা খেয়াল বললেও ভুল হবে না।

বাহার রাগের রাগরূপ হল-

ঠাট : কাফী

আরোহী : ন্ স জ্ঞ ম প, জ্ঞম, ধ ন র্স।

অবরোহী : র্স ণ প ম প, জ্ঞ ম র স।

পকড় : ম প জ্ঞ ম, ধ ন র্স।

বাদী স্বর : মধ্যম।

সমবাদী স্বর : সমবাদী

জাতি : ষাড়ব-ষাড়ব।

অঙ্গ : উত্তরাঙ্গ

প্রকৃতি : চঞ্চল।

ন্যাস স্বর : স, ম ও প

বিশেষ বৈশিষ্ট্য : এই রাগে আরোহে ঋষভ ও অবরোহে ধৈবত বর্জিত। সাধারণত এই রাগে বসন্ত ঋতুর বর্ণনা থাকে। এতে মধ্যম ও ধৈবতের স্বর সংগতি অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ।

গান ঃ

বনে বনে পাপিয়া বোলে

কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জরে অলি কুসুমি

নীল নলিনী দোলে।

বিদুষীত রায়ে বন বীথিকায়

ঘুমায় কুলায় সুখ শারি মুখ লুকায়ে

কাঁদিম রাতে বিমল প্রভাতে
কে গো দক্ষিণ দ্বার খোললে।

স্বরলিপিঃ

I I									ন	র্স	ই	প	ম	প	মজ্ঞ	এ	I
									ব	নে	ব	নে	পা	পি	য়া০	০	
I	ণ	া	া	ন	র্স	া	া	নর্স	(স)	া	ই	ন	া	প	পম	মপ	I
	বো	০	০	লে	০	০	০	০	কু	ন্	জে	কু	ন	জে	গু০	০ন	
	জ্ঞ	া	জ্ঞ	এ	র	র	গ	া	জ্ঞ	া	জ্ঞ	জ্ঞ	ম	ম	ম	ধ	I
	জ	রে	অ	লি	কু	সু	মি	০	নী	০	ল	ন	লি	নী	ন	লি	
	র্স	নর্জ্ঞ	রজ্ঞ	গর	নর্স	া	া	া	মজ্ঞম	ন	নধ	ন	ন	া	ধ	ন	I
	নী	দো০	০০	লে০	০	০	০	০	বি	০০	দু	ষিত	বা	০	য়ে	০	
I	-	গগ	র্স	র্স	র্স	া	র্স	া	র্স	র্মর্জ্ঞ	া	র্মর্জ্ঞ	ম	া	র্র	র্স	I
	০	বন	বি	থী	কা	০	য়ে	০	ঘু	মায়	০	কু	লা	য়	সু	খ	
I	ন	র্সন	র্স	া	ণ	া	প	া	(র্স)	া	ণ	প	পম	ধপ	ম	গ	I
	শারি	মু	০খ	০	লু	কা	য়ে	০	কাঁ	০	দি	ম	রা	০	তে	০	

I	জ্ঞ	জ্ঞ	জ্ঞ	ম	র	া	গ	া	ঁজ্ঞ	া	ঠ	জ্ঞ	ম	ন	ধ	ধণ	I
	বি	ম	ল	প্র	ভা	০	তে	০	কে	০	গো	দ	ক্ষি	ণ	দ্বা	র০		
I		র্স	ণ	ণধ	ধনর্স	া	া	া									I I I I	
		খো	০	০ল	লে০০	০	০	০										

আলোচ্য গানটিতে মধ্যম ও ধৈবত স্বরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার দেখানো হয়েছে। 'বোলে' 'নীল নলিনী' 'বিদুষিত বায়ে' ইত্যাদি স্থানে 'মধ' স্বর সংগীত বারবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'কাদিম রাতে বিমল' প্রভাতে এই স্থানে বাহার রাগের রূপই প্রকাশ পেয়েছে। গানটি যেহেতু বাংলা খেয়ালের মত করেও গাওয়া যায় তাই এই গানে প্রচুর বিস্তার, বোল-তান, সরগম করার সুযোগ রয়েছে। খেয়ালের ঢং এ না গাইলে গানটিকে আর দশটা সাধারণ আধুনিক গানের মতই শোনাবে হয়ত সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাগপ্রধান গানে শুধু রাগালাপ করলেই হবে না। এতে রাগ সংগীতের ন্যায় গায়কীরও প্রয়োজন রয়েছে।

'একি তন্দ্রা বিজরিত আঁখি পাত' গানটি মালকোষ প্রকৃষ্ট খেয়াল অঙ্গের রাগপ্রধান গান। গানটির শুরুতে আলাপ দ্বারা মালকোষ রাগরূপ দেখিয়ে গানের স্থায়ী অংশে প্রবেশ করলে এক অপূর্ব সুর মায়াজাল সৃষ্টি হয়। কেননা ত্রিতালে গানটির স্থায়ী অংশে মালকোষ রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির একপ্রকার ছন্দ বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। যা অনেকটা খেয়াল গানের স্থায়ী অংশের মত। কিন্তু এই গানে বাংলাগানের বৈশিষ্ট্যও ধরে রাখা হয়েছে। খেয়াল গানের মত তান সরগম শেষে গানটিকে একটি সার্থক রাগপ্রধান বাংলাগান বলা যেতে পারে।

মালকোষ রাগের বিবরণ উল্লেখ করা হল:

ঠাট : ভৈরবী

আরোহী : স জ্ঞ ম দ ণ র্স

অবরোহী : র্স ণ দ ম, জ্ঞ ম জ্ঞ স

পকড় : ম জ্ঞ, ম দ ন দ, ম জ্ঞ স

জাতি : ঔড়ব-ঔড়ব

বাদী স্বর : মধ্যম

সমবাদী স্বর : ষড়জ

অঙ্গ : উত্তরাঙ্গ

প্রকৃতি : গম্ভীর

ন্যাস স্বর : জ্ঞ, ম, দ

বৈশিষ্ট্য : এই রাগে রেখাব ও পঞ্চম বর্জিত। রাগের গায়ন সময় রাত্রি ৩য় প্রহর। এই রাগে গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ ব্যবহৃত হয় এবং বাকি সব স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়।

গান: এ কি তন্দ্র বিজারিত আঁখিপাত

একি স্বপন ঘোর মোর দিবস রাত ॥

কুহকিনী দয়া বঁধূয়া যাদু জানে

স্বপন আনে যেন তার মালা টানে

চলে অকুলোচিত তাহারই সাথ ॥

স্বরলিপি

+	৩	০	২
I I	{ম জ্ঞস	গম জ্ঞম জ্ঞ স	(স) া ণদ ণ I

							এ	কিo	তন	oo	oদ্রা	বি	জ	o	রিo	ত	
I	জ্জস	।	ম	।	।	।}	দম	মজ্জ	।	জ্জ	মদ	ণ	র্সর্স	ণ	র্জ্জ	র্স	I
	আঁ	o	খি	পা	o	ত	এo	কিo	-	স্ব	পন	ঘো	oo	র	মো	র	
I	ণদ	দণ	দম	এ	।	।	(ম	জ্জস)									I
	দিo	বo	সo	রা	o	ত											
I									-	মজ্জম	দ	ণ	র্স	।	।	।	I
									-	কুoহ	কি	ণী	দ	য়া	ব	ধূ	
I	ণর্স	ণ	দ	দ	ণদ	দণ	দণর্জ্জ	র্স	-	ণ	।	।	।	।	দ	ণ	I
	য়া	o	o	জা	দুo	oo	জানে	o	-	স্ব	পন	আ	o	নে	যে	ন	
I	।	দণ	দণ	র্জ্জ	র্স	ণর্স	দণ	দম	-	দণ	র্স	র্মর্জ্জ	মর্জ্জ	জ্জর্স	র্স	ণ	I
	o	তাo	oর	মালা	টা	oo	oo	নেo	-	চলে	আ	কুo	লo	oo	চি	ত	
I		ণণ	দদ	দণ	।	দম	ম	জ্জস									IIII
		তাo	হারই	সাo	o	হাo	(এ	কিo)									

উপরোক্ত গানটিতে অসংখ্যা মীড়ের কাজ এবং গমকযুক্ত স্বরবিন্যাস এক প্রকার গুরুগাম্ভীর্যময় সুর সৃষ্টি করে মালকোষ রাগবৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখেছে। এমনিতেই স জ্জ ম দ ণ এই স্বর সমন্বয় সুমিষ্ট আবহ সৃষ্টি করে তবুও মালকোষ রাগের বিশেষ স্বরসংগতি মজ্জমজ্জ, মদণদমজ্জ ইত্যাদি বারবার দেখানোর ফলে এই গানটি শ্রোতাদের হৃদয়ে যথেষ্ট ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে পারে। খেয়াল অঙ্গধর্মী হওয়ার কারণে আলাপ বিস্তার, তান সরগম গানটিতে ভিন্নমাত্রা এনে দেয়।

প্রাচীন বাংলা গানে রাগের ব্যবহার

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রাচীন বাংলা গানের রাগের ব্যবহার স্বরলিপি সহ দেখানো হলো:

রচয়িতা : দাশরথি রায়

রাগ : খাম্বাজ; আড়াঠেকা (মধ্যলয়)

গান : ননদিনী, বোলে নগরে-সবারে-

ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।

আমার কাজ কি গো কুল, কাজ কি গোকূল,

ব্রজকুল সব হোক প্রতিকূল,

আমি তো সঁপেছি গো কুল -অকূল-কান্ডারী করে॥

আমার কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে,

কাজ কেবল সেই পীতবাসে,

সে থাকে যার হৃদয় বাসে, সে কি বাসে বাস করে॥

স্বরলিপি

	১	২	০	৩	
I	{গ গ	ম গ া া	গ গম পম গ	^{র}গ া ম প	I
	ন ন	দি নী ০ ০	বো লো০ ০০ ০	০ ০ ন গ	
I	^{ম}প া া া	া া া া	গ ম প গ	া া া া	I
	রে ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	স বা রে ০	০ ০ ০ ০	
I	গ ম | া া গমা পধ	ধপ মগ া া	মপ পম গর গম	মগ রস া া	I
	স বা ০ ০ রে০ ০০	০০ ০০ ০ ০	০০ ০০ ০০ ০০	০০ ০০ ০ ০	
I	া া} ধ ধ	ণ ধ া া	া া ম া	পধ ণর্স র্সণ ধ	I
	০ ০ ডু ব	ছে রা ০ ০	০ ই রা জ	ণ০ ০০ ০ন দি	
I	প া া া	া া গ ম	পধ ণর্স পণ ^{ণ}ধপ	ম গ া া	I

<table>
<tr><td></td><td>নী ০ ০ ০</td><td>০ ০ কৃ ষ্</td><td>ণ০ ০০ ক০ ০০</td><td>ল ঙ্ক ০ ০</td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>া া} ধ ধ</td><td>গম পধ ধপ মগ</td><td>মপ পম গর গম</td><td>মগ রস া া</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>০ ০ সা গ</td><td>রে০ ০০ ০০ ০০</td><td>০০ ০০ ০০ ০০</td><td>০০ ০০ ০ ০</td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>{ ম ম</td><td>ম া ম ম</td><td>ধণ র্সণ ধপ ধ</td><td>া ণ া র্স</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>আ মার</td><td>কা জ কি গো</td><td>কু০ ০০ ০০ ০</td><td>ল কা জ কি</td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>ন র্স া া</td><td>ন ন র্স া</td><td>ন া া া</td><td>নর্স র রস ন</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>গো ক ০ ল</td><td>ব্র জ কু ল</td><td>স ০ ০ ব</td><td>হো ০ ০ ০</td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>ধ া ধ ধন</td><td>র্স ন ধ র্সণ</td><td>া ধ প া</td><td>পধ ণধ পম গম</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>০ ক প্র তি</td><td>০ ০ ০ ০</td><td>০ ০ কু ০</td><td>০০ ০০ ০০ ০০</td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>ধ প ধ ণ</td><td>ধ া া া</td><td>া া ম ম</td><td>পধ নর্স র্সণ ধ</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>০ ল আ মি</td><td>তো ০ ০ ০</td><td>০ ০ সঁ পে</td><td>ছি০ ০০ ০০ গো</td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>প া া া</td><td>া া গ পধ</td><td>ন ধ প ম</td><td>গ া গ া</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>কু ০ ০ ০</td><td>০ ল্ অ কূ০</td><td>০ ০ ০ ল</td><td>০ ০ কা ন্</td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>গ ম া র</td><td>গম পধ ধপ মগ</td><td>মপ পম গর গম</td><td>মগ রস া া | া া</td><td>I
I</td></tr>
<tr><td></td><td>ডা রী ০ ক</td><td>রে০ ০০ ০০ ০০</td><td>০০ ০০ ০০ ০০</td><td>০০ ০০ ০ ০ ০ ০</td><td></td></tr>
<tr><td>I I</td><td>ম ম</td><td>ম া ম ম</td><td>ধন র্সণ ধপ ধ</td><td>া ণ া র্স</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>আ মার</td><td>কা জ কি গো</td><td>কু০ ০০ ০০ ০</td><td>ল কা জ কি</td><td></td></tr>
</table>

I	ন র্স া া	া ণ া র্স	ন র্স ন া	া া ন নর্স	I
	বা সে ০ ০	০ কা জ কে	ব ল্ সে ০	০ ই পী ত০	
I	র্র র্স ন দ	া া ধণ র্সন	ধ র্স র্ণ ধ	প া া া	I
	০ ০ ০ ০	০০ বা০ ০০	০ ০ ০ ০	সে ০ ০ ০	
I	পধ নধ পম গম	ধ প া া	া া ধ া	ধ ণ ধ া	I
	০০ ০০ ০০ ০০	০ ০ ০ ০	০ ০ সে ০	থা কে যা ০	
I	া া ম া	পধ ণর্স সণ ধ	প া প পধ	ণ ণধ প ম	I
	০ র হ্ ০	দ ০ ০০ ০য় বা	সে ০ সে ০কি	০ ০০ ০ বা	
I	গ গ ম র	গম পধ ধপ মগ	মপ পম গর গম	মগ রস া া | ।।	
	সে বা স্ ক	রে০ ০০ ০০ ০০	০০ ০০ ০০ ০০	০০ ০০ ০ ০ ০০[১৭]	

দাশরথি রায়ের এই গানটিতে খাম্বাজের রাগরূপ খুবই স্পষ্ট। খাম্বাজ রাগটি সাধারণত প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাই এই রাগে খেয়াল গাওয়া হয় না। টপ্পা, ঠুমরী, দাদরা ইত্যাদি বেশী শোনা যায়। তবুও এই গানে আধ্যাত্মিকতার ভাব খাম্বাজের চলনে খুবই রসব্যঞ্জকভাবে ফুটে উঠেছে। খাম্বাজের বিশেষ স্বর সংগতি হল 'মগরস" 'গমণধ", 'মপধমগ", 'গমধনর্স" যা বারবার দেখানোর ফলে গানের ভাবের সাথে রাগভাবের সুগভীর সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। যেমন: ডুবেছে রাই রাজ নন্দিনী এই অংশেই খাম্বাজের সম্পূর্ণ রাগরূপ ফুটে উঠেছে। এছাড়াও খাম্বাজের বিশেষ

[১৭]ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*(ঢাকা: প্যাপিরাস পাবলিকেশন, ২০০৫) পৃ ১২৭-১২৯

বৈশিষ্ট্য, আরোহে পঞ্চমকে বক্রভাবে প্রয়োগ করা যা এই গানে দুটি স্থানে দেখানো হয়েছে। যেমন: ণ্ধ, মপধ, মগ। এই স্বর সম্পূর্ণ খাম্বাজের রূপ। খাম্বাজ রাগের সুরবৈচিত্র্য অনেকাংশে গ, ম, প, নি এই স্বরগুলোর উপর নির্ভর করে। দাশরথী রায়ও খুব সুদক্ষভাবে এই স্বরগুলি দ্বারা রাগের বৈচিত্র্যকে তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন।

রচয়িতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাগ : পরজ, আড় ঠেকা।

গান : কারণ সে যে, তাঁর ধ্যান কর,

তিনি জগতের পিতা মাতা।

হইবে মঙ্গল তাঁহারে সাধিলে জানিলে,

যদি জানিবে, কর সাধু-সঙ্গ একান্তে॥

স্বরলিপি :

৩	১ ‖	২	
I দ প ‖ { ক্ষ া প দ	ন া স া	(া া ক্ষদ নর্স	I
কা০ ০ ০ র ণ	সে ০ যে০	০০ ০০ ০০	
০	১	২	
I র্ঝর্স নর্স দনর্স দপ)}	ন া দ প	ক্ষ গ া গ	I
০০ ০০ ০০০ কা০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ তা	
৩	১	২	
I ক্ষ ণ দপক্ষ া	গ া া স	গঃ ঋঃ ঋ ঋ	I
০ ০ র০০ া	ধ্যা ০ ০ ০	০ ০ ন্ ক	
০	৩	১	

I	স া ন্স গগ	দপক্ষ্ম দ দ র্স	ন া া া	I
	র ০ তিনি জগ	তে০০ র পি তা	মা ০ ০ ০	
	২	০		
I	া া ক্ষ্মদ নর্স	ঋর্স নর্স দনর্স দপ		II
	০ ০ ত০ ০০	০০ ০০ ০০০ “কা”০		
	২	০	৩	
I	া া া া	া া া পক্ষ্ম	দ নর্স ঋর্স র্স	I
	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ হ০	ই বে০ ০০ ম	
	১	২	০	
I	র্স া া া	ন র্স র্স া	া া া ন	I
	ঙ্গ ০ ০ ০	০ ০ ল ০	০ ০ ০ তাঁ	
	৩	১	২	
I	দ ন া া	া া া পক্ষ্ম	দ নর্স ঋর্স র্স	I
	হা রে ০ ০	০ ০ ০ সা০	ধি লে০ ০০ ০	
	০	৩	১	
I	ন া া পক্ষ্ম	দ র্সণ ঋ ন	পক্ষ্ম া গ স	I
	০ ০ ০ ০জা	নি লে০ ০ য	দি০ ০ জা ০	
	২	০	৩	
I	গঃ ঋঃ ঋ া	স া স গগ	পক্ষ্ম দ দ র্স	I
	০ ০ নি ০	বে ০ কর সাধু	স ০ ঙ্গ এ	
	১	২	০	
I	ন া া া	া া ক্ষ্মদ নর্স	ঋর্স নর্স দনর্স দপ	II
	কা ০ ০ ০	০ ন্ তে০ ০০	০০ ০০ ০০০ কা০	

এই গানে ব্যবহৃত রাগ পরজ এবং গানের সুরে ক্ষ্মদনর্স, নদপক্ষ্ম, পক্ষ্মদনর্স ইত্যাদি স্বর সংগতি বারবার প্রয়োগে প্রকৃত রাগরূপ ফুটে উঠেছে। পরজ চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। এই রাগে টপ্পা, ঠুমরী গাওয়া হলেও খুব বেশী গান এই রাগে পাওয়া যায় না। তবে আলোচ্য গানটিতে রাগের লক্ষণগুলি খুব স্পষ্ট। যেমন: এই রাগের আরোহে ঋষভ স্বরটির প্রয়োগ হয় না। অবরোহে কোমল ঋষভ এর ব্যবহার ‘ধ্যান কর”, ‘জানিলে যদি জানিবে” এই অংশে

অর্থপূর্ণভাবে করা হয়েছে। গানের বাণীতে গম্ভীর ভাব এবং সুরে চঞ্চল পরজ রাগরূপের রসায়ন খুব অদ্ভুত রস ব্যঞ্জকতা সৃষ্টি করেছে। স্বরলিপি অনুসারে বোঝা যায় যে, সম্পূর্ণ পরজ রাগের চলনকেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গানের সুর হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

রচয়িতা ঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাগ ঃ কাফী, সুরফাক্তা

গান ঃ দীনহীন ভকতে, নাথ, কর দয়া

অনাথ নাথ তুমি, হৃদয় রাজ বিরাজ

নিশিদিন হৃদিমাঝে॥

তব সহবাস আশে, আনন্দে হৃদয় ভাসে,

তোমা বিনা নিশিদিন মন নাথ ধ্যায়ে॥

স্বরলিপি :

I I	ম্জ্ঞ া র র	র জ্ঞ	স ম প া	I
	দী ০ ন হী	০ ন	ভ ক তে ০	
I	প র্স ণ ধ	প ম	জ্ঞ রজ্ঞ ম প	I
	না ০ থ ক	র দ	য়া ০০ ০ ০	
I	ম জ্ঞ া র	রম জ্ঞ	র সর স া	I
	অ না ০ থ	না০ ০	থ তু০ মি ০	
I	র্স র্স ন স	র্স র্র	র্স ণ া ধ	I
	হৃ দ য় রা	০ জ	বি রা ০ জ	

I	ণ ধ ণ প	ধ প	ম গ ম প	II
	নি শি দি ন	হৃ দি	মা ০ ঝো ০	
II	ঁধ ম প ধ	ন া	ন র্স া র্স	I
	ত০ ব স হ	বা ০	স আ ০শে	
I	র্সন র্স র্র র্জ্ঞ	র্র র্সর্র	র্স ধ র্স নধ	I
	আ০ ০ নন্ দে	হৃ দ০	য়া ভা ০ সে০	
I	প র্স ন র্স	র্সর্র র্স	ণ ণধ পধ ম	I
	তো মা বি না	নি০ শি	দি ন০ ম০ ন	
I	ম ণ ধ ধ	ণ প	ম গ ম প	I I
	ন ০ থ না	০ থ	ধ্যা ০ য়ে ০[১৮]	I I

কাফী রাগ অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি রাগ। টপ্পা, ঠুমরী, দাদরা গানের জন্য এই রাগ বহুল ব্যবহৃত। রাগপ্রধান গানে এই রাগের প্রয়োগ ভিন্ন রকম সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। আলোচ্য গানে অবরোহে শুদ্ধ নিষাদ ব্যবহার করা হয়েছে ('হৃদয় রাজ বিরাজ" অংশে) অনেক ক্ষেত্রে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাফী রাগের জনপ্রিয়তার কারণ এর রাগরূপ অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং শৃংগার রসাত্মক। এই রাগের বিশেষ স্বরসংগতি মপধ মপজ্ঞর, জ্ঞমপ ইত্যাদি আলোচ্য গানে বারবার দেখানো হয়েছে। 'তব সহবাসে আশে" এই অংশের স্বরবিন্যাস সম্পূর্ণভাবে কাফী রাগের চলনকেই নির্দেশ করে এবং রাগের সৌন্দর্যবর্ধক শুদ্ধ নিষাদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'নিশিদিন মননাথ নাথধ্যায়ে" এই চরণের সুরে শুদ্ধ গান্ধারের ব্যবহার কাফী রাগের সৌন্দর্যবর্ধন বৈশিষ্ট্যেরই এক অংশ। তবে একদম গানের শেষে চমকপ্রদভাবে শুদ্ধ গান্ধারের ব্যবহার গানটিকে নতুন রূপ প্রদান করেছে। গানটি বাংলা ধ্রুপদ হিসেবে কাফী রাগরূপের ভেতর দিয়ে ধ্রুপদের ভাবগম্ভীর্যময়তা এবং ধ্রপদী কাব্যভাব বিশিষ্ট বাণী বিন্যাস আধ্যাত্মিকভাবে প্রকাশ করেছে।

[১৮]ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*(ঢাকা: প্যাপিরাস পাবলিকেশন, ২০০৫) পৃ ১৫৬

রচয়িতা : রচয়িতা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাগ : পিলু, দাদরা

গান : ফুলের মধুর গন্ধে আজি ভ্রমর নিকল গাজে

কি বা সুন্দর সুদিন ফাগুন সকল ভুবন সাজে॥

ফুল্ল মন সবার আজি নিরখি কুসুম রাজি

ধন্য ধন্য বিধুর সৃজন অতুল ভাতি রাজে॥

স্বরলিপি

	+	০	+	০	
I I	গ গ স	গ ম প	মগ ম জ্ঞ	র স র	I
	ফু লে র	ম ধু র	গ০ ন্ ধ	আ ০ জি	
I	র ণ ধ	প ধ প	রম পধ মপ	ম জ্ঞ র	I
	ভ্র ম র	নি ক র	গ০ ০০ ০০	জে ০ ০	
I	স র ধ	া ধ ধ	ণ র্স ণ	ধ ণ ধ	I
	কি বা সু	ন্ দ র	সু দি ন	ফা গু ন	
I	প ধ প	ম প ম	রস জ্ঞর স	র া া	I I I I
	স ক ল	ভু ব ন	সা০ ০০ ০	জে ০ ০[১৯]	

এই গানটিতে দুটি গান্ধার এবং দুটি নিষাদের ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই প্রয়োগ বাকি স্বরগুলির সাথে মিশে সুমিষ্ট স্বর সংগতি প্রকাশ করেছে। পিলু ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ, এই রাগে ১২টি স্বরের প্রয়োগ রয়েছে। বিশেষ স্বর

গানটিতেও পিলু রাগের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে। বিশেষ স্বর সংগীত 'মগ মজ্ঞ", 'রমপধমপ", 'রসজ্ঞরস" ইত্যাদি পিলু রাগকেই নির্দেশ করে। বাংলা দাদরা গান হিসেবে এটি গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এর সার্থক সৃষ্টি।

[১৯]ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*(ঢাকা: প্যাপিরাস পাবলিকেশন, ২০০৫) পৃ ১৭২

৪.২ রাগ প্রধান বাংলা গানের নান্দনিকতা এবং সার্থকতা পর্যালোচনা।

রাগপ্রধান বাংলাগান শুধু বিস্ময়কর সৃষ্টিই নয়, বাংলা গানের ইতিহাসে এই গান যুগান্তকারী মাইল ফলক হিসেবে বিকশিত হয়েছে। বাংলাগানের সাথে রাগের রঞ্জকতা মিলিত ভাবে এই গানের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছে অকৃত্রিম রূপে। অভিসন্দর্ভের এই পর্বে রাগপ্রধান বাংলাগানের নান্দনিক দিক সমূহ, অন্যান্য বাংলাগানের ধারা হতে অভিনবত্ব উল্লেখপূর্বক এই গানটি কেন সার্থক তা আলোচনা করা হবে। বাংলাগানের যতই রাগের প্রয়োগ করা হোক না কেন তা রাগপ্রধান বাংলাগান কখনও হতে পারবে না। কারণ বাংলাগানের বৈশিষ্ট্য এবং রাগপ্রধান গানের বৈশিষ্ট্য এক নয়। সে বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

রাগপ্রধান বাংলাগানকে অন্যান্য বাংলা গীতিরীতি থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়েছে যেসব কারণে তার মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হল নান্দনিকতা। নন্দনতত্ত্বের আলোকে রাগপ্রধান বাংলাগানকে বিশ্লেষণ করলে এই গানের উচ্চ শিল্প গুণ অনুভুত হয়। নন্দনতত্ত্ব[২০] বা এসথেটিক্স অর্থ বোধ ও অনুভব। সংগীত হল নান্দনিক এক শিল্প, এই শিল্পের সাহিত্য মূল্য, দর্শন, তত্ত্বগত তাৎপর্য নির্ণয় করার বীক্ষণশাস্ত্র হল নন্দনতত্ত্ব। রাগপ্রধান গানের নান্দনিকতার অর্থ হল রাগপ্রধান গানের সৌন্দর্য অনুসন্ধান। রাগপ্রধান বাংলাগানের নান্দনিকতা বা সৌন্দর্য নিহিত গানের কাব্যিক বাণীতে রাগের প্রয়োগের ভেতর। এতে বাংলাগানের গায়কী ও রাগের শাস্ত্রীয় নিয়মে চলন এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। সাধারণত প্রাচীন বাংলাগান, আধুনিক বাংলাগানে কাব্যের ভারিক্কি চলনই মূল সৌন্দর্যের আঁধার। কিন্তু রাগপ্রধান বাংলাগানে কাব্যের সাথে প্রথাবিহীন রাগের স্বাধীন বিচরণ শ্রোতার মনে এক অভূতপূর্ব রঞ্জকতার উদ্রেক ঘটায়। তাই রাগপ্রধান বাংলাগান সুন্দরের ভেতরেও সুন্দর। এর নান্দনিক দিকের যেন শেষ নেই। রাগ বিস্তারের স্বাধীনতা যতখানি শৈল্পিক লাগে হিন্দুস্থানী রাগ সংগীতে,তার চেয়েও অধিক শৈল্পিক হয়ে ওঠে কাব্যগীতের মাধ্যমে। রাগপ্রধান বাংলাগানের মূল সার্থকতাই এইখানে যে, কথা ও সুরের সবগুলো অংশেই গানের সৌন্দর্য বিচ্ছুরণ ঘটে। হিন্দুস্থানী রাগে শুধু সুরের নান্দনিকতা রয়েছে, কথার গুরুত্ব কম। আবার বাংলা কাব্য সংগীতে কাব্যের অধিকারে সুর কিছুটা ম্লান মনে হতে পারে। কিন্তু রাগপ্রধান বাংলাগানে রাগ ও কাব্যগীত দু'য়ে মিলে মিশে একাকার। রাগপ্রধান গানের সার্থক শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশের মূলে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এর নান্দনিকতা।

---

[২০]নন্দনতত্ত্ব- এই শব্দটি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদ থেকে (নন্দনতত্ত্ব- নন্দন বিষয়ক তত্ত্ব- কর্মধারয় সমাস)। সংস্কৃত ক্রিয়ামূল নন্দ এর ভাবগত অর্থ হল- আনন্দ পাওয়া, আনন্দ দান করা। এর সাথে অন্ (ল্যুট) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নন্দন শব্দের উৎপত্তি। নন্দ+অন্ = নন্দন।

রাগপ্রধান বাংলাগানের নান্দনিক দিকগুলো হল- কাব্যের সৌন্দর্য, রাগের চলনের সৌন্দর্য, রাগ প্রধানের গায়কী ইত্যাদি। সেকোনো সংগীত পরিবেশনের সময় গায়কী বা পরিবেশনরীতি বেশ কঠোরভাবে মানা হয়। রাগপ্রধান বাংলাগানের গায়কী অত্যন্ত চমকপ্রদ। হিন্দুস্থানী ঢং কে সরিয়ে হিন্দুস্থানী রাগ পরিবেশন, তাও আবার বাংলাগানের অবয়বে- এ এক ভিন্ন ধারার গায়কী ছাড়া সম্ভব নয়। গান শুনে মনে হবে, বাংলাগান নয় আবার তা রাগসংগীতও নয়। রাগপ্রধান বাংলাগানকে মূলত আধুনিক বাংলাগান হতে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে এর গায়কীর জন্য। আধুনিক গানে মেজাজের দাপট নেই, রাগপ্রধান বাংলাগানের গায়কীতে মেজাজটাই আসল। এই দিক দিয়েও রাগপ্রধান বাংলাগানকে সার্থক গীতিরীতি বলা যায়।

গীতিকার-সুরকারের সৃষ্টি শিল্পকে অনুভব করে যথাযথভাবে পরিবেশন করে শ্রোতার মনে রস সঞ্চারের মাধ্যমে শিল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে তুলে ধরার প্রয়াসই রাগপ্রধান গানের শিল্প হিসেবে স্বার্থকতা বলে বিবেচিত। সুন্দরের লক্ষণ সমূহ যথা- সামঞ্জস্য, সুমিতি, সৌষম্য, অখণ্ডতা, তথা বস্তুর সামূহিক প্রকাশ যেখানে নেই, সেখানে সুন্দর নেই; এবং সৌন্দর্যের এই অভাববোধকে আমরা বলি অসুন্দর।[২১] সুন্দরের সবকটি লক্ষণই রাগপ্রধান বাংলাগানের মাঝে বিরাজমান। কাজেই রাগপ্রধান বাংলাগান হল 'সুন্দর' শিল্পকর্ম।

---

[২১]সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *নন্দনতত্ত্ব*(ঢাকা: সন্দেশ প্রকাশনী, ১৯৮৫) পৃ ৩৯

৫ম অধ্যায় ঃ রাগপ্রধান বাংলা গানের সুরবৈচিত্র্য

৫.১ গানের বাণীর সাথে সুরের সমন্বয়

৫.২ বাংলাগান রাগাশ্রয়ী গানের মধ্যে পার্থক্য

৫.৩ বাংলাদেশে রাগপ্রধান ও রাগাশ্রয়ী গান চর্চা

রাগপ্রধান বাংলাগানের সুরবৈচিত্র্য

রাগপ্রধান বাংলাগানে ভাবের গুরুত্ব যতখানি, ঠিক ততটাই সুরের দখল না হলে গানটি মনমত হয় না। মানসিক পরিতৃপ্তির জন্যই তো গান। রাগপ্রধান বাংলাগান অন্য কোন গীতধারা অনুসৃত নয়। তাই রাগের চলনে শুধু বাংলা কথা বসিয়েই রাগপ্রধান হয় না। রাগপ্রধান বাংলাগান হতে হলে সুরোপযোগী বাণীতে রাগের আকর্ষণীয় দিককে গেঁথে বসাতে হয়। আবার সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ কথায় রাগ অবয়বকে ফুটিয়ে তুলতে সুরের বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। যে কোন কথায়, যেকোনো রাগে রাগপ্রধান গান হয় না। এই গানের মূল বৈশিষ্ট্যই হল কথার সাথে সুরের সমন্বয়, যেখানে রাগটির সম্পূর্ণ রূপ মেলে সহজেই। রবীন্দ্রনাথের মতে,

> সংগীতের উদ্দেশ্যেই ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ,কানে মিষ্ট শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত দুন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবলমাত্র সুরসমষ্টি, ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহ মাত্র; সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই। কেহ কেহ বলিবেন, তবে কি রাগ-রাগিনী আলাপ নিষিদ্ধ? আমি বলি, তাহা কেন হইবে? রাগ-রাগিনী আলাপ, ভাষাহীন সংগীত। অভিনয়ে, Pantomime যে রূপ, ভাষাহীন অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাব প্রকাশ করা সংগীতে আলাপত্ত সেই রূপ। কিন্তু Pantomime এ যেমন কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গি হইলেই হয় না, যে সকল অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাব প্রকাশ হয়, তাহাই আবশ্যক; আলাপেও সেই রূপ কেবল কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যে সকল সুর বিন্যাস দ্বারা ভাব প্রকাশ হয়, তাহাই আবশ্যক।[১]

বাংলাগান সাধারণভাবে কথা নির্ভর, কথা বস্তুর সুরবদ্ধ রূপ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধ্রুপদী এবং বাংলাগানের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট, শ্রোতাও ভিন্ন। কিন্তু তা এমন নয় যে, এই শ্রোতাদের মধ্যে একটি অংশ অন্যান্য গানের রস উপভোগ করে না। কিন্তু তারা সাংগীতিক রুচি, শিক্ষা এবং এর গুণাগুণ সম্পর্কে মনস্তাত্বিকভাবে ভিন্ন। ধ্রুপদী সংগীতের শিল্পী ও শ্রোতাগণ ধ্রুপদী সংগীত সম্পর্কে দীক্ষিত। অন্যদিকে সাধারণ বাংলাগানের শ্রোতা ও শিল্পী হতে হলে বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের মানুষ ভৌগলিকভাবে সংগীত পিপাসু। রাগপ্রধান বাংলাগানের শিল্পীদের রাগসংগীতের দক্ষতা প্রয়োজন হয় । কিন্তু শ্রোতা হতে গেলে শাস্ত্রীয় সংগীতের উপর দক্ষ-অদক্ষ সকলেই সমানভাবে বিবেচিত। বাংলাগানের রসবোধই সাধারণ শ্রোতাদের রাগপ্রধান বাংলাগানের রসাস্বাদিত করতে সহযোগীতা করে।

---

[১]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীত চিন্তা*(ঢাকা: নবযুগ সংস্করণ, ২০০৭) পৃ ৯

রাগ-রাগিনী মানেই যে ব্যকরণ তা নয়, এর একটি সুন্দর ভাবধর্মী রূপ রয়েছে। রাগপ্রধান বাংলাগানের ক্ষেত্রে রাগের ব্যবহারকে ঠিক ব্যকরণ না বলে 'রাগসূত্র' হিসেবে মানা হয়। সেই সূত্র ধরে গানের সমীকরণ মেলানো হয়। রাগ-রাগিনীর ভাবকে পরিবেশনের সময় জোড় দেয়া হয় রাগপ্রধান বাংলাগানে। যা অন্যান্য রাগধর্মী/ রাগাশ্রয়ী গানে অতোটা প্রকট নয়। এটি রাগপ্রধান বাংলাগানের আরেকটি স্বার্থকতা। এখানে একটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, রাগভাব জিনিসটা আসলে কি? রাগের দশ লক্ষণে রাগের নানা দিক দেখানো হয়েছে, রাগ বিবরণীতে রাগের আদ্যোপান্ত আলোচিত হয়েছে, রাগ গাওয়ার নিয়মে রাগের সূত্র নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু রাগভাব কিভাবে জানা যাবে? রাগভাব হল অনুভবের বিষয়। শিল্পী অনুভব করে গাইবেন, শ্রোতা তা শুনে অনুভব করবেন। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা প্রাচীনকাল থেকে সাধক-ভক্তদের/ রাগ রচয়িতাদের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। রাগ সংগীতে রাগভাব যত গাঢ়, তা অন্য কোনও গানে প্রকাশ পায়নি। শুধু রাগপ্রধান বাংলাগানে রাগভাব কাব্যগীতের সওয়ার হয়ে সার্থক ভাবে বাংলাগানে রাগের প্রয়োগ ঘটিয়েছে। বাংলাগান অবশ্য শুরুর থেকেই ভাবধর্মী ছিল। রাগপ্রধান বাংলাগানে রাগভাব যুক্ত হয়ে এই গানকে অভিনব করে তুলেছে।

> উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধ্রুপদ বা খেয়ালকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত হাল্কা এবং কমনীয় ও নমনীয় ভাবের গানগুলি বাংলা ভাষার মাধমে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। ছোট খেয়ালের সমপ্রকৃতি নিয়ে বাংলায় যে 'রাগপ্রধান গান' প্রকাশ লাভ করেছে এটি একটি সার্থক সৃষ্টি। বাংলা 'বাণী'র জন্য সংগীতাংশ সেখানে কোন ভাবে ব্যাহত হয় না। সুরের মাদকতা ভাষাকে আশ্রয় করে প্রকাশ লাভ করলে তার প্রকাশ ভঙ্গি অনেক সুন্দর হয়।[২]

হিন্দুস্থানী সংগীত হল দরবারী সংগীত; তার গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখতে সেই ওজনের দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন। অপরদিকে বাংলাগান ঘরোয়া গান। এই দুই প্রথার সম্মিলন ঘটাতে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ইংরেজ শাসনামলে হিন্দুস্থানী দরবারী সংগীতজ্ঞগণ যখন বাংলায় এসে ঘরোয়া বৈঠকী আসরে সংগীত পরিবেশন করতেন তখন থেকেই ধ্রুপদী সংগীত ও বাংলাগানের মিশ্রণ শুরু হল। শুরুতে এতটা সহজ হয়নি সবকিছু হিন্দি ভাষার দুর্বোধ্যতা ছিল, আবার বাংলা কথায় দরবারী ধ্রুপদ-খেয়াল জমছিল না, হিন্দুস্থানী রীতিতে বাংলা টপ্পা-খেয়াল-ঠুমরীর আবেদন যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এসব মিল অমিলের মাঝেই নতুন ভাবে নতুন ঢং এ রাগপ্রধান বাংলাগান শিরোনামে নতুন গীতশৈলীর উদ্ভব ঘটল। রাগপ্রধান বাংলাগানের আরেকটি স্বার্থকতা হল শ্রোতা সমাজ তৈরী। কলকাতা ও বাংলাদেশে এক সময় শ্রোতা ছিল বাঙালি কিন্তু শিল্পী ছিল হিন্দিভাষী। তারা ধ্রুপদ খেয়াল যা গাইতেন তাতে অধিকাংশ শ্রোতার বোধগম্য হত না। কিন্তু রাগপ্রধান বাংলাগান বাংলা ভাষায় শ্রোতাদের

[২]মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*(কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩) পৃ ৪২৬

জন্য হিন্দুস্থানী রাগের স্বাদ উপভোগ করার উত্তম পথ ছিল। সাহিত্য ও কাব্যপ্রেমী শ্রোতাদের চিত্তকে রঞ্জন করার জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু হতে পারে না।

> বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী সংগীতের অনুশীলন হয়েছে তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখেই। কিন্তু সেই রাগসংগীতের আধারে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংগীতগুলি উত্তর ভারতীয় সংগীতের পুষ্টি ও উন্নতি সাধনে একদিকে যেমন সহায়তা করেছে অপরদিকে তার ভান্ডার পরিপূর্ণ করে তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সুর প্রধান উত্তর ভারতীয় সংগীতে যে সাহিত্যের অভাব ছিল বাংলা সেই অভাব তার দূর করেছে, সুর ও বাণীর মিলন ঘটিয়ে।[৩]

> আধুনিক বাংলা গানও একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব নিয়েছে। এই সংগীতে কথাশিল্প ও সুর শিল্পের মিলনে একটি অপরূপ সৃষ্টি শক্তি রূপ নিতে চাচ্ছে। এই সৃষ্টিতে হিন্দুস্থানী কায়দা আপন পুরো সেলামি পাবে না, যেমন পায়নি বাংলার কীর্তন গানে। তৎসত্বেও বাংলা গানের নূতন ঠাট বাংলার বাহিরের শ্রোতাদের মনে বিশেষ একটি আনন্দ দিয়ে থাকে এ আমাদের। দেয় না, তাঁদেরই, সংগীত-ব্যবসায়িকতার বাঁধা বেড়ার মধ্যে যাঁদের মন সঞ্চরণে অভ্যস্ত।[৪]

রবীন্দ্রনাথের মতে,

> চিরদিনই মানুষ কথার সংগে সুর জড়িয়ে গান গেয়ে এসেছে-সুর বড়ো কি কথা বড়ো তর্ক ওঠেই নি। যদি নিতান্তই তর্ক তোলা হয় তা হলে আমি বলব এ ক্ষেত্রে সংগীতই স্বামী, ভাষাকে সে আপন গোত্রে তুলে নিয়েছে। এই দাম্পত্যকে মানুষ চিরদিনই স্বীকার করেছে আনন্দের সংগে। একটি পুরনো গান আছে, কাল আসিবে বলে গেল, কেন এল না! এতো একটা সংবাদ মাত্র, কিন্তু খাম্বাজ সুরের জীয়নকাঠি লাগবা মাত্র সংবাদের নির্জীবতা থেকে শিল্পের প্রাণলোকে বাণীটি মাথা তুলে উঠল। এমনি করেই পারসিক রূপকার নিত্য ব্যবহারের জিনিসকে শিল্পের অমরাবতীতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। যাঁরা সুরে কথা মিলিয়ে দিয়ে গান রচনা করেন তাঁদেরও ঐ এক উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্যে সংগীতেরই সার্থকতা অগ্রগণ্য।[৫]

বাংলাদেশে প্রচলিত গান ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল হতে অনেকটাই আলাদা। এই অঞ্চলে প্রচলিত সুরগুলো বেশির ভাগই কীর্তনাঙ্গের অনুসরণে। বাংলায় রাগসংগীতের প্রচলন ছিল প্রাচীনকাল থেকেই কিন্তু বাংলাগান বলতে যা বোঝায় সেগুলোতে মিশে আছে লোকসুর, হাজার বছরের প্রাচীন সুরের ধারা। বাংলাগান সব সময়ই কাব্যধর্মী, এটা বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য বলা চলে। এই কাব্য সাহিত্যের সাথে উত্তর ভারতীয় রাগের প্রলেপ এমনই এক মাধুর্যময় স্বাদ এনে দিয়েছিল যা তৎকালীন সংগীতবেত্তাগণ কল্পনাই করতে পারেন নি। হিন্দুস্থানী

---

[৩]মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*(কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩) পৃ ৪৫৮

[৪]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীত চিন্তা*(ঢাকা: নবযুগ সংস্করণ, ২০০৭) পৃ ৬২

[৫]তদেব। পৃ ৬৩

বন্দিশে শুধু বাংলা কথা বসিয়ে ওস্তাদগণ যে রসের আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন, তার খুব সহজেই সমাধান দিলেন কবি সাহিত্যিকগণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বাংলাদেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। কিন্তু, এই রূপকে সর্বদা প্রাণবান করে রাখতে হলে হিন্দুস্থানী উৎস ধারার সংগে তার যোগ রাখা চাই।"[৬] কবির মতে, বাংলাগানে বাণী ও সুরের ভারসাম্য যথাযথ ভাবে রক্ষা করা হলেও তা সজীব হয়ে ওঠে রাগের ব্যবহারের মাধ্যমে। একারণেই সংগীতের প্রাণ বলা হয় রাগকে। রাগপ্রধান বাংলাগানের সুর হল এই গানের সৌন্দর্য্যের মূল পটভূমি। রাগসংগীত নয়, আবার আধুনিক গানও নয় কিন্তু সুরের বুনন এমন যে, এই গানের অর্থটাই ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে। শ্রোতাদের কাছে রাগপ্রধান বাংলাগান আধুনিকগানের রাগাশ্রয়ী রূপ হিসেবে অনুভূত হয়। এই গানের সুরের অবয়ব, স্বরের গাঁথুনী এবং মূচ্ছর্নার লালিত্য এতই মাধুর্যমণ্ডিত যে বর্তমান যুগের অন্যান্য বাংলাগানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। বাংলা ভাষায় রাগের ভাবের সাথে দেশীয় আধুনিক সুরের অভিনব এ যুগলবন্দী নিঃসন্দেহে ঊনবিংশ শতকের যুগান্তকারী আবিষ্কার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, হিন্দুস্থানী গানের সুরকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। তিনি সহ সকল সংগীত স্রষ্টাদের হিন্দুস্থানী সুরের কাছেই সাহায্য নিয়ে গানের সুরারোপ করতে হয়েছে। তিনি আশা-করেছেন, হিন্দুস্থানী গান(রাগসংগীত) ভালকরে শিখলে তার প্রভাবে বাংলাগানেও নতুনত্ব আসবে। কবিগুরুর এই আশাবাদ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার দরবারে গৃহীত হয়েছিল খুব দ্রুতই। তাই তো বাংলাগানের নতুনত্ব হিসেবে রাগপ্রধান বাংলাগানের আবির্ভাব ঘটল। উল্লেখ্য, কবিগুরু তার উক্তিতে সুরের কথাই বলেছেন; ভাষার কথা বলেননি। সুর ঠিক থাকলে যে কোন ভাষাতেই তা হৃদয়হরণ করবে। ভাষাবিহীন গানের যে আলাদা আবেদন আছে তা রাগালাপ শুনলেই বোধগম্য হয়। কোনোরূপ ভাষা ব্যবহার না করেও শুধু সুরের মাধ্যমে শ্রোতার হৃদয়কে আপ্লুত করা সম্ভব। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে রাগপ্রধান বাংলাগানের যে সুরবৈচিত্র্যগুলো প্রাপ্তি হল তা হচ্ছে -

১. রাগপ্রধান বাংলাগানের সুরে রাগ-রাগিনীর অবয়ব থাকলেও রাগের গাম্ভীর্যময়তা বা চঞ্চলতা নেই।
২. অনেক সময় রাগের চলনের রূপ রাগপ্রধান গানের সুরে প্রকাশিত নাও হতে পারে। এতে রাগ ভাবটাই শুধু পরিস্ফুটিত হয়।
৩. রাগপ্রধান বাংলাগান মানেই যে শুধু রাগের প্রাধান্য তা নয়। রাগরাগিনীর ছাঁচে বাংলা সুরের বহিঃপ্রকাশ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

---

[৬]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীত চিন্তা*(ঢাকা: নবযুগ সংস্করণ, ২০০৭) পৃ ৯৭

৪. রাগপ্রধান গানে সুর বিস্তারের স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু সব গানেই বিস্তার থাকে না। কখনও কখনও গানের কাব্যিক অংশেই শুধু রাগের প্রয়োগ ঘটানো হয়।

৫. রাগপ্রধান বাংলাগানে সুরের পরিসর নির্ধারিত থাকে। রাগ সংগীতের ন্যায় অনিয়ন্ত্রিত নয়। রাগসংগীতে আলাপ-বিস্তারের সীমানা বাঁধা থাকে না কিন্তু রাগপ্রধান বাংলাগানে এর পরিসর স্বল্প হয়ে থাকে।

৬. বাংলাদেশের প্রচলিত সুরে রাগের প্রয়োগ করা হয় দেখে এই গান হালকা চালের গান হিসেবে পরিচিত।

৭. রাগ-রাগিনী কঠোর নিয়ম বহির্ভূত বলে রাগপ্রধান বাংলাগানের সুর, গানের কথার সাথে সম্পর্কিত। রাগ প্রকাশক অতিরিক্ত কিছু এই গানের সুরে নেই।

৮. রাগপ্রধান বাংলাগানের সুরটাই রাগরূপ প্রকাশ করে। তাই এই গানে তান-সরগম, বোলতান ইত্যাদি অলংকার প্রয়োগ না করলেও চলে।

তবে বাংলাগানে শুধু রাগ হলেই হয় না, এর যথাযথ ভাব ও রসের প্রাবল্য উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাগপ্রধান বাংলা গান এক ঝাঁক গীতিকার-সুরকার ও শিল্পী-শ্রোতা তৈরী করেছিল ঊনবিংশ শতকে। এই ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই নবীন ও আধুনিক গানের শিল্পী ছিলেন। পরবর্তীতে রাগপ্রধান বাংলাগানের পৃষ্টপোষকতা করে তাঁরা নিজেরাও বিখ্যাত হয়েছিলেন আবার রাগপ্রধান গানকেও অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সার্বিক দিক দিয়ে রাগপ্রধান বাংলাগান ঊনবিংশ শতকের একটি স্বার্থক শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। রাগপ্রধান বাংলাগানে সুরের সাথে কাব্যের সর্ম্পককে তুলে ধরা হয়ে থাকে। খেয়াল গানের সাথে রাগপ্রধান বাংলাগানের মূল পার্থক্যই এখানে। রাগপ্রধান বাংলা গানে সুর ও বাণী একে অপরের পরিপূরক। রাগকে কেন্দ্র করে সুরই হয়ে ওঠে বাণীর কাব্যিক মূল্য প্রকাশের পথ। উল্টোটা ঘটে খেয়ালের ক্ষেত্রে, সেখানে রাগের প্রকাশই মুখ্য। যেহেতু বাংলাগানে কাব্যের আবেদন অনেক বেশী, তাই রাগপ্রধান বাংলাগান মানেই রাগ ও কাব্যের যৌথ রাজত্ব। এখানে সুর ও ভাব উভয়ই মিলিত ভাবে রাগপ্রধান গানকে হিন্দুস্থানী রাগসংগীত ও আধুনিক বাংলাগান হতে পৃথক করেছে।

রাগপ্রধান বাংলাগানের সুরের যে বৈচিত্র্যগুলো রয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই বলতে হবে গানের কথা ও রাগ ভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণতা। হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের ক্ষেত্রে গানের কথা জরুরী নয়। অল্প বিস্তর কথায় রাগরূপ বিস্তার করা, তান-সরগম, লয়কারী, বোলতান এগুলোই প্রাধান্য পায়। বিস্তারে বন্দিশের কথা কখনও সম্পূর্ণ হয় না, রাগের চলন দেখিয়ে সম্ এ ফিরে যাওয়া রীতি রয়েছে। অর্থাৎ খেয়ালে শুধু রাগের চলনই মূখ্য। কিন্তু রাগপ্রধান বাংলা গানে শুধু রাগ ভাব প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আর তার অংশ হিসেবে গানের কথা এবং রাগের অবয়ব মিলিত রূপে পাশাপাশি সমান্তরাল রূপে চলে। যেমন- 'বনে বনে পাপিয়া বোলে' গানিটির কথাই ধরা যাক। খেয়ালধর্মী

রাগপ্রধান গানটি বাহার রাগের রচিত। বাহার ঋতুভিত্তিক রাগ, এই রাগের চলন গানের কথায় বসন্ত ঋতুর আবেশ টেনে আনে। অথচ বাহার রাগে যেকোন বন্দিশ কাব্যরসের সাথে রাগভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে না। শুধু রাগটাই বসন্ত ঋতুর আবহ এনে দেয়। রাগসংগীতের তুলনায় রাগপ্রধানের সুরের বৈচিত্র্যময়তা এখানেই, যে রাগপ্রধান বাংলাগানে কাব্যের সাথে সুরের এমন সমন্বয় ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোনো গীতশৈলীতে দেখা যায় না। রাগপ্রধান বাংলাগানের সুরবৈচিত্র্য তাকে আধুনিক বাংলাগান হতেও পৃথক করেছে। এই দুই শ্রেণির গানের পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। আধুনিক বাংলাগানের সুর একটি নির্দিষ্ট রাগকে অনুসরণ করলেও সেখানে রাগভাব থাকে না। আবার গানের কথায় আধুনিক শব্দ, চাকচিক্যময় পংক্তি এবং অপ্রচলিত ছন্দের আবির্ভাব লক্ষ্যণীয়। যেমন- শচীনদেব বর্মনের জনপ্রিয় একটি আধুনিক গান- তুমি এসেছিলে পরশু, কাল কেন আসোনি গানটির কথা ধরা যাক। গানের কথায় একেবারেই গতানুগতিক ভাব নেই। ছন্দের ক্ষেত্রের প্রথম চরণের সাথে দ্বিতীয় চরণের অন্ত্যমিল নেই। কিন্তু হালকা সুরে এই ছন্দটি বেশ মানিয়ে গিয়েছে। শচীন দেব বর্মনের রাগ সংগীত ও বাংলার লোক সংগীত উভয় দিকেই বেশ দখল ছিল। কিন্তু তাঁর গানের অভিনবত্ব হল তিনি সব গানের মাঝেই এমন একটি বিশেষত্ব বজায় রাখতেন যেন গানগুলিকে শুনেই আলাদা ভাবে চেনা যায়। যিনি উপরে আলোচ্য আধুনিক বাংলা গান তৈরী করেছেন, তিনিই আবার 'মম মন্দিরে কে এলো' গানটির মত রাগপ্রধান গান সৃষ্টি করেছেন। প্রথম গানে আবেগের প্রাবল্য ছিল আর দ্বিতীয়টিতে রাগভাব ও কাব্যগীতের যুগলবন্দী। এইভাবে রাগপ্রধান বাংলাগানগুলো আধুনিক বাংলাগান হতে পৃথক হয়েছে।

রাগপ্রধান পুরোপুরি রাগ সংগীত নয়। একে রাগাশ্রিত গান বলা যায়। তবে বাংলা কাব্যগীতের সংগে রাগসংগীতের রাগভাব মিলে রাগাশ্রিত অবয়বে আত্মপ্রকাশ করে রাগপ্রধান বাংলাগান সৃষ্টি করেছে। এই গানের সাথে ধ্রুপদ-ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, গজল কোন প্রকার গীতিরীতির সুরের সামঞ্জস্য নেই। উক্ত গীতরীতির নিয়মেও এই গান গাওয়া হয় না। রাগপ্রধান বাংলাগান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি গীতশৈলী। একারণেই হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের চেয়ে এই গানের সুর অধিক বৈচিত্র্যময়। রাগপ্রধান বাংলাগান একেক রাগে একেক ধরণের সুরের লহরী তৈরী করে। কাব্যগীতের স্বকীয়তায় একই রাগের দুটি ভিন্ন গানে দুই রকম রস সঞ্চার ঘটে। যেখানে একই রাগের বন্দিশগুলো কাছাকাছি সুরেই পাওয়া যায়।

রাগপ্রধান বাংলাগানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল এর সুর। বাংলাদেশে যে শুধু কাব্যসংগীত ও সাহিত্যের প্রাচুর্য তা নয়। বাংলাদেশে সুরের লালিত্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর অগ্রজদের মধ্যে। বাংলাগানের সুর হল বাঙালি মানসপটে ভেসে বেড়ানো অকৃত্রিম এক স্রোতধারা যা রাগের গাম্ভীর্যময়তার ছোঁয়ায় বাংলা কাব্য সংগীতে

করেছে নতুন প্রাণসঞ্চার। এর অর্থ দাঁড়ালো, হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনীকে গাইবার এক নতুন প্রকরণ বাংলা কাব্যসংগীতের সহচর্যে এসে সুরের বিচিত্র বিকিরণ ঘটিয়েছে, যার নাম রাগপ্রধান বাংলা গান।

শাস্ত্রীয় সংগীতে সুর আছে, কিন্তু নেই বৈচিত্র্যময়তা। আধুনিক বাংলাগানের সুরে বৈচিত্র্যময়তা থাকলেও তা বর্ণিল নয়। রাগপ্রধান বাংলাগান গতানুগতিক রাগসংগীতের একঘেয়েমি ও বাংলাগানের সুরের পুনর্বিন্যাসকরণের বিপরীতমুখী। অতি প্রাচীনকাল হতেই বাংলাগানে বিচিত্র সুরের সমাগম। বাংলাগানে সুরের পাশাপাশি কথার বিচিত্রতা, রসের বিচিত্রতা, ভাবের বিচিত্রতা ইত্যাদি সবই কালক্রমে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাগানকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু কোনো যুগেই রাগসংগীতের ও কাব্য সংগীতের মিলন ঘটেনি। লোকসংগীতের উপাদানের প্রাচুর্যে ভরা বাংলায় কাব্যসংগীতের সাথে রাগসংগীতের মিলন যে এতটাই খাপে খাপ মিলে যাবে এবং অভূতপূর্ব রূপে নতুন গীতরীতির জন্ম দেবে তা বোধ হয় সংগীতজ্ঞগণ আগে অনুধাবন করতে পারেন নি। রাগপ্রধান বাংলাগানের সুরের বিচিত্রতা অনুসন্ধানে কতগুলো বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, রাগপ্রধান গান বাংলা ভাষায় রচিত। এই গানে অন্য ভাষার ব্যবহার যতটা চিত্তহরণ করে তারচেয়েও বেশি রসোপলব্ধি ঘটেছে বাংলা সুরে ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে। অর্থাৎ প্রচলিত সুরে রাগের আভিজাত্যকে ধারণ করে বাংলা ভাষায় গীত অবয়ব দেওয়া হয়েছে সার্থকভাবে।

দ্বিতীয়ত, রাগ-রাগিনীর প্রাবল্য যতই থাকুক না কেন বাংলা কাব্যগীতের সাথে বাংলা সুরই বেশী মানানসই, মারাঠী বা তামিল সুর নয়। একারণেই দক্ষিণী রাগে রাগপ্রধান গান রচনা করা হলেও সুরে বাংলা টান ছিল অটুট। এটি নিঃসন্দেহে সুরের বিচিত্র এক প্রয়োগ।

তৃতীয়ত, রাগপ্রধান বাংলাগানের সুর ও গায়কী পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই গান বাংলা ভাষী ব্যতীত অন্য কেউ গাইলে সুর ঠিক থাকলেও গায়কীর তারতম্য হতে পারে। একারণে বাংলাগান সম্পর্কে জানেন অথচ বাঙালি নন এমন শিল্পীদের জন্য গানের সুরকে প্রচলিত বাংলাগানের ধারা হতে পৃথক রাখা প্রয়োজন। রাগপ্রধান বাংলাগানে তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণতার সাথে প্রণীত হয়েছে।

রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগরূপ ও সুরবৈচিত্র্য বিশ্লেষণে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাগ ভাবনা ও বাংলা গানে রাগের বিচিত্র প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাংলা গানে রাগ-রাগিনীর বহু পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ঘটলেও রবীন্দ্রনাথের গানেই সর্বপ্রথম এর সার্থকরূপ ফুটে উঠেছিল এবং রাগপ্রধান বাংলাগানে তিনিই প্রথম পথিকৃত হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তীকালে অনেক সংগীত রচয়িতাদের আগমন ঘটলেও কাজী নজরুল ইসলামের মত পৃষ্টপোষকতা আর

কেউ করেননি। কাজী নজরুলের প্রতিভার গুণে রাগপ্রধান বাংলাগানের সৃষ্টির পথ যেন আরও সুগম হয়েছিল। বাংলাগানের এই দুই দিকপালের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে রাগপ্রধান বাংলাগানের তথা বাংলাগানের এক সুবিশাল সুর ভান্ডার তৈরি হয়েছিল। হিন্দুস্থানী রাগসংগীতকে অবলম্বন করে বাংলা কাব্যসংগীতের সুরবৈচিত্র্য তৎকালীন ভারতের আধুনিকতার নতুন দিগন্তকে উন্মোচন করেছিল। বাংলাদেশের সাথে ভারতীয় রাগসংগীতের সম্পর্ক অনেক প্রাচীন হলেও উনিশ শতকের পূর্বে তা বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপরে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। সেই উনিশ শতক হতেই হিন্দুস্থানি রাগসংগীত পদ্ধতিতে বাংলাগান রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই প্রয়াসের প্রথম সৃজনশীল কাণ্ডারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে বিনা সংগীতশিক্ষা লাভে কাজী নজরুল ইসলাম রাগপ্রধান বাংলাগানে যা দান করলেন তা দেখলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। অভাব, অনটন ও দারিদ্রের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা নজরুল হয়ে উঠলেন বাংলাগানের দিক দিয়ে সবচেয়ে ধনী। কোন সাংগীতিক পরিমণ্ডলে জন্ম না নিয়ে, সাংগীতিক পরিবেশে বড় না হয়েও নজরুল বাংলাগানের অতুলনীয় সুর স্রষ্টা হয়ে উঠেছিলেন নিজ গুণে।

৫.১ গানের বাণীর সাথে সুরের সমন্বয়

রাগপ্রধান বাংলাগানের কাব্যিক অংশটুকু আলাদা করলে এর সুরের জৌলুস আলাদা ভাবে চোখে পড়ে। অর্থাৎ রাগপ্রধান গানে রাগের ব্যবহার ততখানিই করা যায় যতখানি আলাপ ও বিস্তারে দেখানো যায়। রাগপ্রধান গানেও রাগসংগীতের ন্যায় আলাপ ও বিস্তার করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু গানের সুরগুলো বন্দিশের সুর অপেক্ষা বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়। কেননা, শাস্ত্রীয় সংগীতে রাগের প্রকাশ ঘটাতে আলাপ-বিস্তার, তান-সরগম সব মিলিত ভাবে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু রাগপ্রধান গানের ক্ষেত্রে গানের কথায় বসানো সুরেই রাগের অধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে রাগ মিশ্রণ ঘটানো হয় যা গানের প্রকৃত রসাস্বাদন করে নিমেষেই। বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার গোপাল দাসগুপ্ত রাগপ্রধান গান সম্পর্কে বলতেন যে,

> রাগপ্রধান গান গাইতে গেলে যে বিশুদ্ধ রাগেই তা গাইতে হবে তার কোন অর্থ নেই। গানের মধ্যে রাগ ভাবটাই হবে আসল। হয়তো গান শুনে কোন বিশেষ রাগের চরিত্র তার মধ্যে ধরা না গেলেও গানটিতে যে একটা রাগ ভাব প্রবল, পরিবেশন ভঙ্গির জন্য সেটাই বেশি মনে হবে। অর্থাৎ রাগ ভাবটাই হবে রাগ প্রধান গানের বৈশিষ্ট্য।[৭]

পৃথিবীখ্যাত সংগীতজ্ঞ এডওয়ার্ড হ্যানসলিক এর মতে, "A musical composition, as the creation of a thinking and felling mind, may, therefore posses intellectuality and pathos in a high degree."[৮] যার অর্থ দাঁড়ায়- চিন্তা শক্তি ও অনুভূতির মাধ্যমে কোন সংগীত রচিত হলে সেই সুর আমাদের চিত্তকে আন্দোলিত করবে উচ্চ মাত্রায়। রাগপ্রধান বাংলাগানের সুরবৈচিত্র্য এখানেই যে, এই গানের সুরে রাগ-রাগিনীর গাঢ়ত্ব যেমন ঠিক তেমনই ভাবের প্রাবল্য। কোন রাগের চলন কেমন তা অতি প্রাচীনকাল হতেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে কিন্তু রাগপ্রধান গানে রাগকে প্রাধান্য দিয়ে গানের ভাব ব্যক্ত করার যে অভিনব প্রয়াস দেখা যায় তা ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোন গীত শৈলীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। "সুরবিস্তারে যে স্বাধীনতা ভারতীয় রাগসংগীতের বৈশিষ্ট্য তা রাগপ্রধান গানেও বৈশিষ্ট্য।"[৯] পার্থক্য শুধু, রাগ সংগীতে রাগের রূপ নিয়ন্ত্রিত হয় এর চলন দ্বারা। রাগের নির্দিষ্ট চলনের বাইরে কিছু প্রকাশ করা শাস্ত্রীয় নিয়ম বহির্ভূত। কিন্তু রাগপ্রধান গানে রাগরূপকে প্রাধান্য দিয়ে সুরের নানা বর্ণময় বুনন দেয়া সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে শাস্ত্রের কোন নিয়ম খাটে না। শুধুমাত্র হিন্দুস্থানী রাগ সংগীতের অবয়ব

---

[৭]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ২৩

[৮]দেবব্রত দত্ত, *সংগীততত্ত্ব*-দ্বিতীয় খন্ড(কলকাতা: ব্রতী প্রকাশনী, ২০১২) পৃ ৩১৪

[৯]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, প্রাগুক্ত। পৃ ১৮

নিয়ে বিচিত্র সুরের রসে সার্থক রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের কথা ও সুরে বেগম আখতারের কণ্ঠে বাংলায়, 'কোয়েলিয়া গান থামা এবার" এবং হিন্দিতে 'কোয়েলিয়া মত্ কর্ পুকার" গানের সুর একই এবং গানটিতে রাগের চেয়ে রাগভাব বেশি প্রকাশিত হয়েছে। মাঝ খাম্বাজ রাগে এবং দাদরা তালে নিবদ্ধ রাগপ্রধান এই গানটিতে হিন্দুস্থানী উপশাস্ত্রীয় দাদরা গানের অন্ত্যমিল লক্ষ্য করা যায়। এই গানটির সুর বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, গানের অধিকাংশ অংশেই মাঝ খাম্বাজ রাগের চলন দৃশ্যমান। ন্ স গ ম প, গ ম ন ধ প, ধ ন র্স ণ ধ, ম প ধ ম গ, প ম গ র স এটি খাম্বাজ রাগের চলন। এই গানটিকে মাঝ খাম্বাজ বলা হচ্ছে, কারণ এই গানটিতে মধ্যম স্বরকে 'সা' রূপে ধরে গানে খাম্বাজের গায়নরীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এই বিশেষ রাগের স্রষ্টা। মাঝ খাম্বাজ রাগের স্বরগুলো হচ্ছে র স ম ন্, প ন্ স র গ র স, ন্ স গ ম প, গ ম প ন ধ প, ম গ র স ইত্যাদি। এই রাগে মধ্যম স্বরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই রাগ গাওয়ার সময় তানপুরার সুর ' স প' স্বরে না বেঁধে 'স ম' স্বরে বাঁধা হয়। মধ্যম কেন্দ্রিক খাম্বাজ রাগের বিন্যাস অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ। উপশাস্ত্রীয় সংগীত এবং যন্ত্রসংগীতে এই রাগ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। 'কোয়েলিয়া গান থামা" গানটিতে গ্রহস্বর হিসেবে 'মধ্যম' স্বরেই গান শুরু হয়েছে।[১০] অনেক শ্রোতার মতে, রাগসংগীতে একঘেয়েমি আছে। কিন্তু রাগপ্রধান বাংলাগানে এক ঘেয়েমি নেই, একথা পরীক্ষীত। রাগসংগীতে একই অবয়ব বারবার ফিসে আসে, বাদী সমবাদী বারবার দেখাতে হয়, একই ন্যাসে বিশ্রাম নিতে হয়। রাগপ্রধান গান এসব জটিলতা বর্জিত, কিঞ্চিৎ স্বাধীন। রাগপ্রধান গানের সুর একারণেই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে এই গানে একই রাগরূপের পুনরাবৃত্তি ঘটে না। যে রাগ শাস্ত্রের নিয়মে আবদ্ধ, তা রাগপ্রধান গানে মুক্ত। রাগপ্রধান বাংলাগানের সুরলহরী অন্যান্য উপশাস্ত্রীয় ধারাকে ছাপিয়ে গিয়েছে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে। বাংলা ভাষায় হিন্দুস্থানী রাগের অপরূপ সুরমালা বাংলার শ্রোতা সমাজকে যতখানি আপ্লুত করেছে তা বোধহয় ১৯ শতকের অন্য কোন গীত ধারায় হয় নি। "গান গাইবার ধরন, সুর ধরা ও ছাড়া, উচ্চারণ এবং পরিবেশন ভঙ্গীও আজকের রাগপ্রধান গানকে আধুনিক গান অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে। যে কারণে আজকের রাগপ্রধান গানের শ্রোতারা আধুনিক বাংলা গানে যা পান না রাগপ্রধান গানে আধুনিক গানের সমস্ত ধর্ম সহ আরও একটা অতিরিক্ত গুণ পান তা হচ্ছে সুরবিস্তারের স্বাধীনতার স্বাদ।"[১১] আধুনিক বাংলাগান ও রাগপ্রধান বাংলাগানের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য

---

[১০]Gayatir Rao, Raga Manjh Khamaj, June 18, 2018https://lemonwire.com/2018/06/18/raga-manjh-khamaj/ accessed in 30 January, 2021.

[১১]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ৭২

পরিলক্ষিত হয়। যেমন- আধুনিক বাংলাগানে চার তুক বেশি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু রাগপ্রধান বাংলাগানে দুই তুক, স্থায়ী ও অন্তরার ব্যবহার শিল্পীর গায়কীর স্বাধীনতা ও রসবোধের উদগীরণ ঘটাতে বেশী সাহায্য করে। আধুনিক বাংলাগানে কাব্যগীতের প্রাধান্য বেশি। অন্যদিকে রাগপ্রধান বাংলাগানে কাব্যগীত, রাগভাব এবং সুর সংযোজন এই ত্রয়ীর সমান অধিপত্য রযেছে।[১২] রাগপ্রধান বাংলাগানের সুরের বৈচিত্র্যময়তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে রাগের একঘেয়েমিতা দূর করে রাগপ্রধান গানের সুরের বৈচিত্র্যময়তা। বর্তমানে যে সব আধুনিক বাংলাগান শোনা যায় সেসবের অধিকাংশেই রাগ-রাগিনীর ঠিক নেই। রাগভাব ঠিকঠাক না হলে সুরের সাথে সামঞ্জস্য থাকে না। রাগপ্রধান বাংলাগানের সুরবৈচিত্র্য প্রকটভাবে ধরা পড়ে যখন রাগভাব সুরের সাথে মিশে প্রকাশ পায়। যেমন- ললিত রাগে রচিত গানে গানে কে গো ঘুম ভাঙালো আজি' গানটির কথাই ধরা যাক। এই গানের কথা ও গায়নসময়ের চেয়ে রাগ ভাবটাই আসল। এই গানের সুরে ললিত রাগের ভাব গানের কথায় মিশে বিচিত্র এক রূপ লাভ করেছে। ললিত প্রাতঃকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ এবং এই রাগের চলন উত্তরাঙ্গে- ন্ ঋ, গম, দ ক্ষ ক্ষ ম গ, ক্ষ দ র্স, ঋ-, ন র্ঋ র্গ র্ম র্গ র্ঋ র্স এই রূপ গানে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। উভয় মধ্যমের ব্যবহার এই গানে রাগভাবকে আরো তীব্র করেছে।

ক্ষ ক্ষগ গঋ ন্ ঋ গম মক্ষম ক্ষদ ।।। দন ক্ষ দ ক্ষম

গা ০নে গা০নে ০ কে গো ঘুম ০০০ ভা ঙ্গা লো আজি

দক্ষ দদ দক্ষ দন র্স র্স নদ দর্ঋ নদ দন ক্ষদ ক্ষদ ক্ষম

কা হা রো০ বাঁ০ ০ শ রী০প০ রা নে০ উঠিল০ আজি

ললিত রাগের সার্থক রূপ গানের প্রথম দুটি চরণেই পূর্ণভাবে বিকিরিত হয়েছে। সুরের বিশেষত্ব হল তা রাগের বাইরে যায়নি। গানটি শুনলে মনে হবে ললিত রাগটি কাব্যসংগীতের মাধ্যমে গাওয়া হচ্ছে।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশ গানের দেশ হিসেবে খ্যাত। এই দেশে বিচিত্র সব সুরের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে রয়েছে। কীর্তনের সুর, বাউল সুর, বিচিত্র খেয়ালের মানুষের অঞ্চলে সুরের বৈচিত্র্যময়তা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই তো রাগ-রাগিনী প্রযুক্ত বাংলাগানের সুরেও বৈচিত্র্যময়তা খুঁজে পাওয়া যায়। সংগীতের অধিংকাংশ জুড়েই সুরের বিস্তার।

---

[১২]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ৬৬-৬৭

গান ও সুর দুটি ভিন্ন জিনিস। গীতিকার কাব্য রচনা করেন, তাতে সুর বসলেই তা গান হয়। অর্থাৎ কাব্যকে জীবন দান করে সুর। রাগপ্রধান বাংলাগানে সুর শুধু জীবন দানই করে না। কাব্যকে অমরত্ব লাভের সুযোগ করে দেয়। হিন্দুস্থানী সুর প্রধান সংগীতরীতির সংগে বাণী ও সুরের সমন্বয়ী বাংলা সংগীতরীতির পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দিলীপ কুমার রায়কে বলেছিলেন,

> তুমি এটা কেন মানবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার বিকাশ যেভাবে হয়েছে, আমাদের বাংলা সংগীতের ধারা সেভাবে বিকাশ লাভ করে নি? এ দুটোর মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে। বাংলা সংগীতের বিশেষত্বটি যে কী তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমিশ্র সংগীতের আনন্দ নয়। তার সংগে কাব্যরসের আনন্দ একাত্মক হয়ে মিলিত।[১৩]

[১৩]করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বর্তমান ও আরো*(ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ লিমিটেড, ২০১৪) পৃ ১৭৬

৫.২ রাগপ্রধান বাংলাগান ও রাগাশ্রয়ী গানের মধ্যে পার্থক্য

রাগাশ্রয়ী গানগুলিকে অনেকে Light Classical বা লঘু উচ্চাঙ্গ সংগীতও বলে থাকেন। অনেকে বলেন semi classical song. অর্থাৎ রাগাশ্রয়ী গান হল রাগের আদলে নয় অথচ আংশিক রাগভাব মিশ্রিত বৈচিত্র্যপূর্ণ গান। সেদিক থেকে আধুনিক গান বললেও ভুল হবে না। আধুনিক বাংলাগানে ও রাগপ্রধান বাংলাগানের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। "আধুনিক বাংলাগান রচনা ও সুর সংযোজনার আধুনিকতা রাগপ্রধান গানে আধুনিক রীতির রাগ সমৃদ্ধ সুর ও কাজ সমৃদ্ধ গীত রচনা, হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের বেড়াজাল ভেঙে গানকে মাধুরী মাখা করে পরিবেশন করতে খুবই সাহায্য করছে একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।"[১৪]

যেকোন একটি রাগকে প্রধান করে গাওয়া গানই হল রাগপ্রধান গান। এ ক্ষেত্রে রাগের চলন, বৈশিষ্ট্য সবকিছুই প্রাধান্য পায়। রাগপ্রধান গানে অঙ্গ মানা হয় শুদ্ধভাবে। যেমন: খেয়াল অঙ্গের গান সম্পূর্ণ খেয়ালের বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে চলে। যেসব রাগে খেয়াল বেশী গাওয়া হয় সাধারণত রাগপ্রধান গানের (খেয়াল অঙ্গ) ক্ষেত্রেও ঐ রাগগুলিতেই বেশী গাওয়া হয়। ধ্রুপদের দিকেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। তবে গান তো গানই। উচ্চাঙ্গরীতিকে অনুসরণ করলেও রাগপ্রধান গানের সাথে ধ্রুপদ-খেয়াল-ঠুমরী-টপ্পার বেশ একটা পার্থক্য রয়েছে। যখনই এ পার্থক্য অনুধাবন করা যায় তখন তাকে রাগপ্রধান না বলে রাগাশ্রয়ী গান বলা হয়। রাগাশ্রয়ী গান হল রাগকে আশ্রয় করে যে গান গাওয়া হয়। রাগাশ্রয়ী গানে রাগের বৈশিষ্ট্য হুবুহু না মানলেও চলে। রাগাশ্রয়ী গানে রাগ মিশ্রণ, ভিন্নস্বরের প্রয়োগ, অলংকার ইত্যাদি নানা দিক থাকে যা গানকে বৈচিত্র্যময় ও বর্ণিল করে তোলে। তবে রাগাশ্রয়ী গানে রাগপ্রধানের মত আলাপ, বিস্তার, তান-সরগম, বোলতান ইত্যাদির বাধ্যবাধকতা নেই।

দীর্ঘকাল হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের নিয়মের শেকল ভেঙ্গে নতুন গীতধারায় প্রবেশের যে চিন্তাধারা নিয়ে সংগীত অনুরাগীগণ ব্রত হয়েছিলেন সেই আকাঙ্খার সবচেয়ে মূল্যবান প্রাপ্তিটি ছিল 'রাগপ্রধান বাংলাগান'। এটি বাংলা আধুনিক গান ও হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের একদম সময়োপযোগী সমন্বয়। এতে রাগসংগীত অনুরাগী এবং বাংলা কাব্য সংগীতের ভক্ত-অনুরাগী সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। কোনও গীতশৈলী বিলুপ্ত হল না, অথচ নতুন এক হৃদয়গ্রাহী গীতধারার প্রণয়ন করা গেল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রাচীন গীতিরীতির বিলুপ্তির ফলে নতুন গীতিরীতির উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু রাগপ্রধান গানের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী রাগসংগীত কিংবা বাংলাগান কোনও পক্ষই

---

[১৪]শ্রী অমলেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী, *রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে*(কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ ৭৫-৭৬

ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। একারণেই রাগপ্রধান বাংলাগানকে আধুনিক যুগের বিস্ময়কর এক সৃষ্টি হিসেবে গণনা করা হয়। হিন্দুস্থানী রাগসংগীত হতে রাগপ্রধান বাংলাগান যে অংশটি প্রথম ও প্রধান উপাদান হিসেবে পেয়েছে তা হল 'রাগ'। এছাড়াও আর একটি জিনিস পেয়েছে তা হল সুরবিস্তারের স্বাধীনতা। তবে এই গান জনপ্রিয় হতে খুব বেশী সময় নেয়নি কারণ তৎকালীন শ্রোতা সমাজ এই গীতধারাটি খুব সহজেই আপন করে নিয়েছিল। রাগপ্রধান গানের প্রকৃত রসাস্বাদনের কারণেই তা সম্ভব হয়েছিল।

রাগপ্রধান অন্যান্য গীতশৈলী থেকে আলাদা হয়েছে এর আভ্যন্তরীণ রাগভাবের কারণে। বাংলাগানে রাগ-রাগিনীর ব্যবহার অনেককাল আগে থেকেই ছিল কিন্তু তাতে রাগের তাৎপর্য এত গুরুত্ব পেত না যতখানি রাগপ্রধান গানে পায়। কাজেই রাগভাব রাগপ্রধান গানের মূল বৈশিষ্ট্য। তৎকালীন কলকাতা কেন্দ্রীক রাগ সংগীত চর্চার সুস্পষ্ট প্রভাব রাগপ্রধান বাংলাগানে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বৈঠকী গানের আসর হতে রাগসংগীত বাংলা কাব্য সাহিত্যের ছাঁচে আধুনিক এক গীতশৈলী হিসেবে কলকাতায় আত্মপ্রকাশ করে রাগপ্রধান বাংলাগান নামে।

> অষ্টাদশ শতকের শেষ অর্ধ থেকে শুরু করে সমস্ত উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের নতুন করে ব্যাপক চর্চার যে ইতিহাস আমরা পাই, তাতে দেখি পশ্চিম ভারতের বহু বড় বড় ওস্তাদ বাংলাদেশে ঐ সময়ে এসেছেন ধনী জমিদারদের নিমন্ত্রণে। বাঙ্গালীরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের কাছে গান শিখেছেন। আবার অনেক বাংলাদেশের বাইরেও গেছেন একই কারণে। হিন্দী চর্চার মূল কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল বাংলার কয়েকটি বিখ্যাত শহরে। একটি হল বাঁকুড়া জেলার মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণপুর; দ্বিতীয়টি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে; তৃতীয়টি বর্ধমান; আর চতুর্থটি গড়ে উঠেছিল কলকাতায়।[১৫]

বাংলাগানের বাণী ও রাগিনীর মিলনের ধারাটিকে বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

> আমাদের দেশে সংগীতের দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সংগীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে, সেই ভেদ অনুসারে সংগীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় বাংলার বাইরে এবং বাংলাদেশে। কোন সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে সংগীত কবিতার অনুচর না হোক, সহচর বটে। বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন। এই জন্য গানের বাণীকে সুরের খাতিরে কিছু আপোষ করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়।[১৬]

---

[১৫]শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্স, ১৯৭২) পৃ ৬৮

[১৬]তদেব । পৃ ৭০

৫.৩ বাংলাদেশে রাগপ্রধান ও রাগাশ্রয়ী গান চর্চা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পূর্বেই এদেশে নিজস্ব গীতধারায় প্রচলন ছিল। রেডিও ঢাকা প্রতিষ্ঠার পর এদেশে অনেক গুণী সুরকার গীতিকার ও শিল্পীর সমাগম ঘটে। বিশেষত কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকা বেতারে যোগদানের পর কলকাতা বেতারের রাগপ্রধান গানের আবহ এখানেও তৈরী হয়। তবে তাঁর গান ক্রমেই নজরুল সংগীত হিসেবে খ্যাত হওয়ায় তাঁর রাগপ্রধান গানগুলিও নজরুল সংগীতের শাখায় স্থান পায়। এরপর অন্যান্য সুরকার ও সংগীত পরিচালকগণ রাগাশ্রয়ী গান রচনা ও অন্যান্য আধুনিক গানের প্রতি আগ্রহী হন। ফলে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের মাধ্যমে বাংলাগানের ক্ষেত্র আরো প্রশস্ত হয়। চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের রাগাশ্রয়ী গান ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৬৪ সালে টেলিভিশন এ সম্প্রচার শুরু হওয়ার পর নানা ধরনের গানের অনুষ্ঠানে এই গানগুলি প্রচারিত হতে থাকে। বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন এই ত্রয়ীর মাধ্যমে রাগপ্রধান, রাগাশ্রয়ী, আধুনিক যে নামেই হোক না কেন উচ্চাঙ্গীয় রীতির বাংলাগান হয়ে উঠেছিল সবার প্রিয়। বাংলাদেশে এ ধরনের গান চর্চার ক্ষেত্রেও সুরকার ও গীতিকারদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম, আবদুল হালীম চৌধুরী, শেখ লুৎফর রহমান, আবদুল আহাদ, সমর দাস, সুধীন দাশ, আবেদ হোসেন খান, কাদের জামেরি, আলী হোসেন, রবীন ঘোষ, আজিজুর রহমান, আহসান হাবীব, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সত্য সাহা, আবদুল লতিফ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। রাগসংগীত চর্চা এবং বাংলাগানে রাগভাব ফুটিয়ে তোলা সর্বোপরি বাংলাগানের মাধ্যমে রাগ সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এর বংশপরম্পরায় ছোট ভাই আয়েত আলী খাঁ এর পুত্র ও কন্যাগণ বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গীয় রীতির কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। শেখ সাদী খান, মোবারক হোসেন খান, রীনাত ফওজিয়া এবং আলাউদ্দিন খাঁ এর অপর ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা হোসেন খান, খাদেম হোসেন খান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ফিরোজা বেগম নজরুল সংগীত চর্চায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করলেও তাঁর ভাই আসাফউদ্দৌলা উচ্চাঙ্গ রীতিতে বাংলাগানের চর্চা করতে থাকেন। তাঁর সংগীত পরিচালনায় বর্তমানে বেশ কিছু রাগাশ্রয়ী গান বর্তমান সময়ের শিল্পীদের কণ্ঠে শোনা যায়।

বাংলাদেশে রাগপ্রধান বাংলাগানের বর্তমান প্রেক্ষাপট

রাগসংগীত ও বাংলাগানের শংকরায়ণের উৎকৃষ্ট ফসল রাগপ্রধান বাংলাগান বিংশ শতাব্দীতে এসে একটি স্বকীয় ধারার স্বীকৃতি পেয়েছে। রাগপ্রধান গান একান্তই বাংলা ভাষাভাষীদের নিজস্ব সম্পদ। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিভিন্ন রীতির পাশাপাশি রাগপ্রধান গান যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। "উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রাণ হচ্ছে রাগ। সেই রাগ রূপ সেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে তুলনীয় আর সেই প্রকাশ যখন কবিতার সাহিত্য অঙ্গের উপর ভিত্তি করে

গড়ে ওঠে তখন দুটোর একটাকে বাদ দিলে বা কোনটা নিম্নমুখী হলে সংগীত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।"[১৭] মানচিত্রের সীমারেখায় বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আজ দুই দেশের নাগরিক, যা অর্ধশত বছরেরও বেশি সময় পূর্বে এক ছিল। সংগীতকে সীমারেখায় ভাগ করা যায়না তবুও উভয় দেশেই অর্থাৎ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় ধারার পাশাপাশি এই উপশাস্ত্রীয় ধারার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলাদেশে টেলিভিশন, বেতার কেন্দ্রীক রাগপ্রধান গান চর্চার অনেক উদাহরণ রয়েছে। শুধু রাগপ্রধানই নয় এর পাশাপাশি বাংলা খেয়াল, গজল, রাগাশ্রয়ী গান সবকিছু মিলিয়ে বাংলা সংস্কৃতির ভান্ডার ভরপুর। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অসংখ্য পুরনো গানের রেকর্ড রয়েছে যেখানে রাগপ্রধান গান চর্চার নজির খুঁজে পাওয়া যায়। ফেরদৌসী রহমান, ফিরোজা বেগম, সোহরাব হোসেন, আজাদ রহমান, মো: আসাফউদদৌলাহ, রাজা হোসেন খান, শেখ সাদী খান, নিলুফার ইয়াসমিন, ফওজিয়া ইয়াসমিন, নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী প্রমুখ সংগীত শিল্পীর চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতায় রাগপ্রধান গান বাংলাদেশে তার অবস্থান শক্ত করেছে। উপমহাদেশের বিখ্যাত গজল গায়ক গুলাম আলীর গাওয়া মিঞামালহার রাগে 'মেঘ এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়", আজাদ রহমানের ঠুমরী অঙ্গে গাওয়া 'বঁধুয়া আমায় মনে রাখেনা", ফেরদৌসী রহমানের গাওয়া দরবারী কানাড়া রাগে 'প্রাণেতে দোলা দিয়ে যায়, শাহনাজ রহমতউল্লাহ এর মেঘ রাগে গাওয়া 'মেঘ ঘন বরষায় প্রাণ আজ কেঁদে কেঁদে যায়" ইত্যাদি গানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশে রাগপ্রধান গান খুব বেশি পাওয়া যায় না। তবে রাগাশ্রয়ী গান (আধুনিক) অনেক পাওয়া যায়। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ আজাদ রহমান বাংলাদেশে বাংলা খেয়াল গানের পথিকৃত। তাঁর গানগুলিকে সরাসরি রাগপ্রধান গান বলা যায়না, তবে ভাঙ্গা খেয়াল গান হিসেবে সুপরিচিত। বাংলা খেয়াল গানে তাঁর অবদান সর্বাধিক। বাংলাদেশে বাংলা খেয়াল গান চর্চার ধারাকে তিনি অব্যাহত রেখেছেন নিরলস ভাবে। আসাফউদ্দৌলা বেশ কিছু বাংলা গজল এবং রাগাশ্রয়ী গান করেছেন। শিল্পী প্রিয়াংকা গোপ এর গাওয়া 'সুরে সুরে হয়ত দেখা হবে (রাগ বৈরাগী), 'এখন সময় কি হলো তোমার (রাগ: জৌনপুরী) ইত্যাদি গান আধুনিক রাগাশ্রয়ী গানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। রাগ সংগীতে ওস্তাদ নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী বিশেষ অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার অন্যতম এই গুণীশিল্পীর রয়েছে অনেক রাগাশ্রয়ী আধুনিক গান। গানগুলি সরাসরি আধুনিক গান হিসেবে জনপ্রিয় হলেও তাঁর উচ্চাঙ্গরীতির গায়কী এবং গানের সুরে রাগের অবয়ব ধরা পড়ে খুব সহজেই, তাই বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। যেমন: 'আজ এই বৃষ্টির কান্না দেখে মনে পড়ল তোমায়" গানটি ইমন রাগাশ্রিত একথা বলা যায়। 'ডেকোনা পিছু ডেকো না" গানটি সম্পূর্ণ গজল আঙ্গিকে গেয়েছেন তিনি। বর্তমানে খায়রুল আনাম শাকিল, সানী জুবায়ের প্রমুখ শিল্পীগণ বাংলাদেশে রাগপ্রধান

---

[১৭]মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*(কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩) পৃ ৪২৫

গান, রাগাশ্রয়ী গান ইত্যাদি চর্চা করে যাচ্ছেন। জনপ্রিয় নজরুল সংগীত শিল্পী খায়রুল আনাম শাকিল নজরুলে রাগপ্রধান গান গেয়ে পুরোনো সৃষ্টিগুলোর নতুন করে আকর্ষণ সৃষ্টি করেন। এই গানগুলোর মধ্যে রয়েছে- নীলাম্বরী শাড়ি পরি, দোলন চাঁপা বনে দোলে, একি অসীম পিয়াসা, আজো কাঁদে কাননে ইত্যাদি জনপ্রিয় রাগপ্রধান গান। নজরুলের রাগপ্রধান বাংলাগান গেয়েছেন এমন শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন- নিলুফার ইয়াসমিন, সোহরাব হোসেন, ইয়াসমিন মুশতারী, নাসিমা শাহীন, সুমন চৌধুরী, প্রিয়াংকা গোপ, শারমিন সাথী ইসলাম, মাহমুদুল হাসান, বিজন চন্দ্র মিস্ত্রী, ইয়াকুব আলী খান প্রমুখ ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী সংগীত কলেজ, শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠী (ঢাকা), হিন্দোল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী (রাজশাহী), লাক্ষ্যাপার সংগীত সম্মেলন (নারায়ণগঞ্জ), সদারঙ্গ সংগীত পরিষদ (চট্টগ্রাম), ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তন, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার ধারা অব্যাহত রয়েছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা সুপ্রসারিত হওয়ার ফলে রাগপ্রধান বাংলাগান ও রাগাশ্রয়ী গানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে অনেকাংশে।

উপসংহার

বাংলাদেশে ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত উপশাস্ত্রীয় ধারার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারা রাগপ্রধান গান। ঊনবিংশ শতকের অবিস্মরণীয় এই উদ্ভাবন বাংলা সংগীতকে করেছে ঐশ্বর্যমন্ডিত। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে রাগপ্রধান গান সবচেয়ে বেশী সমাদৃত। যদিও এই ধরণের গান খুব কম সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীতের মতোই রাগপ্রধান গান বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তবে অন্যান্য গীতধারার সাথে রাগপ্রধান গানের পার্থক্য হল এর গায়কী এবং বৈশিষ্ট্যে। রাগপ্রধান গান শিল্প সম্মত চিত্তের কল্পনা প্রসূত সৃষ্টি। কল্পনার মিল হতে হয় মাপ মত, কোথাও কম নয়, বেশি নয়। ঊনবিংশ শতকের শিল্প বিপ্লবের অমূল্যধন রাগপ্রধান গান বিংশ শতকে এসে এক মহাবিস্ময় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে শিল্প সৃষ্টিকর্তাদের সঠিক মাপজোখের কারণেই। রাগপ্রধান যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা কোন ছবি যেখানে রঙের খেলা আর শিল্পীর মনের প্রতিচ্ছবি। কাব্যের বুননে আর সুরের আঁটুনীতে রাগপ্রধান গানের রঙ ছড়ায় শিল্পীর গায়কী। তবে শ্রোতা যেন বুঝতে পারে যে এটি রাগপ্রধান গান -এ বিষয়টি মাথায় রেখেই রাগপ্রধান গানের সৃষ্টি। কথার আধুনিকতা, সুরের আবেদন, শৃংগার রসাত্মক ভাবের সম্মিলনে শ্রোতার হৃদয় জয় করাই রাগপ্রধান গানের একমাত্র লক্ষ্য। এতে রাগরূপ হবে বলিষ্ঠ এবং সুরের বৈচিত্র্যময়তা থাকবে। রাগপ্রধান গান হিন্দুস্থানী রাগে রচিত, তাই এতে আভিজাত্য থাকবে, পাশাপাশি বাংলা গানের সারল্যও থাকা উচিত। আধুনিক গান হিসেবে রাগপ্রধান গান এ কারণেই ব্যতিক্রম যে, এই গানে সবকিছুর মিলিত রূপ পাওয়া যায়। ভারতীয় রাগ, যা সুপ্রাচীনতার সাক্ষী বহন করে এর সাথে বাংলা ভাষার কাব্যরস মিলে হল আধুনিক এক শ্রেণির গান - রাগপ্রধান গান রাগপ্রধান গান আধুনিক গান দ্বারা প্রভাবিত। কারণ রাগবিস্তার, তান-সরগম ছাড়া সবই আধুনিক গান। তাই রাগপ্রধান গানকে আধুনিক গান হতে পার্থক্যপূর্ণ করে এর রাগরূপ ও সুরবৈচিত্র্য। এ কারণেই নতুন রাগ সৃষ্টির চেয়ে রাগপ্রধান গান বেশী জনপ্রিয়। প্রচলিত রাগসমূহকে নতুনভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে রাগপ্রধান গান বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। পরিশেষে একটি কথাই বলা যায় যে, রাগসংগীত ও বাংলাগানের মিশ্রিত রূপ; রাগপ্রধান বাংলাগান আমাদের বাংলাগান ও রাগসংগীত এ দু'য়ের চাহিদাই মেটাতে সক্ষম। সুতরাং রাগপ্রধান গানকে অবলীলায় আধুনিক গানের আদর্শরূপে আখ্যায়িত করা যায়, যার সংযোগস্থল পৌঁছে গেছে শেকড়ের গভীর পর্যন্ত।

রাগপ্রধান বাংলাগান স্বীয়গুণে অন্যান্য ধারা হতে পৃথক হয়েছে এবং বাংলাগানের বিশিষ্ট একটি ধারা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৪৭ সালে ভারত বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলা ভাষী অঞ্চল দুটি খন্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। ভারতীয় রাগসংগীত বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতক হতেই গোড়াপত্তন ঘটিয়েছে। দুই খন্ডে বিভক্ত হলেও সংস্কৃতিকে আলাদা করা যায় নি। তাই ভারতীয় রাগসংগীত ও রাগপ্রধান গানও ছিল অবিচ্ছিন্ন। তবে ভারতীয় রাগ

সংগীতের চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা যেভাবে ভারতে হয়েছে, বাংলাদেশে তা তুলনামূলক ভাবে কম হয়েছে। তবে একেবারেই যে হয়নি তা নয়। বাংলাদেশে ও কলকাতায় রাগপ্রধান গানের প্রভাব সমান ভাবেই পড়েছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাগপ্রধান গানের আবেদন কোনদিনও কম হবার নয়। তাই বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কলাকুশলীদের একান্ত প্রচেষ্টায় রাগপ্রধান বাংলাগানের বিকাশ ঘটেছে দ্রুত। ভারতীয় রাগ-রাগিনীর আদর্শে বাংলা গানের এই ধারাটি আজ একবিংশ শতকে এসেও জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। খেয়াল- ধ্রুপদ- ঠুমরীর পাশাপাশি বাংলা ভাষার এই গান শুনে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছে সকলে। হালের আধুনিক গানেও রাগের ব্যবহার বেড়েছে। ব্যান্ডের গান, নাটকের গান, চলচ্চিত্রের গানেও রাগ সংগীতের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাগপ্রধান গান জনপ্রিয় না হলে রাগ রাগিনীর এত বহুল ব্যবহার হয়ত সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশে রাগপ্রধান গান চর্চার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করা, বাংলা সাহিত্যে ভারতীয় রাগ-রাগিনীর ব্যবহার, দেশী সংগীতে রাগের প্রতুলতা ইত্যাদি অনুসন্ধান সাপেক্ষে রাগপ্রধান বাংলা গানের ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ উপস্থাপন করাই এই গবেষণাকর্মটির মূল উদ্দেশ্য। এই গবেষণাকর্মের মাধ্যমে রাগপ্রধান বাংলাগানের রাগরূপ ও সুরবৈচিত্র্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করা সম্ভব এবং ভবিষ্যতে এই অভিসন্দর্ভটি রাগপ্রধান বাংলাগান সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণা কাজে সহায়ক হবে বলে আশা করি।

পরিশিষ্ট - ১ চিত্র - রাগপ্রধান বাংলাগানের শিল্পী

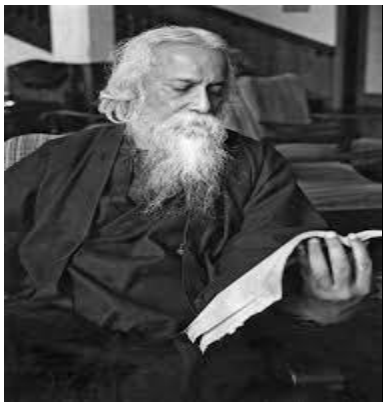

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

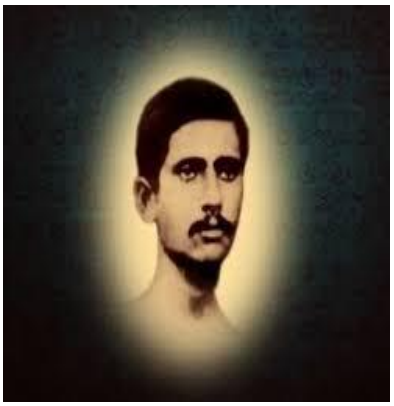

রজনীকান্ত সেন

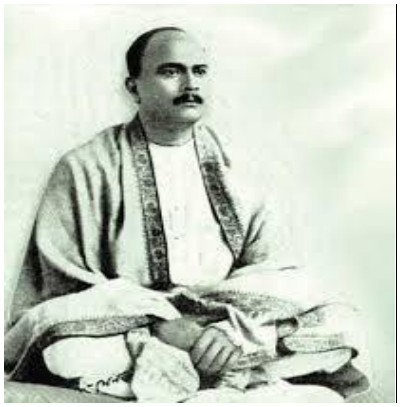

অতুলপ্রসাদ সেন

কাজী নজরুল ইসলাম

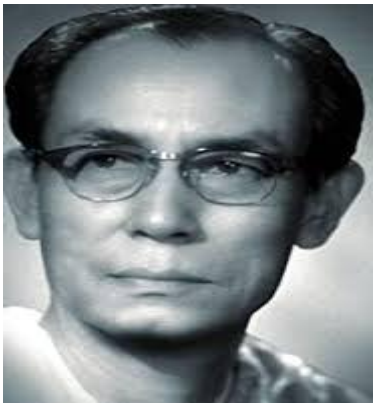

শচীনদেব বর্মন

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

তারাপদ চক্রবর্তী

চিন্ময় লাহিড়ী

সুধীর লাল চক্রবর্তী

অখিলবন্ধু ঘোষ

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

বেগম আখতার

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

অজয় ভট্টাচার্য

সন্ধ্যা মুখার্জী

নির্মলা মিশ্র

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

অজয় চক্রবর্তী

হৈমন্তী শুক্লা

লায়লা আর্জুমান্দ বানু

ফিরোজা বেগম

মুন্সী রইস উদ্দিন

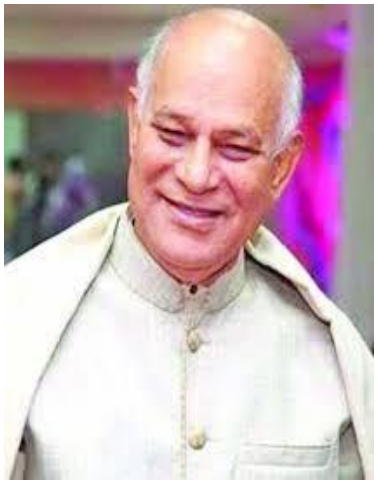

আজাদ রহমান

ফেরদৌসী রহমান

নিলুফার ইয়াসমিন

দীপালী নাগ

গায়ত্রী বসু

অরুণ ভাদুরী

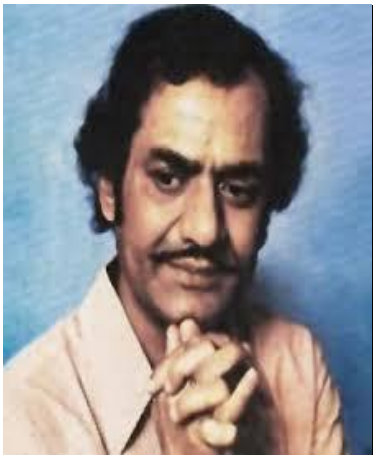

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

শিপ্রাবসু

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আরতি মুখোপাধ্যায়

অমলেন্দু বিকাশ কর

[১]চিত্র সূত্র - Google photos.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ২ উল্লেখযোগ্য রাগপ্রধান বাংলাগানের তালিকা

ক্রমিক	গান	রাগ	শ্রেণী	ডশল্পী	গীতিকার	সুরকার
১.	ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দ দুলাল	নটমল্লার	ভজন	জ্ঞানেন্দ্র প্রকাশ গোস্বামী	তুলসী লাহিড়ী	তুলসী লাহিড়ী
২.	চিরসুন্দর নওল কিশোর	ভৈঁরো	ভজন	জ্ঞানেন্দ্র প্রকাশ গোস্বামী	তুলসী লাহিড়ী	তুলসী লাহিড়ী
৩.	ওগো যাহা কিছু মম	-	টপ্পা	জ্ঞানেন্দ্র প্রকাশ গোস্বামী	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
৪.	শূণ্য এ বুকে পাখী মোর আয়	ছায়ানট	টপ্পা	জ্ঞানেন্দ্র প্রকাশ গোস্বামী	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
৫.	আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে	-	টপ্পা	জ্ঞানেন্দ্র প্রকাশ গোস্বামী	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
৬.	ফুলেরি দিন হল যে অবসান	জয়জয়ন্তী	রাগ প্রধান	ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়	অজয় ভট্টাচার্য	অজয় ভট্টাচার্য
৭.	নবারুন রাগে তুমি সাথী গো	-	ভৈরবী	ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়	শৈলেন রায়
৮.	যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা	কাফী	ভৈরবী	ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়	অজয় ভট্টাচার্য	অজয় ভট্টাচার্য
৯.	খোল খোল মন্দির দ্বার	তিলং মিশ্র	খেয়াল	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী
১০.	বনে বনে পাপিয়া বোলে	ঊাহার	খেয়াল	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী
১১.	ফুলে ফুলে কি কথা	গুর্জরী টোড়ী	খেয়াল	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী
১২.	ওগো আমি পাব না শ্যাম	বেহাগ	খেয়াল	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী
১৩.	কোথা গেল শ্যাম	ভৈরবী	খেয়াল	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী
১৪.	মম মন্দিরে কে এলে	আড়ানা	রাগ প্রধান	শচীনদেব বর্মন	হিমাংশু দত্ত	হিমাংশু দত্ত
১৫.	নতুন ফাগুণে আজি	মিশ্র গান্ধারী	খেয়াল	শচীনদেব বর্মন	হিমাংশু দত্ত	হিমাংশু দত্ত
১৬.	অন্তর দ্বার খোল গো খোল		রাগ প্রধান	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
১৭.	জোছনা করেছে আড়ি	পিলু	ঠুমরী	বেগম আখতার	রবিগুহ মজুমদার	রবিগুহ মজুমদার
১৮.	তুমিতো জানো না	রাগেশ্রী	রাগ প্রধান	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরী প্রসন্ন	গৌরী প্রসন্ন

Dhaka University Institutional Repository

					মজুমদার	মজুমদার
১৯.	পিয়া ভোল অভিমান	পিলু	ঠুমরী	বেগম আখতার	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
২০.	রাধানামে বাঁশরী বাজে		রাগ প্রধান	চিন্ময় লাহিড়ী	পবিত্র মিত্র	চিন্ময় লাহিড়ী
২১.	সে কুহু যামিনী	জয়জয়ন্তী	রাগ প্রধান	অখিলবন্ধু ঘোষ	পুলক বন্দোপাধ্যায়	অখিলবন্ধু ঘোষ
২২.	আমার সেহেলী ঘুমায়	মারুবেহাগ	রাগ প্রধান	অখিলবন্ধু ঘোষ	অরুপ বন্দ্যোপাধ্যায়	অখিলবন্ধু ঘোষ
২৩.	যেতে যেতে সে চুরি করে	ভৈরবী	রাগ প্রধান	অখিলবন্ধু ঘোষ	রতু মুখোপাধ্যায়	রতু মুখোপাধ্যায়
২৪.	শোন শোন চলে যেও না	নাগরঞ্জিনী	রাগ প্রধান	অখিলবন্ধু ঘোষ	রতু মুখোপাধ্যায়	রতু মুখোপাধ্যায়
২৫.	হল নিশি ভোর	কাফী ভৈরবী	রাগ প্রধান	কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬.	নয়নে কাজল রেখা	-	রাগ প্রধান	দীপালী নাগ	হিমের নস্কর	হিমের নস্কর
২৭.	মধু বসন্তের আজি	বসন্ত	রাগ প্রধান	দীপালী নাগ	শ্যামল গুপ্ত	দীপালী নাগ
২৮.	আমায় বোলো না ভুলিতে		রাগ প্রধান	দীপালী নাগ	হিমেল নস্কর	দীপালী নাগ
২৯.	চামেলী মেল আঁখি	ভূপালী	খেয়াল	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী	তারাপদ চক্রবর্তী
৩০.	আজি নিঝুম রাতে	দরবারী	রাগ প্রধান	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী	তুলসী লাহিড়ী	তুলসী লাহিড়ী
৩১.	মধুরাতি ভোর হয়	কোমল আশাবরী	রাগ প্রধান	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়
৩২.	কেন ফিরে যাও	কলাবতী	রাগ প্রধান	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র	চিন্ময় লাহিড়ী
৩৩.	এ বেদনা কেমনে সহি	দরবারী কানাড়া	রাগ প্রধান	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়
৩৪.	রিমিঝিমি রিমিঝিমি আষাঢ়ের অভিসার	গৌড়মল্লার	রাগ প্রধান	দিপালী নাগ	হিমেল নস্কর	দিপালী নাগ
৩৫.	ডাকে না কেন যে বাঁশি	বৈরাগী	রাগ প্রধান	সতীনাথ মুকোপাধ্যায়	হিমেল নস্কর	দিপালী নাগ
৩৬.	ঘনদেয়া আষাঢ়ের জলসায়	মিশ্র	রাগ প্রধান	দিপালী নাগ	হিমেন নস্কর	দিপালী নাগ
৩৭.	তুমি ব্যাথা দিলে ব্যাথা নাহি পাই	-	রাগ প্রধান	অরুণ ভাদুরী	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ

Dhaka University Institutional Repository

৩৮.	নিদ হারা আজ রাতে গায় পাপিয়া	-	রাগ প্রধান	বেচু দত্ত	প্রণব রায়	শচীনদেব বর্মন
৩৯.	রিনিঝিনি বরষে গরজে	মিয়ামালহার	রাগ প্রধান	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ
৪০.	বাঁধো বুলনা তমাল বনে	বসন্ত	রাগ প্রধান	সন্ধ্যা মুখার্জী	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
৪১.	আসিলে কি মেঘমেদূর	দেশ	রাগ প্রধান	কৃষ্ণচন্দ্র দে	শৈলেন রায়	কৃষ্ণচন্দ্র দে
৪২.	ঘন ডম্বরু বাজে	-	রাগ প্রধান	কৃষ্ণ চন্দ্র দে	শৈলেন রায়	কৃষ্ণচন্দ্র দে
৪৩.	আমি তোমারি গাহি জয়	-	রাগ প্রধান	কৃষ্ণ চন্দ্র দে	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
৪৪.	রজনী ফুরালো যে পথপানে চাহিয়া	-	রাগ প্রধান	চিন্ময় লাহিড়ী	পবিত্র মিত্র	চিন্ময় লাহিড়ী
৪৫.	মা মা বলে ডাকি কালী	ললিত	রাগ প্রধান	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ
৪৬.	রাজার দুলালী জুলেখা	-	রাগ প্রধান	সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়	বন্দে আলী মিয়া	দূর্গা সেন
৪৭.	আজি বসন্তে মঞ্জুবায়	বসন্ত	রাগ প্রধান	অরূণ ভাদুরী	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
৪৮.	মথুরা মধুর হল শ্যাম	-	রাগ প্রধান	শিপ্রা	শ্যামল গুপ্ত	চিন্ময় লাহিড়ী
৪৯.	ফিরায়ে দিওনা মোরে শূণ্য হাতে	পিলু	রাগ প্রধান	বেগম আখতার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
৫০.	কি করি সজনী আসেনা প্রীতম	পিলু	রাগ প্রধান	সন্ধ্যা মুখার্জী	ওস্তাদ মনোয়ার আলী খান	শ্যামল গুপ্ত
৫১.	কাটে না বিরহেরই রাত	খেয়াল অঙ্গ	রাগ প্রধান	সন্ধ্যা মুখার্জী	শ্যামল গুপ্ত	ওস্তাদ মনোয়ার আলী খান
৫২.	আমি সুরে সুরে ওগো	-	রাগ প্রধান	অজয় চক্রবর্তী	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ	জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
৫৩.	তুমি না এলে জলসা ঘরে	-	রাগ প্রধান (গজল)	শিপ্রাবসু	অতনু চক্রবর্তী	অতনু চক্রবর্তী
৫৪.	এ মৌসুমী পরদেশে	ঊাহার	রাগ প্রধান	বেগম আখতার	রবী গুহ মজুমদার	রবী গুহ মজুমদার
৫৫.	ফিরে যা বনে কালো বুলবুল	ডপলু	রাগ প্রধান	বেগম আখতার	রবী গুহ মজুমদার	রবী গুহ মজুমদার
৫৬.	গুঞ্জন মঞ্জির পায়	-	রাগ প্রধান	অজয় চক্রবর্তী	-	-
৫৭.	শোন দেয়া ডাকে গুরু গুরু	দেশ	রাগপ্রধান	অজয় চক্রবর্তী	-	-
৫৮.	চুপি চুপি চলে না গিয়ে	-	রাগপ্রধান	বেগম আখতার	রবী গুহ মজুমদার	রবী গুহ মজুমদার

Dhaka University Institutional Repository

৫৯.	যমুনা কি বলতে পারে	কিরওয়ানী	রাগপ্রধান	শিপ্রা বসু	সুনীল বরণ	সুকুমার মিত্র
৬০.	রূপসী তো এই গো আমি	কিরওয়ানী	রাগপ্রধান	শিপ্রাবসু	-	-
৬১.	গহন মায়ার ছলনা	-	রাগপ্রধান	অজয় চক্রবর্তী	-	-
৬২.	ঝন ঝন মঞ্জির বাজে	নট বেহাগ	রাগপ্রধান	শচীন দেব বর্মন	-	-
৬৩.	রিনিঝিনি মঞ্জির বাজে	-	রাগপ্রধান	গায়ত্রী বসু	অনল চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল মিত্র
৬৪.	মন না চাইলে গান হয়না	-	রাগপ্রধান	শিপ্রাবসু	সুনীল বরণ	গোবিন্দ বসু
৬৫.	গানে গানে কে গো ঘুম ভাঙালো	রাগ ললিত	রাগপ্রধান	শিপ্রাবসু	গোপাল দাশগুপ্ত	গোপাল দাশগুপ্ত
৬৬.	বাজু মোর খুলে খুলে যায়	ভৈরবী	রাগপ্রধান	শেফালী ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	চিন্ময় লাহড়ী
৬৭.	মন বলে তুমি আছ ভগবান	ভৈরবী	রাগপ্রধান	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী	-	-
৬৮.	কিছুতে কাটেনা দিন সজনী বিনা	মধুকোষ	রাগপ্রধান	হরিহর শুক্লা	হরিহর শুক্লা	হরিহর শুক্লা
৬৯.	এ কি তন্দ্রা বিজরিত	মালকোষ	রাগপ্রধান	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
৭০.	গুঞ্জরনে এলো অলি	-	রাগপ্রধান	অরুণ ভাদুরী	অমলেন্দু বিকাশ কর	অমলেন্দু বিকাশ কর
৭১.	ভোরের শিশির	বিলাস খানী টোড়ী	রাগপ্রধান	অজয় চক্রবর্তী	অরুণ ভাদুরী	-
৭২.	কেন তুমি প্রিয়	-	রাগপ্রধান	ভারতী কর	অমলেন্দু বিকাশ কর	অমলেন্দু বিকাশ কর
৭৩.	অবেলায় বসে ভাবি বেলা যায়	যোগ	রাগপ্রধান	অমলেন্দু বিকাশ কর	-	-
৭৪.	ঐ ঘিরে আসে বাদলের মেঘ	দেশ	রাগপ্রধান	অরুণ ভাদুরী	অমলেন্দু বিকাশ কর	-
৭৫.	তীলক দিলে কে শ্যাম	তীলককামোদ	রাগপ্রধান	জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ	তুলসী লাহিড়ী	--

৭৬.	এই চারু কেশে সুচারু কবরী	চারুকেশী	রাগপ্রধান	আরতি	সুবির হাজরা	সগীরুদ্দিন
৭৭.	মেঘ এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়	মিয়া মালহার	ঠুমরী অঙ্গ	গুলাম আলী	আসাফউদ্দৌলা	-
৭৮.	বঁধূয়া আমায় মনে রাখেনা	ডপলু	ঠুমরী অঙ্গ	আজাদ রহমান	আজাদ রহমান	-
৭৯.	প্রাণেতে দোলা দিয়ে যায়	দরবারী কানাড়া	রাগপ্রধান	ফেরদৌসী রহমান-আলী হোসেন	মো: মনিরুজ্জামান	আলী হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

- অজয় চক্রবর্তী, *শ্রুতিনন্দন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯
- অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, কলকাতা, ১৯৬১।
- অসিত রায়, *সংগীত অন্বেষা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৯
- অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলাগানের পথচলা*, আজকাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪
- অঞ্জলি চক্রবর্তী, *ঠুমরী গানের ইতিকথা* (প্রথম খন্ড), মূখার্জী প্রিন্টার্স, কলকাতা ১৪১০।
- অপূর্ব সুন্দর মৈত্র, *সংগীত কথা*, ৪২ মহেশ চৌধুরী লেন, কলকাতা ১৯৯৬।
- অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *সঙ্গীতের সোন্দর্যচিন্তা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা : ১৯৯৫।
- অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্মৃতির আলোয় আমার জীবন ও গান*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা : ২০০৭।
- অহোবল পণ্ডিত, *সঙ্গীত পারিজাত*, দিপায়ন, কলকাতা: ২০০১।
- আব্দুস সাত্তার, *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ঢাকা, ২০০৩
- আসাদুল হক, *নজরুল-সংগীত স্বরলিপি*, নজরুল ইনষ্টিটিউট, ঢাকা, ২০১১
- ইদরিস আলী, *নজরুল সংগীতের সুর*, নজরুল ইনষ্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭
- উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস* প্রথম খন্ড, কলকাতা, ১৯৮৪
- উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত*, দীপায়ন, কলকাতা, ১৮০৫ ব.
- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, *ভারতীয় সঙ্গীত*, সুত্রধর, কলকাতা: ২০১৩।
- উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত*, সলিল সাহা, কলকাতা : ১৩৯৭।
- এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮২
- করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৫।
- করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বর্তমান ও আরো*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৪
- করুণাময় গোস্বামী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, অনুপমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫
- করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩
- কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কুদরত রঙ্গি বিরঙ্গী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা : ১৪০২।
- কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *মজলিস*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৬
- কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *খেয়াল ও হিন্দুস্থানী সংগীতের অবক্ষয়*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-২০০৩
- কৃষ্ণপদ মণ্ডল, *বাংলা রাগ সংগীত* (১ম খণ্ড), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও ঢাকা : ২০০৭।
- ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, *সঙ্গীতদর্শিকা*, রামকৃষ্ণ আশ্রম, ষষ্ঠদশ সংস্করণ, কলকাতা : ২০১০।
- জগৎ ঘটক , কাজী অনিরুদ্ধ, *নবরাগ*, নজরুল ইনষ্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৫
- জগদানন্দ বড়ুয়া, *সঙ্গীত রত্নাকর* (১ম খণ্ড), প্রকাশক : শ্রী জগদানন্দ বড়ুয়া, কলকাতা : ১৯৮৬।
- জগদানন্দ বড়ুয়া, *সঙ্গীত রত্নাকর* (২য় খণ্ড), প্রকাশক : শ্রী জগদানন্দ বড়ুয়া, কলকাতা : ১৯৮৭।
- জয়কৃষ্ণ মাইতি, *তবলা শাস্ত্র প্রভাকর*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা।
- জামিল চৌধুরী, *আধুনিক বাংলা অভিযান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৪২২।
- জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, *তহজীব এ মৌসিকী*, কলকাতা, ১৪০১ ব.

- দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা : ১৩৮৪।
- দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত সোবন*, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা : ২০০৪।
- দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত*- তত্ত্ব (তবলা প্রসঙ্গ), ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৮২।
- দেবব্রত দত্ত, সঙ্গীত- তত্ত্ব (শাস্ত্রীয় তথা ভাব সঙ্গীত প্রসঙ্গ), ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা : ১৪০২।
- দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত-সহায়িকা* (শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রশ্নোত্তরী পুস্তক) ১ম খণ্ড, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৭৫।
- দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত-সহায়িকা* (শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রশ্নোত্তরী পুস্তক) ২য় খণ্ড, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৭৬।
- দেবব্রত দত্ত, *সংগীততত্ত্ব*- প্রথম খন্ড, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২
- দেবব্রত দত্ত, *সংগীততত্ত্ব*- দ্বিতীয় খন্ড, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১
- নবনীতা চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীত প্রকর্ষ ইতিহাস ও তত্ত্ব*, বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা : ১৯৯৬।
- নার্গিস নাসির, *খেয়াল রীতির গানের ঘরানা-ভেদে পরিবেশন পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য এবং নান্দনিক বিচার বিশ্লেষণ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা : ২০১১।
- নিবেদিতা কোসর, *ষড়জ পঞ্চম* (প্রথম ভাগ), কোসর পাবলিকেশন্স, কলকাতা : ১৯৮৯।
- নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, *সঙ্গীত পরিচিতি* (পূর্বভাগ), আদিবাস ব্রাদার্স, কলকাতা : ১৩৫৭।
- দীপ্তি প্রকাশ মজুমদার, *হাজার বছরের বাংলা গান*, কলকাতা, ২০০৩
- পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি* (প্রথম খণ্ড), রেণুকা সাহা, কলকাতা : ১৩৯৬।
- পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি* (তৃতীয় খণ্ড), রেণুকা সাহা, কলকাতা : ১৩৯৭।
- পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি* (সপ্তম খণ্ড), রেণুকা সাহা, কলকাতা : ১৩৯৮।
- পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহরী* (১ম খণ্ড), দীপয়ন, কলকাতা : ১৪০২।
- পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহরী* (২য় খণ্ড), দীপয়ন, কলকাতা : ১৪০৩।
- পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহরী* (৩য় খণ্ড), দীপয়ন, কলকাতা : ১৪০৫।
- পাপড়ি চক্রবর্তী, *নান্দনিক ভাবনায় ভারতীয় সঙ্গীত*, সুমাল্য ভট্টাচার্য, কলকাতা : ২০০৫।
- প্রদীপকুমার ঘোষ, *দক্ষিণ ভারতের সংগীত*, শিবলিঙ, কলকাতা : ১৯৮৯।
- প্রদীপকুমার ঘোষ, *ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিবর্তন* (সংগীত মূল্যায়ন বক্তৃতামালা), পশ্চিমবঙ্গ বাদ্য সংগীত একাডেমী, কলকাতা : ১৯৮৯।
- প্রদীপকুমার ঘোষ, *মধ্যযুগের সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞ*, শিবলিঙ, কলকাতা : ২০১০।
- প্রদীপকুমার ঘোষ, *সংগীত শাস্ত্র সমীক্ষা*, পশ্চিমবঙ্গ বাদ্য সংগীত একাডেমী, কলকাতা : ২০০৫।
- প্রদীপ কুমার ঘোষ, *ভারতীয় রাগ রাগিনীর ক্রমবিবর্তন*, আশিষ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪০৯ ব
- প্রদীপ কুমার ঘোষ, *বাংলায় রাগ সংগীত চর্চার ধারা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আকাদেমী, কলকাতা, ১৯৯৯
- প্রভাত কুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা*, প্রকাশক-শ্রীমতী বসুধা গোস্বামী ও বন্যা গোস্বামী, কলকাতা, ২০০৫

- বাসুদেব ঘোষাল, *সঙ্গীত মুকুল* (প্রথম খণ্ড), নাথ পাবলিশিং, কলকাতা : ১৪১২।
- বিনতা মৈত্র, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের রীতি বিবর্তন*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৬
- বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, *ভারতীয় সঙ্গীতকোষ*, সাম্প্রতম প্রকাশন, কলকাতা : ১৩৭২।
- বিমলা রায়, সম্পাঃ ড. প্রদীপকুমার ঘোষ, রাগ-রহস্য, শিবলিঙ, কলকাতা : ২০১১।
- শামীম আমিনুর রহমান, *বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা ও গুনীজন*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা, ২০১৪
- ম ন মুস্তাফা, *আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১
- মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৩
- মুশাররাত শবনম ও ফিরোজ আহমেদ ইকবাল, *সঙ্গীত মুখশ্রী* (হাজার বছরের সঙ্গীতজ্ঞ-শাস্ত্রকারদের জীবনী), ম্যাগমাম ওপাস, শাহবাগ, ঢাকা : ২০১২।
- মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৫
- মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *সংগীত-সংলাপ*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, সুত্রাপুর, ঢাকা : ২০০৪।
- মোবারক হোসেন খান, *সংগীত মালিকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৬
- মোবারক হোসেন খান, *সংগীত প্রসঙ্গ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০
- মোবারক হোসেন খান, *সংগীত সাধনা* , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫
- মোবারক হোসেন খান, *রাগসংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫
- মোবারক হোসেন খান, *কণ্ঠ সাধন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা : ১৩৯৬।
- মোবারক হোসেন খান, *গীতমঞ্জুরী*, বাংলা শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা : ২০০৫।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীত চিন্তা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা, ১৩৯৯ ব.
- রবিশঙ্কর, *রাগ-অনুরাগ*, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৮০।
- রামকৃষ্ণ দাস, *আমীর খুসরৌ ভারতীয়*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা : ২০০৩।
- রামপ্রসাদ রায়, *সংগীত জিজ্ঞাসা*, শ্রীমতী নমিতা রায়, কলাকাতা : ২০০৩।
- রেবা মুহুরী, *ঠুমরী ও বাইজী*, প্রতিভাস, কলকাতা : ১৯৮৬।
- লীনা তাপসী খান, *নজরুল সংগীতে রাগের ব্যবহার*, নজরুল ইনষ্টিটিউট, ঢাকা ২০১১
- শক্তিপদ ভট্টাচার্য, *উচ্চাঙ্গ ক্রিয়াত্মক সংগীত*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা : ১৯৮০।
- শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা*, আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা, ১৯৭২
- শ্রী অমলেন্দু বিকাশ কর চৌধুরী, *রাগপ্রধান গানের উৎস সন্ধানে*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪
- সাবিত্রী ঘোষ, *বাংলা গানের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, ১৯৭৬
- সুকুমার রায়, *বাংলা সংগীতের রূপ*, কলকাতা, ১৩৭৬ ব.
- সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *সঙ্গীত রত্নাকর* (অনুবাদ), ড. সন্তোষকুমার ঘড়ুই, রবীন্দ্রভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা : ১৩৭৯।
- সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *নন্দনতত্ত*, সন্দেশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫
- স্বপন নস্কর, *ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা*, শিল্পী প্রকাশিকা, কলকাতা, ২০০৯
- স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*, (প্রথম ভাগ), শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ১৯৫১
- স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ,*ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস*, (তৃতীয় ভাগ) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা : ১৩৯৪।

- স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ,*ভারতীয় সঙ্গীত* (ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা), শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা : ১৯৮৬।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের বাংলাগান*, কলকাতা, ১৯৬৯
- Mobarak Hossain Khan, *Music and its study*, Sterling publishers pvt. Ltd., India, 1988
- B C Deva, *Indian Music*, ICCR, India, 1995
- Bimalakant Roy Chaudhury, *The Dictionary od Indian Classical Music*, Motilal Banarsidas Publication, India, 2000.
- Anupam Mahajan, *Ragas in Indian Classical Music* Vol 1. Gian Publishing House, India, 1989.

- **পত্রিকাঃ**
  - অসিত রায়, 'প্রসঙ্গ: ধ্রুপদ গানের বিকাশ', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আকাদেমী পত্রিকা ৮ম, পৃ ৯৩-৯৭
  - অভ্র বসু, রাগ রাগিনীর ভাব ও রবীন্দ্রনাথের গান, সম্পাদক: অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ প্রাক্ শারদীয় সংখ্যা: বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৪ কলকাতা পৃ ৮৫-১১০
  - কিশোর চক্রবর্তী, রসাস্বাদনের প্রক্ষাপটে রাগ রাগিনীর শ্রেণিবিভাজন একটি ভাবনা, সম্পাদক: অনিল আচর্য, অনুষ্টুপ প্রাক্- শারদীয় সংখ্যা, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৪, কলকাতা পৃ ১৮-৩৪
  - বিমল রায়, 'রাগের প্রকারভেদ' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী পত্রিকা, ৮ম, পৃ ১৪-১৮
  - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সংগীত', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী পত্রিকা ৭ম, পৃ ৫২-৬৪
- **ওয়েবসাইট ও অন্যান্য:**
  - https://www.ee.iitb.ac.in/web/files/publications/KoduriP2011.pdf
  - https://www.thehindu.com/entertainment/music/what-are-the-ways-to-identify-a-raga/article25680239.ece
  - http://www.geocities.ws/charubon_riyadh/jonoknazrul.pdf
  - https://lokogandhar.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%9e%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%aa/#comment-12391
  - https://www.sahapedia.org/bhaarataiya-saasataraiya-samgaitaera-baisanaupaura-gharaanaa
  - https://www.sahapedia.org/baisanaupaura-gharaanaara-panadaita-saujaita-ganagaopaadhayaayaera-saathae-saakasaatakaara
  - https://books.google.com.bd/books?id=SJXmDwAAQBAJ&pg=PA9&lpg=PA9&dq=ragpradhan+bengali+songs+by+narayan+choudhury

&source=bl&ots=XlR9ak0FFW&sig=ACfU3U2sGMybGmtaI86KNgqzcY2lshl-Hw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjIhsTxlqPuAhVb4zgGHUSpBn4Q6AEwB3oECAYQAg#v=onepage&q=ragpradhan%20bengali%20songs%20by%20narayan%20choudhury&f=false

- http://nazrulinstitute.portal.gov.bd/site/publications/ababa397-75f3-45f6-bbea-cd7b10ddbc1f/-
- http://www.rub.ac.bd/global/img/news/3.%20Aklima%20Islam%20Kuhely.pdf
- https://books.google.com.bd/books?id=MiE9AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=indian+classical+music&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiG7rqj9dXuAhVf7HMBHYM3BgsQ6AEwBnoECAkQAg#v=onepage&q=indian%20classical%20music&f=false

- **তথ্য ও উপাত্ত প্রদান সহায়তায়:**
  - নিলুফার ইয়াসমিন স্মৃতি পাঠাগার, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
  - কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
  - বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার।
  - বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী গ্রন্থাগার।
  - নজরুল ইনষ্টিটিউট গ্রন্থাগার।